প্রসঙ্গ ও প্রসঙ্গতঃ বিভূতিভূষণ

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স / ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট / কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ

গৌতম রায়

প্রকাশক সমীরকুমার নাথ / নাথ পাবলিশিং হাউস / ২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস / কলকাতা ৭০০০২৯
মুদ্রক আর. রায় / সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস / ২১ ঝামাপুকুর লেন / কলকাতা ৭০০০০৯

মূল্য বাইশ টাকা

যাঁর মধ্যে ইষ্টানিষ্টের শিক্ষাকে প্রত্যক্ষ করেছি

শ্রীসুকুমার সেন

শিক্ষক শ্রীচরণেষু

ভূমিকা

একটি বইও মানবসংসারে সম্পর্কের মত। শত সম্বন্ধবন্ধনে সে আবদ্ধ, সম্পন্ন।

যাঁদের অবারিত সাহায্যে এ বই সম্ভব হল তাঁরা বিভূতিভূষণের স্ত্রী ও পুত্র শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমান তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। অপ্রকাশিত বিভূতিভূষণকে তাঁরাই কাছে এনে দিয়েছেন।

আরও সাহায্য পেয়েছি জাতীয় গ্রন্থাগারের সহ-গ্রন্থাগারিক শ্রীগোবিন্দলাল রায়ের কাছে। বিভূতিভূষণের বইপড়া প্রবন্ধটি সম্পাদনার সময় তিনি একাধিক গ্রন্থের পরিচয় আমায় খুঁজে দিয়েছেন।

এঁদের সবাইকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা।

অনুলিপি ও নির্ঘণ্ট প্রণয়নে আমায় সাহায্য করেছে আমার পরম স্নেহভাজন ছাত্র-ছাত্রী শ্রীদীপককুমার দাস এম. এ. এবং শ্রীমতী সাথী রায়।

এদের আমার অন্তরের শুভেচ্ছা।

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

যে পথের পাঁচালী আজও প্রকাশিত হয়নি

পথের পাঁচালীতে অপু তখন একা।

আর দুর্গা? জিজ্ঞাসা করলে বিভূতিভূষণ বলতেন, আগে ছিল না। পরে অন্য একটা জায়গা থেকে জুড়ে দেওয়া।

তখন তিনি ভাগলপুরে। খেলাতচন্দ্র ঘোষের জঙ্গলমহালের অ্যাসিসটেণ্ট ম্যানেজার। রঘুনন্দন হলে দাঁড়িয়ে আছেন। সামনে দুর্গার মত একটি মেয়ে। পরনে ডুরে শাড়ি, কপালের ওপর রুক্ষ চুল উড়ে উড়ে পড়ছে। চোখে ভারি অদ্ভুত একটা চাউনি।

বিভূতিভূষণকে কীরকম ওলট-পালট করে দিল।

'পথের পাঁচালী যখন প্রথম লিখি তাতে দুর্গা ছিল না, শুধু অপু ছিল। একদিন হঠাৎ ভাগলপুরের রঘুনন্দন হল-এ একটি মেয়েকে দেখি। চুলগুলো তার হাওয়ায় উড়ছে। সে আমার দৃষ্টি ও মন দুই-ই আকর্ষণ করল—তার ছাপ মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গেল, মনে হল উপন্যাসে এই মেয়েকে না আনলে চলবে না। পথের পাঁচালী আবার নতুন করে লিখতে হল এবং 'রিকাস্ট' করায় একটি বছর লাগল।'

দুর্গা ছাড়া অপু? ভাবতে পারা যায়?

একটা চরিত্র তো শুধু নয়, সারা পথের পাঁচালীর উচ্ছলতা সে। অপুর জোগান, সম্পূরক। তাকে বাদ দিয়ে শুধু অপু নয়, সারা বইটাই কীরকম অসহায় এবং নিষ্প্রাণ। অপরাজিত পড়লেই বুঝতে পারা যায় দুর্গার দরকার কত বেশি! পথের পাঁচালীতে অপুর মূল বাঁধা আছে। সে মূলে দিদি। উৎসাহে-সাহচর্যে, স্নেহে-সান্ত্বনায় সে অপুর সঙ্গে কত নিরন্তর! কিন্তু অপরাজিততে? অপু কী ছিন্নমূল। উদ্বাস্তু। সেখানে সঙ্গী অনিল বা সঙ্গিনী লীলা, এমনকি স্ত্রী অপর্ণার স্নেহ-সাহচর্য আছে বটে, কিন্তু সে সবই তো দুদণ্ডের। অপু সেখানে দুদণ্ডের শান্তির ভাড়াটে। তার কারণ এরা কেউই দুর্গার মত স্থায়ী—অবিরত নয়। তারই অভাবে সহায়সম্বলহীন অপু ঘটনাস্রোতে ভাসমান এক তৃণখণ্ড মাত্র। তার কোন মাম্মুখী নোঙর নেই। দিদির মত জমা-খরচ মেলানর কোন পাকা মহাজন নেই। পথের পাঁচালীতে সেই দুরন্ত মহাজনের তিরস্কারে-পুরস্কারে তাকে কোথাও একা লাগে না।

অপরাজিততে অপু সত্যিই অত্যন্ত নিঃসঙ্গ। যদিও আমরা সবাই জানি—দুর্গার

এই বিরাট অভাবকে, ফাঁককে বিভূতিভূষণ আর এক বিরাটতর নিরন্তরতায় ভরে দিয়েছেন। তারই নাম মহাকাল। সে উপলব্ধিতে শুধু অপু নয়, অপুর পাঠকরাও উত্তীর্ণ, আশ্বস্ত।

পথের পাঁচালীতে অপু যা, দুর্গাকে বাদ দিয়ে সে যদি তাই থাকত তাহলে পথের পাঁচালী কি আমাদের কাছে এত আকর্ষণীয় হত? অপুকে কি অনেকাংশে প্রাণহীন ও নীরক্ত, অন্তর্মুখী ও অনুচ্ছল বোধ হত না? কিন্তু ছেলেমানুষি, চাপল্য বাদ দিয়ে কি শিশুকে ভাবা যায়? ভাল লাগে?

পথের পাঁচালীতে অপু স্বভাবের দিক থেকে অনেকটাই অন্তর্মুখী। কল্পনাপ্রবণ। দুর্গা সেখানে তার বহির্মুখ, কল্পনার বাস্তবতা। তার অভাবের ভরাট। আসলে অপু-দুর্গা দুজনে মিলে একটি চরিত্র। পথের পাঁচালী তাদেরই—সেই সমগ্র শিশু-হৃদয়েরই পাঁচালী। একা অপুরও নয়, দুর্গারও নয়।

তবু হরিহরের কথা ভাবলে মনে হয়, আবার দুর্গা কেন? বা ঘুরিয়ে বলতে পারা যায়, অপু কেন? সর্বজয়া-হরিহরের দারিদ্র্যে যেখানে একা দুর্গাই যথেষ্ট, সেখানে ষষ্ঠী ঠাকরুনের অহেতুক কৃপা কি অবিমিশ্র আনন্দের? সুখের? স্বস্তির? পুত্র হলেও প্রতিপালনের চিন্তায় হরিহর-সর্বজয়া কি কাতর নয়, চিন্তিত নয়? কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, পথের পাঁচালীর ললাটে চিন্তার কোন দাগ আমরা দেখতে পাই না।

তার একটা বড় কারণ দুর্গা। পথের পাঁচালীতে নবজাতকের যে অভিনন্দন, বিস্ময় সবই বিভূতিভূষণ দুর্গাকে দিয়ে রচনা করেছেন। হরিহরকে দিয়েও নয়, সর্বজয়াকে দিয়েও নয়।

না হবারই কথা। কারণ পুত্রমুখনিরীক্ষণের আনন্দ সেখানে প্রতিমুহূর্তে প্রতি-পালনের দুশ্চিন্তায় অস্থির, মলিন। কিন্তু দুর্গার কাছে তো তা নয়। অমলিন এই বালিকাহৃদয়ে অপু কোন সমস্যার প্রতিমূর্তি নয়, তারই খেলাঘরের এক নবলব্ধ পুতুল। বিস্ময়ে মমতায় তাকে নিয়ে সে বিহ্বল, পরিপূর্ণ। 'একটি টুকটুকে অসম্ভব রকমের ছোট্ট নিতান্ত ক্ষুদে ভাইটির জন্য দুঃখে, মমতায়, সহানুভূতিতে মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।'

সারা পথের পাঁচালী জুড়েই এই বালিকা অভিভাবিকার চাপল্যের ও মমতার অন্ত নেই। পথের পাঁচালীর কৌতুক-উচ্ছলতায়, দুষ্টুমি-নষ্টামির বাইরের এই পথই দুর্গা। জীবনে অপুকে যে পথে বার করেছিল মরণে সেই তাকে আর এক পথের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। এক জন্ম থেকে আর এক মৃত্যু পর্যন্ত সে এক প্রাণের চিরকিশোরী।

সত্যি বলতে কী, দুর্গার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পথের পাঁচালী শেষ হয়ে গিয়েছে। নিশ্চিন্দিপুরের পর্বও শেষ। এরপর অপুদের কাশীযাত্রা।

সে পথ অন্য আর এক পথ। অপুর হয়ে ওঠার পথ। আমরা যাকে বলি সংগ্রাম, বৃহত্তর জীবন। সায় দিয়ে বিভূতিভূষণও বলেছিলেন 'life cycle'। অপরাজিত। এবং তা একান্তভাবেই অপুকে নিয়ে। পথের পাঁচালী অপু-দুর্গাকে নিয়ে। সেখানে কেউই একা, সম্পূর্ণ নয়—তারা পরস্পরের।

তাই বিভূতিভূষণ দুর্গাকে শুধু যে বাইরে থেকে দেখেছিলেন তা নয়, দুর্গাকে দিয়ে তিনি সারা পথের পাঁচালীই ভেবে দেখেছিলেন।

তার আগে পথের পাঁচালীর যে খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়েছে তাতে কিন্তু অন্য-রকম ছিল।

'নিশ্চিন্তপুর গ্রামের প্রান্তে হরিহর রায়ের ছোট একখানা কোঠাবাড়ী ছিল। সংসারে থাকিবার মধ্যে তার স্ত্রী ও এক ছেলে। হরিহর রায়ের বয়স ছিল বছর পঁয়ত্রিশ, গাঁয়ের মানুষ কাজেই কোথাও না গিয়া সে বাড়ী থেকেই সামান্য জমি-জমার খাজনা পাইত [?]। বাড়ীর পিছনের একটুখানি জমিতে কচু, কুমড়ার আবাদ করিত, ইহাতে তিন প্রাণীর একপ্রকার কষ্টেসৃষ্টে চলিত।'

কার্ত্তিক মাসের শেষ হইলেও খুব শীত পড়িয়াছে। সন্ধ্যার সময়ে এক দূর গ্রামের প্রজাবাড়ী হইতে খাজানা সাধিয়া হরিহর বাটী ফিরিয়া আসিল। স্ত্রী সর্বজয়া তুলসীতলা [য়] সন্ধ্যা দেখাইতেছিল, স্বামীকে দেখিয়া তুলসীতলায় [?] প্রণাম সারিয়া কাছে আসিয়া বলিল, "তবে যে বলা হোল ফিরতে অনেক রাত হবে, আমি এখনও ডালও রাঁধিনি।" হরিহর হাতের পুঁটুলী নামাইতে নামাইতে [বলিল] "এলাম চলে, কেউ এক পয়সা তো দেবে না শালারা, মিথ্যে মিথ্যে হয়-রান হওয়া।" সর্বজয়া হাতের প্রদীপ নামাইয়া বলিল, "একটু দাঁড়াও আমি কুয়ো থেকে টাটকা জল তুলে দি। তবুও একটু গরম হবে এখন। এবার যে শীত পড়লো, তাতে পুকুরের জলে আর কাজ চলবে না।"

হরিহরের ছেলে অপু মাকে নিশ্চিন্তমনে তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে দেখিয়া ঘরের মধ্যে [তক্তা] পোষের উপর দাঁড়াইয়া তাকের হাঁড়িকলসী খুটখাট করিয়া বোধ হয় কিসের সন্ধানে ব্যস্ত ছিল। বাবার গলার স্বর শুনিয়া বুঝিল বিপক্ষ সজাগ হইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরের দাওয়ায় আসিয়া বাবার বড় পুঁটুলিটা দেখিয়া অসাফল্যের দুঃখ ভুলিয়া গেল। বাবাকে সে ভয় করিত। হঠাৎ কাছে না আসিয়া আঙুল দিয়া পুঁটুলিটা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বাবা ওতে?" হরি-হর বলিল, "হ্যাঁরে এই বাঁদর, এই শীতে একটু কিছু গায়ে দিতে নেই তোর? ওগো

অপুর সে দোলাইখানা কোথায় গেল ?" সর্বজয়া জলের বালতী নামাইতে নামাইতে বলিল—" ? নাকি ? বিকেল থেকে বকচি, ওকি কথা গ্রাহ্য করে নাকি ? ওই তো কাঠের আলনায় দোলাই রয়েচে, জামা রয়েচে, সবই রয়েচে—"

হরিহর বলিল—হুঁ সে বেতখানা গেল কোথায় ?

অপু প্রমাদ গণিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিল। সর্বজয়া বলিল, "আচ্ছা আজ থাক গো, ফের এবার [?] কিন্তু যেদিন ? আলগা গায়ে বেড়াচ্চো, সেদিন মজা দেখবে এখন—"

একঘণ্টা পরে দেখা গেল সর্বজয়া রান্নাঘরে বসিয়া এক রাশি কলায়ের ডাল বাটিতেছে। বাহিরের কনকনে শীত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য হরিহর উনুনের পাড়ে বসিয়া তামাক খাইতেছে এবং স্ত্রীর সহিত খোসগল্প করিয়া সমস্ত দিনের শ্রম বিনোদনের চেষ্টা করিতেছে। অপু দোলাই গায়ে দিয়া শান্তভাবে মায়ের কাছে বসিয়া আছে।

হরিহর ভাল করিয়া এক কল্কে তামাক সাজিয়া টান দিতে দিতে কহিল, "অত তাড়াতাড়ি করবার দরকার নেই—সবে তো সন্ধে [?] [।] আজ দেখে এলাম রায়েদের মাঠের বাগানে, সব তাঁবু ফেলেচে, সেটেলমেণ্টের বড় সায়েব নাকি আসবে, দুটো গরুর গাড়ী বোঝাই দিয়ে জিনিসপত্র সব এলো—"

সর্বজয়া মাথা ঝাঁকুনি দিয়া বলিয়া উঠিল—পোড়া সেটেলমেণ্টো আর কতদিন ধরে হবে ? ওর খরচা দিতেই তো এবার—

হরিহরের সামান্য যা কিছু জমিজমা ছিল এবার তাহার খরচ বাবদ গবর্ণমেণ্টকে তাহার ১১।৶০ দিতে হইয়াছে। সে কিন্তু স্ত্রীর কাছে ও যেসব নিরীহ লোকে জমিজমার ধার ধারে না, তাহাদের কাছে প্রচার করিয়া বেড়াইত যে তাহার পৈতৃক অনেক জমি পূর্বে লোকে ফাঁকি দিয়া খাইত, এখন সেট্‌লমেণ্টে সেগুলি সে ফেরৎ পাইয়াছে, অনেক টাকা এজন্য তাহাকে খরচা দিতে হইয়াছে, সেট্‌লমেণ্টের ক্যাম্পে তাহার খুব খাতির ইত্যাদি।

স্ত্রীর চোখে বড় হইতে সবাই চায়, হরিহর স্ত্রীর মুখে সেট্‌লমেণ্টের কথা শুনিয়া আরম্ভ করিল "গ্যাখ্ সেদিন তো ক্যাম্পে গেলাম। আমাদের গাঁয়ের অনেক সব বড় বড় (হরিহর আঙুল দিয়া ইঙ্গিতে দেখাইল) হুঁ হুঁ—ডেকে জিগ্যেসাও করলে না কানুন গো। আমি যেতে মাত্রই কানুন গো একেবারে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, বল্লে ? জমিদার মশায় আসুন, সাতবেড়ের দরুন সেই যে কাগজপত্র গোলমাল হয়েছিল, এই ও বাটী নাড়িস্ নে, দোলাই ধরে উঠবে সরে বস, আরও সরে যা, তারপর সেই গোলমালের কথা বলতেই কানুন গো মুহুরীদের সব বকে

উঠলো, বল্লে, "রায় মশায় আমি যেটা নিজে না দেখবো, সেইটেই গোলমাল হয়ে যাবে, আপনি বল্লুন আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। সে খাতির কী—"

হরিহর বারকয়েক জোরে জোরে তামাক টানিয়া অধিকতর ভিত্তিহীন কি একটা ফাঁদিতে যাইতেছিল। এমন সময় তাহাদের বাহির বাড়ীর সদর দরজায় কে যেন ঘা দিতেছে শোনা গেল। সর্বজয়া ডালবাটা বন্ধ করিয়া মুখ তুলিয়া একটুখানি চুপ করিয়া শুনিয়া বলিল, "ওগো বাইরের দরজায় কে যেন ঘা দেয়?"

হরিহর বলিল, "কৈ না কে ঘা দেবে?"

সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় আঘাতের শব্দ ও কার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

সর্বজয়া বলিল, "ঐ যে কে ডাকচে, দেখো না একবার।"

হরিহর শঙ্কিত হইল। সে পূর্বেও আঘাতের শব্দ না শুনিয়াছে এমন নহে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটু প্রত্নতত্ত্ব নিহিত আছে, অদ্য তিন বৎসর পূর্বে ঠিক এই পৌষ মাসেই রামনারায়ণপুরের হাটে এক কাবুলী আলোয়ান বিক্রেতার নিকট সে ধারে ১০ টাকা মূল্যের এক আলোয়ান খরিদ করিয়াছিল। হতভাগ্য কাবুলিওয়ালা দুই বৎসর যাবৎ বহু হাঁটাহাটি করা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত টাকা পাওয়া তো দূরের কথা, হরিহরের সাক্ষাৎ পর্যন্ত পায় নাই। মধ্যে সে ৪।৫ দিন পূর্বে আসিয়াছিল এবং হরিহরের দেখা না পাইয়া যাইবার সময় গ্রামের নিকট শাসাইয়া গিয়াছে যে এবার যেদিন আসিবে আর একা আসিবে না। দেখিবে যে টাকা আদায় হয় কি না হয়। কাবুলিওয়ালা চলিয়া যাইবার পর গ্রামের লোচন ঘোষ চুপিচুপি আসিয়া হরিহরকে সাবধান করিয়া দিয়া গিয়াছে। এসব কথা সর্বজয়া জানিত না। হরিহর শঙ্কিত চিত্তে বাহিরের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই কাবুলিটা এত রাত্রে আসে নাই তো? বিচিত্র কি? সঙ্গে কি সে দু একজন দেশভ্রাতাকে আনিয়াছে?—তাহা হইলে উপায়?

সন্তর্পণে পদদ্বয় শূন্যে তুলিয়া এবং শুদ্ধমাত্র বৃদ্ধা পদাঙ্গুলিদ্বয়ের উপর ভর করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে হরিহর শুনিতে পাইল দরজার বাহির হইতে পরিষ্কার বাংলায় কে বলিতেছে "বাড়ীতে কে আছেন? একবার দোরটা খুলুন"।

যাক—বাঁচা গেল। তাহা হইলে কাবুলিওয়ালাটা নয়।

হরিহর বাহির দরজার খিল খুলিয়া দিল। দেখিল বাহিরে একজন অপরিচিত ভদ্রবেশী প্রৌঢ় দাঁড়াইয়া, গায়ে শাল, মাথায় কালো কম্পর্টার, হাতে একগাছা বেতের লাঠি, অন্যহাতে একটা চামড়ার ব্যাগ। প্রৌঢ় জিজ্ঞাসা করিলেন—'এইটাই হরিহর রায় মশায়ের বাড়ী তো? হরিহর বলিল, 'আজ্ঞে হাঁ, আমারই নাম।'

প্রৌঢ় বলিলেন—ওঃ বেশ। বড় সন্তুষ্ট হলাম। আমি আসচি গিয়ে কলকাতা,

থেকে—আমার নাম কৃষ্ণধন গাঙ্গুলী—এই ট্রেনেই আসচি। তোমার শ্বশুর রামজীবন বাবুর সঙ্গে একসময়ে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল—তাঁর ওখানে যথেষ্ট যাতায়াত ছিল আমার। তবে—এখন, বাইরে বাইরে থাকি এইজন্যে ততটা আর—বেশ বেশ বড় সন্তুষ্ট হলাম বাবাজীকে দেখে—

হরিহর বলিল—'আজ্ঞে তা আসুন বাড়ীর মধ্যে।'

মুখে অভ্যর্থনা করিলেও হরিহর মনে মনে মহা চটিয়া গেল। দিব্যি শীতের রাত্রে স্ত্রীর সহিত গল্প জমাইয়া আনিয়াছিল—এখন আবার নিয়ে এস জলখাবার—করো বিছানার জোগাড়—কোথায়ই তা? আর কোথায়ই বা কি?—শ্বশুরগিরি ফলাবার আর সময় পেলেন না! এইসব দুর্বৃত্তদের জন্যে আর দুনিয়ার সুখশান্তি নাই?

কৃষ্ণলালবাবু [?] বলিতে ২ চলিলেন—তোমাদের এই বাড়ীতেই একবার এসেছিলুম, বাবাজী সে আজ অনেক বছর আগেকার কথা। তোমরা তখন সব ছেলেমানুষ। তোমার জেঠামশায় নীলমণি রায় মশায়ও ছিলেন আমার বন্ধু—একসঙ্গেই সাহেবের কাজ কর্ত্তুম। সেই সময় তার বড় ছেলে নরুর পৈতে হয়, সেই উপলক্ষেই আসা।...আহা নিলুও অল্পবয়সে মারা গেল। তা নৈলে তো কতবার আসতুম যেতুম। বিনু ওরফে বীণাপাণি হরিহরের প্রথমা পত্নী। সে কয়েক বৎসর পূর্বে মারা যাওয়ায় হরিহর দ্বিতীয়বার বিবাহ করে, সেই স্ত্রীই সর্বজয়া।

হরিহর বলিল—হ্যাঁ নরেনদার ছেলেপিলেরা এখন কোথায় আছে?

হরিহর দালানের সামনে রকে উঠিল। কৃষ্ণবাবু রকে উঠিতে উঠিতে বলিলেন, সেইজন্যেই তো আসা বাবাজী। চলো সব বলছি খুলে। ওঃ এ দালানের দরজাটা বড্ড নীচু—সেকেলে বাড়ী কিনা। তখন এইরকমই ছিল।

হরিহর বলিল—বসুন এই চৌকীতে। জুতোটুতো খুলুন, জল আনিয়ে দি—হ্যাঁ নরেনদার কথা কি বলছিলেন? এক অজ্ঞাত বিপদাশঙ্কায় হরিহরের বুক দুরুদুরু করিয়া উঠিল।

কৃষ্ণলালবাবু বলিলেন—সে অনেক কথা। বলবো এখন বাবাজী এর পর। এখন—"

হরিহর বলিল—আপনি বসুন—আমি আসচি, জামাটা খুলুন ততক্ষণ।

কৃষ্ণবাবু চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন—ঘরদোরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, বহু পুরোনো বাড়ী, একপ্রকার অস্বাস্থ্যকর স্যাঁতসেতে গন্ধ উঠিতেছে। দরজা জানালায় কাঠ ক্ষয়িয়া বড় বড় ফাঁকের সৃষ্টি করিয়াছে ও সামনের জানালাটির কবাট ঝুলিয়া পড়ায় নারিকেল কাতার দড়ি দিয়া উহা গরাদের সহিত বাঁধা।

বাহির হইতে হু হু হিম ঢুকিতেছে। বাহিরের রকের ফাটলে কি সব গাছ গজিয়াছে। বন্ধুর কন্যাটি যে এরূপ দরিদ্রগৃহে পড়িয়াছিল ইহা তাহার ধারণা ছিল না। মৃত বন্ধুকন্যার কথা মনে হইতেই কৃষ্ণলালের বড় কষ্ট হইল। এইসময় হরিহর প্রবেশ করিলে কৃষ্ণবাবু বলিলেন—"আমার জন্যে বাবাজী তোমায় কিছু ব্যস্ত হতে হবে না—আমি রাত্রে একরকম কিছুই খাইনে—বয়স তো হোল কম না—রাতে খাওয়া আর সয় না তা—আহা, এ সময় যদি বিনু মা আমার থাকত—আমারই সব কোলে-পিঠে মানুষ।

নৈশ আহার না করিবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে হরিহর সময়োচিত একটা ভদ্রতার কথা বলিল।

২

ঘণ্টা দুই পরে আহারাদি শেষ করিয়া শুবার আগে তামাক খাইতে ২ কৃষ্ণবাবু বলিতে লাগিলেন—হ্যাঁ বাবু কথাটা আগে বলে নি। তোমার জেঠামশায়ের ছেলে নরু তো—ছোকরা অল্প ? ছিল—আমরা কেবল রয়ে গেলাম—সে খবর পেয়েছিলে তো ?"

হরিহর কৃত্রিম দুঃখের ভাণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল—বলিল—হ্যাঁঃ তা সবই অদৃষ্ট ! তাই যদি না হবে তাহলে আর—" হরিহর শোকের বাক্যটা বেশী বড় না হইতে দিয়া সংক্ষেপে শেষ করিয়া ফেলিল কারণ 'কাজের কথাটা' কি তাহা শুনিবার জন্য তাহার মনপ্রাণ উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল।

কৃষ্ণবাবু বলিলেন—সেও তো হয়ে গেল আজ ২/৩ বৎসরের কথা। নরুর পরিবার ও ছেলেমেয়ে এতদিন লাহোরেই ছিল—টাকাকড়ি যা ছিল তা থেকে ছেলেটির লেখাপড়া চলছিল—ছেলেটি বড় ভাল, বেশ বুদ্ধিমান, পড়াশুনোতেও বেশ, গত বছর ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে উঠেচে—তারপর ধরো বিদেশেও খরচপত্র বেশী, তাছাড়া অভিভাবকহীন, এক আমি ছিলাম, তা আমি এই সামনের বছরই চাকরী ছেড়ে দোব, আর এ বয়সে পোষায় না। তাই ভাবলাম ওরা এসে দেশের বাড়ীতেই থাকুক—টাকাকড়ি হাতে এমন কিছুই নেই—মেয়েটারও বিয়ে আছে। সেইজন্যেই আমার আসা। ওদের নিয়ে আমার ছেলে আসতে পারবে এখন, সে বন্দোবস্ত আমি করে দোব। আমি কাল সকালের গাড়ীতেই চলে যাবো—তারপর একটা ভাল দিনটিন দেখে—তবে দেশে ঘরে আসবে এর আর দিনই বা কি ? যাই হোক—এই গেল ব্যাপার—তা তুমি যখন আছো, তখন আর ভাবনা কিসের ? তাদের আপনার জনের কাছে এলে এ সময় বুঝলে না ? তা যাও বাবাজী রাত হয়ে,

গেল—শোও গে, কাল সকালে কথাবার্তা হবে এখন। শুইবে কি হরিহরের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। কিছু যে একটা বে-গতিক ঘটিবে, সে ইহা পূর্ব হইতেই ভাবিয়াছিল, কিন্তু সে বিপদ যে এরূপ আসন্ন, তাহার প্রকৃতি যে এরূপ সঙ্গীন, তাহা সে কল্পনাও করে নাই।

হরিহরের জেঠামশায় নীলমণি রায় মহাশয় বিদেশে কমিশারিয়েটে চাকরী করিতেন, এতদুপলক্ষে তিনি বিদেশেই থাকিতেন, দেশে কালেভদ্রে কচিৎ কখনো আসিতেন মাত্র। তিনি হরিহরের পিতার সহিত একান্নবর্তী ছিলেন না, এবং পৃথক হইয়া পৈতৃক বাটীর এক অংশে তিনি কয়েকটি নূতন কুঠুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি অর্থবান ও যথেষ্ট উপার্জন করিতেন, এরূপ খ্যাতি ছিল। মাঝে মাঝে তিনি হরিহরের পিতাকে অর্থসাহায্যও করিতেন কারণ হরিহরের সংসার কোনো কালেই সচ্ছল ছিল না। নীলমণি রায় মারা যাইবার পর তাহার পুত্র নরেন্দ্র পিতার অফিসেই কার্যপ্রাপ্ত হয় এবং পিতার মতই উপার্জন করিতে থাকে। সেও দেশে বড় আসিত না, একবার ১৫।১৬ বৎসর পূর্বে আসিয়া নিজ অংশের ঘরগুলি মেরামত করাইয়া ও চুণকাম করাইয়া যায়। তাহার পর ২।৩ বৎসর পূর্বে নরেন্দ্র লাহোরেই প্লেগে হঠাৎ মারা পড়িয়াছে এ সংবাদও হরিহর পাইয়াছিল। তাহারই পরিবার ও ছেলেমেয়ে আজ বাটী আসিতে চাহিতেছে। সর্বনাশ!···আসল কথাটি হইতেছে এই যে এতদিন নির্বিবাদে সে উভয় অংশের জমিজমার খাজানা আদায় ও বাগানের আম-বাঁশ বিক্রয়ের উপস্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছে এবং জেঠামশায়ের অংশের ঘরগুলি অধিকার করিয়া আসিতেছে। বর্ষাকালে কাঠঘুঁটে রাখিবার অসুবিধা নিবন্ধন সে জেঠামশায়ের উত্তরের কুঠুরীতে সঞ্চিত বাঁশকাঠ রাখে, গত বৎসর পালিত পাড়ায় সস্তাদরে কিছু পুরনো কড়ি, বরগা কিনিয়া তাহা সে উহাদের অন্য একটা কুঠুরীতে রাখিয়াছে, বাকী দুইটি কুঠুরী সে নিজেদের শয়নঘর হিসাবে ব্যবহার করে, কারণ তাহার নিজের পৈতৃক অংশের কুঠুরীগুলি বহুদিন বে-মেরামতী অবস্থায় থাকিবার দরুন বাসের প্রায় অযোগ্য।

হরিহর বাহিরের রকে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে পড়িল, ছেলেবেলায় গুরুমশায়ের পাঠশালায় পড়িতে পড়িতে সে যেন পড়িয়াছিল যে পৃথিবী ঘোরে। পৃথিবী যে সত্য সত্যই ঘোরে ইহা সে আজকার দিনের পূর্বে কখনো দেখে নাই। শৈশবকালের অধীত পুস্তকস্থ বিদ্যা আজ একেবারে প্রত্যক্ষ সত্যরূপে হতভাগ্য হরিহরের চক্ষের সম্মুখে দেখা দিবে, ইহা কে জানিত? আরও কথা আছে।

সে ভাবিতে লাগিল—আসিল আসিল তা আবার এই জরীপের সময়ই আসিল? ইতিপূর্বে সে ইহার [?] অংশের কিছু কিছু জমি নিজের বলিয়া কাগজ-

পত্রে লিখাইয়াছে, আর কিছুদিন পরে সমস্ত জমিই এইরূপ লিখাইয়া লইত। কে জানিত নরেনদার নাবালক পুত্র ও বিধবা স্ত্রী হঠাৎ এরূপভাবে উপস্থিত হইয়া সব দিক মাটী করিবে? এর চেয়ে সে কাবুলীওয়ালাটা আসিলেও যে তাহা সহস্রগুণে ভাল ছিল।

পরদিন দুপুরবেলা আহারাদি করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে যাইবার জন্য কৃষ্ণবাবু গরুর গাড়ীতে চড়িলেন। ষ্টেশন গ্রাম হইতে ৫।৬ মাইল দূরে, সন্ধ্যার পর গাড়ীর সময় হইলেও অগ্রে না বাহির হইলে পাছে ঠিক সময়ে না পৌছতে পারা যায়, এজন্য কৃষ্ণবাবু সকাল করিয়াই যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় একখানি দশ টাকার নোট হরিহরের হাতে দিয়া বলিলেন, "বাবাজী আমার চিঠি পেয়ে তুমি ঘর-দোরগুলো পরিষ্কার করে রেখো, তাছাড়া একটা ঝিটি ঠিক করে রেখো, তা নৈলে তাদের বড় কষ্ট হবে—হাট বাজার করে রাখবার দরকার বিবেচনা কলে তাও করে রেখো, তোমাকে বেশী আর কি বলবো..."

কৃষ্ণবাবু চলিয়া যাইবার দিন কুড়ি বাইশ পরে হরিহর তাঁহার নিকট হইতে এক পত্র পাইল যে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মেয়েছেলেদিগকে লইয়া আগামী বৃহস্পতিবারের ভোরের ট্রেনে নবাবগঞ্জ ষ্টেশনে পৌছিবে, দুইখানি গোরুর গাড়ী যেন সে ঐ সময়ে ষ্টেশনে রাখে। কথিত দিনের পূর্বদিন হরিহর নিজে ও তাহার স্ত্রী সর্বজয়া দুইজনে মিলিয়া উত্তরের কুঠুরী হইতে কাঠ ঘুঁটে বাহির করিয়া উঠানে ফেলিয়া ঘরখানা একপ্রকার পরিষ্কার করিয়া রাখিল। অন্য ঘরখানির রাশীকৃত কড়ি বরগা স্থানান্তরিত করা তাহাদের নিজেদের সাধ্যাতীত বোধ হওয়াতে তাহা উহারা সে ঘরেই রাখিয়া দিল। ঘর পরিষ্কার করিতে ও কাঠকুটা সরাইতে উভয়ের বেলা প্রায় ·টা বাজিয়া গেল। ধূলিধূসরিত বস্ত্রে ও উর্ণনাভ গুম্ভখচিত বেশে সর্বজয়া বকিতে বকিতে স্নান করিতে যাইতেছিল—"মা রে মা, এত শতেক্ষোয়ারিও অদৃষ্টে লেখা ছিল। একবাড়ীর [?] থ্যামতেই নেই যদি, তবে বিয়ে কর্তে না গেলেই তো ছিল ভাল। ছেলেটা সেই কোন সকালে দুটো পান্তো ভাত খেয়ে আছে, কখন নাইবো, কখন বা বাছাকে দুটো ভাত দেব, হাড় একেবারে ভাজা ভাজা হয়ে গেল।

হরিহর পূর্ব হইতেই ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিল—মাঝে মাঝে কুইনাইন খাইয়া জ্বর বন্ধ রাখিত। অত্য খাটা-খাটুনী বা অনিয়ম হওয়াতেই হোক বা কি জানি অন্য কি কারণেই হোক, সন্ধ্যার ঘণ্টা দুই পূর্বে হরিহরের ধমক দিয়া জ্বর আসিল। সে তক্তাপোষের উপর লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়াছিল—সর্বজয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কিরকম আছ?—তারপর সে লেপ একটুখানি উঠাইয়া কপালের

উত্তাপ অনুভব করিয়া হাত রাখিয়া বলিল, 'ওঃ গা একেবারে পুড়ে যাচ্চে, কি খাবে এখন রাত্রে ?' হরিহর বিকৃত স্বরে বলিল—'ছাই খাবো। উহুঁ লেপ তুলো না, থাক ঐ গিয়ে একটুখানি খাবার জল ঐ বড ঘটীটা করে আমায় দিয়ে যাও দিকি ? ও বাবা. গেলাম রে বাবা...'

অনেক রাত্রে হরিহর ঘরের মেঝেতে বসিয়া গরম গরম দুইটি ভাত, ওবেলাকার বাসি কলায়ের ডাল ও অন্য কি উপকরণ সংযোগে আহার করিতেছিল কারণ তাহার কম্প তখন চলিয়া গিয়াছে।

পরদিন সকাল ৯৷৷০টার সময় দুইখানি গোরুর গাড়ী হরিহরের বাড়ী আসিয়া পৌছিল। হরিহর ষ্টেশনে গাড়ী দুইখানি পাঠাইয়া দিয়াছিল—ভোর ৬টায় গাড়ী আসে, অনেক দূর পথ আসিতে বেলা হইয়া গিয়াছে। একজন হৃষ্টপুষ্ট ২৭।২৮ বৎসরের শ্যামবর্ণ যুবক, আগে গাড়ী হইতে নামিল ও হাত ধরিয়া একটি ৯।১০ বৎসরের মেয়ে ও ১১।১২ বৎসরের ছেলেকে গাড়ী হইতে নামাইল। ছেলেটিকে নামাইতে হইল না, যুবক হাত ধরিতেই সে ছৈএর মধ্য হইতে এক লাফ দিয়া মাটীতে নামিয়া পড়িল। ছেলে মেয়ে দুটিই অতি সুন্দর দেখিতে, পশ্চিমদেশসুলভ নিটোল স্বাস্থ্য তাহাদের প্রবর্ধমানা শিশু-শরীর সুকুমার লাবণ্যে ভূষিত করিয়াছে। সকলের শেষে একটি বিধবা ছৈএর মধ্য হইতে নামিলেন। জিনসপত্র গাড়ী হইতে নামানো হইল। ৪টা ট্রাঙ্ক ৪।৫টি বড বড পোঁটলা—৪।৫ থলে বাসন কোসন। ? নামানো হইলে গাড়োয়ান ভাড়া চাইলে হরিহর যুবকটির দিকে চাহিয়া বলিল— ভাডাটা আমার কাছে—ঐ সব গোছাতে গোছাতেই দশ টাকা খরচ হয়ে গেল কিনা। ঘর দোর ঝাঁট দেওয়া, ধূলো ঝাড়া, কতদিনের কথা, সে তো একটা আধটা দুপুরেই [?] কর্ম নয়, তা ছাড়া এখানে মজুরার দরও বেশী কিনা –"

যুবকটি কৃষ্ণবাবুর পুত্র। সে পিতার নিকট শুনিয়াছিল, গাড়ীভাড়া ইত্যাদি বাবদ টাকা হরিহর নিকট দেওয়া আছে, তথাপি সে দ্বিরুক্তি না করিয়া ব্যাগ খুলিয়া ভাড়া মিটাইয়া দিতেছে। ছোট ছেলেটি হঠাৎ বলিয়া উঠিল—'ঐ যা নরুদা, সেই বইখানা কোথায় ফেল্লেন ? ? পুর থেকে কিনলেন যে।"

? তাড়াতাড়ি দুই পকেট হাতড়াইয়া বলিল—যাঃ গিয়েছে সুনু, (ছেলেটির নাম সুনীল) [।]

শেয়ালদ থেকে রওনা হয়েও তো পড়ছিলাম, তা হলে গাড়ীতেই গিয়েচে। ছেলেটি বলিল—দেখলেন ? গাড়ী থেকে নামবার সময় দেখে নিলেন না কি ফেললেন ? গেল একটা টাকা। ১০।১১ বৎসরের ছোট্ট মেয়েটি খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—রানাঘাট স্টেশনে আমার হাতে কি দিলেন নরুদা ? পরে

সে উঠানে নামানো একটা চাবিবিহীন বেতের ঝাঁপির ঢাকা [?] তাড়াতাড়ি খুলিয়া একখানা মোড়কে—ছবি আঁকা বই তুলিয়া ধরিয়া বলিল—এখানা কি ? নরুদা [?] আপনি তো বেশ। আচ্ছা যদি টাকা হোত ?"

? নরেশ মেয়েটির হাত হইতে খপ করিয়া কাড়িয়া লইল। বলিল—যাঃ জ্যাঠামি করিস নে, টাকা [?] তো নয়। টাকা হোলে এরকম ভুল হোত না জেনে রাখিস।"

হরিহরের ছেলে অপু রকে দাঁড়াইয়া নব-আগন্তুকদিগকে লক্ষ্য করিতেছিল। ইহাদের কাপড ? বিশেষত্ব, বিশেষ করিয়া কথা কহিবার ধরণ, তাহার কাছে কেমন সম্পূর্ণ নতুন ধরণের ? ? ইহাও তাহার মনে হইল সে এ পর্যন্ত এত ধরণের কথা।'

প্রচলিত পথের পাঁচালীতে হরিহর চরিত্রও স্বভাবতঃ অনেকটা বদলেছে। পাণ্ডুলিপির হরিহর পাড়াগেঁয়ে মানুস বলতে যা বোঝায় একেবারে তাই-ই। না আছে তার লেখাপড়ার কৌলীন্য না বাইরের জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক। বরং পাড়াগ্রামের মানুষের মত সে অনেকটাই স্থূল, কিছুটা ধড়িবাজও। কিন্তু প্রচলিত সংস্করণের হরিহর একেবারেই তা নয়। তার প্রথম যৌবনের অনেকটাই বিদ্যায় ও বিদেশভ্রমণে কাটে। কাশীতে থেকে সে দীর্ঘদিন লেখাপড়া শিখেছিল। বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে দুটি চরিত্রে প্রায় একেবারে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। পাণ্ডুলিপিতে বিভূতিভূষণ লিখেছেন, 'হরিহরের লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানা ছিল না, তার ওপর নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে মানুস, কাজেই কোথাও না গিয়া সে বাড়ি থেকেই সামান্য জমিজমার খাজনা পাইত। বাড়ির পিছনের একটুখানি জমিতে কচু কুমড়ার আবাদ করিত, ইহাতে তিনপ্রাণীর একপ্রকার কষ্টেসৃষ্টে চলিত।' প্রচলিত পথের পাঁচালীতে বিভূতিভূষণ হরিহর সম্বন্ধে লিখেছেন, 'সেই চুণার দুর্গের চওড়া প্রাচীরে বসিয়া দূর পাহাড়ের সূর্যাস্ত দেখা, কেদারের পথে তেজপাতার বনে রাত কাটানো……গলিত রৌপ্যাধারের মত স্বচ্ছ, উজ্জ্বল হিমশীতল স্বর্গনদী অলকানন্দা, দশাশ্বমেধ ঘাটের জলের ধারের রাণা—একটু একটু মনে পড়ে, যেন অনেকদিনের আগেকার দেখা স্বপ্ন।'

প্রচলিত পথের পাঁচালীতে হরিহরকে যে বর্তমান দুরবস্থার মধ্যে আমরা দেখি সেখানে যে তার সামান্য দীনতা বা ইতরতা একেবারে নেই তা নয়, তবু সে গ্রামের ভুবন মুখুজ্জে বা অন্নদা রায়ের মত ঠগ বা কুচক্রী নয়। বরং তার উল্টোটাই। সংসার সম্পর্কে অনেকটাই অনভিজ্ঞ, কল্পনাপ্রবণ। গ্রামে থেকেও ভিনগাঁয়ের শিষ্যবাড়ি ঘুরে ঘুরেই তার জীবিকা। পাণ্ডুলিপির তুলনায় সে অনেক বেশিই প্রসন্ন, মনোরম; অনেক বেশিই অপুর কাছাকাছি। সংসারে কুপুত্র বা

কুপিতা দুর্লভ নয় বটে, কিন্তু ভবঘুরে, বীরু রায়ের বংশধর হিসেবে, কল্পনামতি অপুর পূর্বপুরুষ হিসেবে পাণ্ডুলিপির হরিহরকে নিয়ে আমাদের অস্বস্তিই লাগে। বিভূতিভূষণেরও লেগেছিল।

অন্য বদল, প্রচলিত সংস্করণে হরিহরের একটিই বিবাহ। প্রথম পাণ্ডুলিপিতে কিন্তু দুটি। সর্বজয়া তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। এবং 'অপু' দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। (প্রচলিত সংস্করণে 'অপু'। 'অপূর্ব' থেকে হলেও ডাকনামের বানানে উচ্চারণ অনুযায়ী দীর্ঘ 'ঊ'র চেয়ে হ্রস্ব 'উ'ই বেশি সঙ্গত।) হরিহরের প্রথম পক্ষের বিগত স্ত্রীর নাম ছিল বিনু, বীণাপাণি। বিভূতিভূষণের বাবা মহানন্দেরও দুই পক্ষ এবং বিভূতিভূষণ দ্বিতীয় পক্ষেরই সন্তান। হরিহর যদিও অনেকখানিই মহানন্দের আদলে গড়া, তবু বিভূতিভূষণ দ্বিতীয় চিন্তায় হয়ত এতখানি মিল রাখার কোন দরকার বোধ করেননি।

প্রচলিত পথের পাঁচালীতে নীলমণি রায় হরিহরের জেঠামশায় নয়, জ্ঞাতিভাই। নীলমণির বিধবা পত্নী ও তার ছেলেমেয়েদের নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে আসার ব্যাপারটি পাণ্ডুলিপিতে বিস্তৃত, কিন্তু বইয়ে নেপথ্যেই নিষ্পন্ন। পাণ্ডুলিপির বিস্তৃত প্রত্যাবর্তনকে গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত করে বিভূতিভূষণ ভালই করেছেন—গল্প আরও জমাট হয়েছে। বড়লোক আত্মীয়ের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার বেদনা-প্রদর্শনই এখানে লেখকের অভিপ্রেত। সেখানে ফেরার বিস্তৃত বিবরণ অত প্রয়োজনীয় নয়। বিভূতিভূষণও তা মনে করেননি।

আর সামান্য বদল, গ্রামের নাম। পাণ্ডুলিপিতে 'নিশ্চিন্তপুর', 'নিশ্চিন্তিপুর'—শেষে, বইয়ে 'নিশ্চিন্দিপুর'। বনগাঁ থানায় 'নিশ্চিন্তপুর' বলে সত্যিই একটি গ্রাম আছে। দ্বিতীয় ভাবনায় বিভূতিভূষণের হয়ত মনে হয়ে থাকবে, ব্যক্তিনামের মত গ্রামের নামও একটু কাল্পনিক হওয়াই ভাল। তা ছাড়া এ-কথা তো সর্বজনবিদিত, নিশ্চিন্দিপুরের ওপর তাঁর গ্রাম বারাকপুরের দাবিই সর্বাধিক। সম্ভবতঃ সে দাবিও তিনি হাতছাড়া করতে রাজি হননি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"নিশ্চিন্তপুর গ্রামের উত্তর প্রান্তস্থ মাঠে জরীপের তাঁবু পড়িয়াছে। এই মাঠকে এই অঞ্চলে কুঠীর মাঠ বলে। এই মাঠের ? নবগঙ্গা নদীর ধারে সেকালে বেঙ্গল ইণ্ডিগো কনসারনের নীলকুঠী ছিল—এখানকার কুঠী এদিককার ১৪টা হেডকুঠী ছিল। উলুখড়ের বনের পিছনে, নদীর ধার, অধুনালুপ্ত, হিংস্র, বিরাটকায় প্রাগৈতিহাসিক জীবদেহের কঙ্কালস্বরূপ সেই প্রাচীন নীলকুঠীর ভগ্নাবশেষ অনেক

দূর জুড়িয়া পড়িয়া আছে। জাল-ঘর, হাউজ-ঘর, চাপ-ঘর, বাংলা-ঘর এবং তা ছাড়া আরও অনেক ছোট বড় ঘর নদীর ধারে ধারে বা মাঠের মধ্যে বাবুলকাঁটার বনে বা বুনো কুল ? ঝোঁপের মধ্যে ছাদ-ভাঙ্গা অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে, তাদের ভাঙ্গা দেউলের ফাটলে ফাটলে জীউলি—অশ্বথের বড় বড় গাছ গজাইয়াছে, তাদের মেজেতে ঘন বক্তকুঁচের দুর্গম, কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল ঠেলিয়া—প্রবেশ করে এমন সাধ্য শিয়াল-কুকুরেরও নাই। অথচ ? ৬০/৭০ বৎসর পূর্বে এ-সব স্থানে ঘাড সোজা করিয়া হাঁটে এমন অসমসাহসী পুরুষ বড দেখা যাইত না—কারণ তখন এখানে দোর্দণ্ডপ্রতাপ কুটীয়াল জন্ লারমার্ রাজত্ব করিত। এ অঞ্চলের অত্যন্ত বৃদ্ধ এক-আধজন লোকে এখনও সে-সব দিনের গল্প করিতে পারে—কিরূপে ? সাহেব বিদ্রোহী প্রজাশাসন করিবার জন্য ? গাঁ ও মাধবপুর এই দুই গ্রাম একরাত্রে জ্বালাইয়া দিয়াছিল, কি করিয়া নিশ্চিন্তপুরের মহামাননীয় মজুমদার বাটীর হর মজুমদারকে কুঠীতে লইয়া যাওয়ায় গ্রামে গ্রামে হুলুস্থূল বাঁধিয়া গিয়াছিল এবং কিরূপে প্রায় দুই মাস মোল্লাহাটীর কুঠীর চূণের দাগ ? ?”

“কুঠীর এক গোপন কোণ হইতে কুঠী ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ২০/২২ বৎসর পরে, রাশীকৃত মানুষের কঙ্কাল বাহির হইয়া পড়ে, কিরূপে এক গ্রামের মোড়লকে শাস্তি বিধান করিবার উদ্দেশ্যে তাহার দেহের একাংশ একটি অবনমিত বৃক্ষশাখায় বাঁধিয়া অপরাংশ অন্য একটি উক্তরূপ বৃক্ষশাখায় বাঁধা হয় এবং সকল লোকের চোখের উপর হতভাগ্য প্রজার দেহ দুইভাগে ছিন্ন করিয়া দু'দিকের বৃক্ষশাখা দুটি সশব্দে ও সতেজে পূর্বস্থানে ফিরিয়া গিয়াছিল—ইত্যাদি গল্প এখনও এ অঞ্চলের এক আধ-জন বৃদ্ধ লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

নিশ্চিন্তিপুর হইতে নবাবগঞ্জ পর্যন্ত বাঁধা সড়ক লারমার সাহেবেই বাঁধাইয়া দেয়, যখন এই পথে লারমার টমটম হাঁকাইয়া যাইত, দূর হইতে সাহেবকে আসিতে দেখিয়া প্রজাবর [?] তাড়াতাড়ি সড়ক ছাড়িয়া দিয়া পার্শ্ববর্তী মাঠে নামিয়া পড়িত—হিংস্র জন্তুকে লোকে যেমন দূরে করিয়া চলিতে চায়, তেমনি পারতপক্ষে কেহ সাহেবের ত্রিসীমানায় কোনদিন ইচ্ছা করিয়া ঘেঁষিতে চাহিত না। লারমার সাহেব দেখিতে অত্যন্ত দীর্ঘকায়, অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিল, মুখ অত্যন্ত লাল, ঘাড় খাটো, রাগিলে স্থূল ও খাটো, লাল রঙের গলার মধ্য হইতে ক্রুদ্ধ বৃষের মত কর্কশ ও গম্ভীর নিনাদ বাহির হইত। লারমার সাহেব ভয় কাহাকে বলে কখনো জানিত না, তাহার কর্মপটুত্বও ছিল অদ্ভুত রকমের। ১৫৭৭ [?] সালের নীল-বিদ্রোহের সময় যখন সব কুঠীর নীলের দাদন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তখন এক নিশ্চিন্তপুরের কুঠীতেই কেবল পুরা মরসুমে নীল কাটা [?] ও খিতানো চলিতে-

ছিল ? ? । লারমার সাহেবের মত আকৃতিবিশিষ্ট লোককে অস্ট্রেলিয়ার জনহীন দিক্‌দিগন্তহীন মরুভূমিতে স্বর্ণান্বেষী ধনানুসন্ধিৎসু রূপে হিসাবে ? বা দক্ষিণ আফ্রিকার[১] কোন সিংহসঙ্কুল, সীমাহীন বিজন মরুপ্রান্তস্থ কোনো কৃষিক্ষেত্রের কর্তা-রূপে মানাইতে পারিত—কিন্তু বাংলাদেশের নিতান্ত নিরীহ গ্রাম্যনদী ? পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র পল্লীটির মাঠে ভাঁট, বাবুল, কদম. শিমুল ফুলের মধ্যে জন লারমারকে সম্পূর্ণ বেখাপ ঠেকিত নিশ্চয় ।

জন লারমারের নিজ বাংলোয় এখন আর কিছুই নাই—ইটকাঠের স্তূপ হইয়া বহুদিন জঙ্গলাবৃত অবস্থায় পড়িয়াছিল [।] পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা ২/১ গাড়ি করিয়া ইট লইয়া লইয়া তাহাকে বহুদিন হইল নিঃশেষ করিয়াছে । জন লারমারের পূর্ব পত্নীর সমাধি অনেকখানি অবধি বর্তমান ছিল, বহু বৎসর হইল তাহাও নদী-গর্ভে অন্তহিত হইয়াছে, বর্তমানে নদীর ধারে লারমার সাহেবের শিশুপুত্রের সমাধিটি অপেক্ষাকৃত অক্ষত অবস্থায় আছে মাত্র । এ সম্বন্ধে একটি কথা এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে । তাহা এ স্থলে বলা আবশ্যক ।

জন লারমার যৌবনাবস্থায় এক পর্তুগীজ ইহুদী রমণীকে বিবাহ করিয়াছিল, উক্ত স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাইবার পরে নিকটস্থ কুঠীয়াল এণ্টুনি সাহেবের বিধবা স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করে ও এই বিবাহের ফলে তাহার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে । এই পুত্রটি আকৃতিতে ও স্বভাবে পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া উঠিল—শুনা যায় তাহার শিশু শরীর যেমন নবনীর মত কোমল ছিল, তাহার মনটি ছিল তাহার অপেক্ষাও নরম ও স্নেহমায়াপূর্ণ । তাহার কোঁকড়া ২ সোনার মত রং-এর চুল, তুলি দিয়া আঁকা দীর্ঘ ভুরু—নীচের আয়ত চোখ দুটিও সুন্দর—মুখখানি এখনও মনে করিতে পারে এমন প্রাচীন লোক এখনও এ অঞ্চলে আছে । তাহারা বলে

[১] এই পাতার পাণ্ডুলিপির অপর পৃষ্ঠায় লেখা—"প্রত্যুত লারমার সাহেবের মত নির্ভীক কর্মপটু দুর্ধর্ষ লোকের আবশ্যক ছিল অন্যস্থানে—হয়ত অস্ট্রেলিয়ার কোন জনমানবহীন দিকবিদিকশূন্য অজ্ঞাত মরুপ্রান্তরে স্বর্ণানুসন্ধিৎসু রূপে তাহার আবশ্যক ছিল—হয়ত দক্ষিণ আফ্রিকার ? হইতে বহু সহস্রক্রোশ দূরবর্তী নরখাদক সিংহ সরিসৃপসঙ্কুল কোনো সুবিশাল অরণ্যানীর প্রান্ত—ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রের ক্যাকটাসে ঘেরা বাংলার বারান্দায়—ঢিলে পাজামা ও Strawhat পথে তাহার আকৃতি বেশ খাপ খাইতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশের নিতান্ত নিরীহ, ক্ষুদ্র, লজ্জাশীলা, গ্রাম্য নদীতীরস্থ মাঠে শিমুল, বাবলা, কদম, বনভাঁট ফুলের উপবনের মধ্যে জন লারমারকে নিতান্ত খাপছাড়া ও বেমানান দেখাইত সে বিষয়ে সন্দেহ ।"

দেবশিশুর মতই সে সুন্দর ও মধুর প্রকৃতির ছিল।

একবার এক কুলীরমণীর প্রতি কি কারণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সাহেব তাহার খানসামা কার্ত্তিককে বলে ইহাকে শ্যামচাঁদ পেটা করিবে। হতভাগিনী অন্তঃসত্ত্বা ছিল। মার খাইতে ২ সে যখন ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে, তখনও তাহার প্রতি চাবুকাঘাতের বিরাম ছিল না। ক্রমে সে যখন প্রায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছে, সেই সময় ধাত্রী লারমারের শিশুপুত্রটিকে লইয়া সাহেবের নিকট আনে—তখন ছেলেটি ৫।৬ বৎসরের। এই নিষ্ঠুর ব্যাপার দেখিয়া বালক অজ্ঞান হইয়া পড়ে—তৎক্ষণাৎ তাহাকে কুঠীতে বারান্দায় উঠাইয়া শুশ্রূষা ইত্যাদি করানো হয়—সে রাত্রেই তাহার ভয়ানক জ্বর হয়—ক্রমে জ্বর বিকারে পরিণত হইয়া ছেলেটি মারা যায়। বিকারের ঘোরে ছেলেটি বারবার মারিও না, ও মরিয়া যাইবে, আর মারিও না বলিয়া বহুবার চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল।

লারমার সাহেব এই একমাত্র বৃদ্ধ বয়সের সন্তানটিকে অত্যন্ত ভালবাসিত। এই শোকাবহ ঘটনার পর সাহেব অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া পড়ে, সাহেবের স্ত্রীও তাহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়া জয়পুরের কুঠীতে তাহার ভ্রাতার নিকট বাস করিতে থাকেন এবং কয়েক মাস পরে সেখানেই মারা যায়। ২।৩ বৎসরের মধ্যেই লারমার সায়েবকে কুঠী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়।

? নদীর ধারে এই শিশুর সমাধি এখনও আছে। সমাধিটি বন্যগাছপালায় প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—ঝোপের মধ্য হইতে উপরকারের অগ্রভাগটা দেখা যায়। বৈঁচি ও শিয়াকুল কাঁটা ঠেলিয়া মধ্যে প্রবেশ করিলে কাল স্লেট পাথরের নিম্ন-লিখিত কথা কয়েকটি ইংরেজিতে দেখা যাইবে—

Here lies Edwin Lermer
the only son of John & Mrs Lermer
Born………&

এ সম্বন্ধে আর একটি প্রবাদ এখানে উল্লিখিত হইল।

লারমার সাহেব কুঠী উঠাইয়া দিয়া চলিয়া যাইবার প্রায় ২০ বৎসর পরে, কুঠীর বাড়ীর ঘরদোর যখন পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাবৃত হইয়া গিয়াছে, সেই সময় একদিন পার্শ্ববর্তী গ্রামের হর মজুমদারের পুত্র স্বরূপ মজুমদার মহাশয় নৌকাযোগে তাঁহার বৈবাহিক বাটী রামনগর হইতে স্বগ্রাম পোলতায় ফিরিতেছিলেন। ইতিপূর্বে সন্ধ্যা হইলেও সুমুখ [?] জ্যোৎস্নারাত্রি থাকায় মাঠঘাট বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। কুঠীর নীচে দিয়া আসিতে আসিতে স্বরূপ মজুমদার মহাশয় লক্ষ্য করিলেন নদীর ধারে সমাধির কাছে কে যেন অত্যন্ত একমনে দাঁড়াইয়া কি লক্ষ্য করিতেছে বা ঐ-

রূপ কিছু। নির্জন কুঠীর ধারে কে এত রাত্রে কি করিতেছে দেখিবার জন্ম স্বরূপ মজুমদারের অত্যন্ত কৌতূহল হইল, মাঝিদিগকে তিনি নৌকা ভিড়াইতে বলিলেন। মাঝিরা প্রথমে তাঁহাকে বারণ করে কারণ কুঠীর ত্রিসীমানায় লোকালয় ছিল না, তাহা ছাড়া কুঠীর মাঠে ভূতের ভয় করিয়া [?] জনপ্রবাদও ছিল [।] যাহা হউক ? নৌকা ডাঙায় বাঁধা হইল। মজুমদার মহাশয় ডাঙায় উঠিয়া ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। ত্রিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি পিতার নিকট [কাটতে ভুলে গিয়েছেন] সহিত কুঠীতে অনেকবার গিয়াছিলেন—যদিও সম্মুখস্থ মূর্তি অনেকটা শীর্ণ, অনেকটা অবনমিত, অনেকটা অন্যরূপ হইয়া গিয়াছিল এবং মাথার চুলও যদিও সবই শুভ্র হইয়া পড়িয়াছে, তবুও মজুমদার মহাশয়ের সন্দেহ রহিল না যে ইহা অন্য কেহ নহে—স্বয়ং কুঠীয়াল জন লারমার। মজুমদার মহাশয় প্রথমতঃ নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না কারণ ২০ বৎসরের উপর হইল লারমার কুঠী উঠাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ জানিত না—সে দণ্ডায়মান মূর্তি হঠাৎ তাহাদের লক্ষ্য করিল। মজুমদার মহাশয়ের মনে হইল লারমার সাহেবের চোখে তিনি জ্যোৎস্নায় অশ্রুপূর্ণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন—যাহা হউক তিনি কিছু বলিবার পূর্বেই, সেই অতি বৃদ্ধ, অবনমিত, শীর্ণ ও বিষণ্ণ মূর্তি ধীরে ধীরে কুঠীর মাঠের মধ্যেকার অপেক্ষাকৃত ঘন বনের দিকে অগ্রসর হইল। মাঝিরা তাঁহাকে আর যাইতে না, সকলেই বলিল উহা লারমার সাহেবের প্রেতাত্মা ছাড়া আর কিছুই নহে—কিন্তু স্বরূপ মজুমদারের মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল যে তিনি যাহাকে দেখিয়াছেন সে জীবিত লারমার ছাড়া আর কেহই নহে। তবে কোথা হইতে কিরূপে এতকাল পরে সে প্রাচীন অবস্থায় পুনরায় তাহার প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার যৌবনকালীন লীলাক্ষেত্র দেখিতে ফিরিয়া আসিয়াছিল, সে সম্বন্ধে স্বরূপ মজুমদার বা তাঁহার শ্রোতাদিগের কোন ধারণা ছিল না।'

'সে যাহা করে [?] কুঠীর অন্য সমস্ত গাঁথুনির অপেক্ষা এই সমাধিটি জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া গেলেও এখনও অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় আছে।

আজ ২০ বৎসর ধরিয়া সকালসন্ধ্যায় কত বসন্তের নূতন বাতাস ভগ্ন, পরিত্যক্ত সমাধির উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, কত পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, কত অস্ত সূর্যের মৃদু আলো সমাধি প্রস্তর তাহাদের কিরণে অভিনন্দিত করিয়াছে। কত নূতন পুরাতন গাছ কত বৎসর ধরিয়া তাহার উপর পুষ্পদল বর্ষণ করিয়াছে। নির্জন মাঠের সঙ্গীহীন ঘুমন্ত শিশুটির প্রতি করুণায় তাহার স্নেহমমতায় এইরূপ নিঃশব্দে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া দিয়া আসিতেছে—এখনও চৈত্র বৈশাখ মাসের সন্ধ্যায় অন্য অন্য গাছপালার মধ্যে একটি বন্য সোঁদালি গাছ থোলো থোলো হলুদ রঙের

ফুলের ঝাড় দুলাইয়া সমাধির উপর স্নেহনম্র নয়নে দাঁড়াইয়া আছে [?]—হয়ত সে চলিয়া যাইবার সময় তাহার অন্য কোন ? ভক্ত [?] যে এ ? ?—মাতৃপিতৃ-পরিত্যক্ত শিশুটিকে তাহার কেহই অবহেলা করিবে না।'

পাণ্ডুলিপিতে জরিপের প্রসঙ্গে কুঠির মাঠ, কুঠিয়াল লারমার ও তার শিশুপুত্রের সমাধি ব্যাপারটি বিস্তৃতভাবে এসেছে। প্রচলিত সংস্করণে জরিপ প্রসঙ্গ কিন্তু অনেক পরে এবং কুঠির মাঠ ও শিশুপুত্রের সমাধি ব্যাপারটি প্রায় গ্রন্থারম্ভেই অপুর নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে যাওয়ার উপলক্ষে।

প্রচলিত সংস্করণে বিভূতিভূষণ লারমার সাহেবের কাহিনীকে খুব ছোট করে নিয়ে এসেছেন। আনারই কথা। কারণ লারমারের দোর্দণ্ড প্রতাপের পরিচয় অথবা অলক্ষ্যে শিশুপুত্রের পরিত্যক্ত সমাধি দেখতে আসা—কোনটাই গ্রন্থের পক্ষে খুব প্রয়োজনীয় নয়। দরকার শুধু নীলকণ্ঠ পাখির মতই হলুদ করুণ সোঁদালিগুলো। অপুর রূপাভিসারে তারা একান্ত প্রয়োজনীয়। বিভূতিভূষণ তাকে বাদ দেননি।

পথের পাঁচালীর দ্বিতীয় সংযোজন পটু। প্রথম পাণ্ডুলিপিতে সে ছিল না। প্রচলিত সংস্করণের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে পটুর ভূমিকা অর্থাৎ জেলেপাড়ায় কড়ি খেলতে যাওয়া এবং জেলে ছেলেদের হাতে মার খাওয়া—সবটাই আগে অপুকে দিয়ে করা হয়েছিল। পরে বিভূতিভূষণ পটুকে এনেছেন। এবং তাকে শুধু পথের পাঁচালীতেই নয়, অপরাজিততেও রেখেছেন।

পথের পাঁচালীর প্রথম পাণ্ডুলিপিতে কড়িখেলার ঘটনাটি ছিল অন্যরকম।

'দশবারো খানা উলুখড়ে ছাওয়া দরমার বেড়া ঘেরা ঘর এই মাঠের মধ্যে একস্থানে অথচ একটু দূরে দূরে অবস্থিত। ইহাই জরীপের তাঁবু। সকালবেলা তাঁবুতে খুব ব্যস্ততার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। মুহুরী, কারকুন, কানুনগো, আমীনের দল ব্যস্তভাবে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে, তাঁবুর কোন ঘরে আগুন লাগিলে ইহার অপেক্ষা অধিক ব্যস্ততা ইহারা দেখাইতে পারিত না। পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকজনেরা ২।১টি করিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছে—জরীপের মুহুরী বা কারকুন অধিকাংশই পূর্ববঙ্গনিবাসী—তাহাদের খুব খাতির করিতেছে। জনৈক কর্মচারী গামছা পরিয়া নিজের ঘরের দাওয়ায় রান্না চড়াইয়া দিয়াছে, সে বকিতেছে—বা রে রোজ রোজ আমি কাঠ কুড়িয়ে মরবো আর মজা করে সব নিয়ে যাবে—নিয়ে গেলেই হোল না ? পরে পার্শ্বের দরমা-ঘেরা ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—শরৎবাবু আর এরকম লন্ না যেন কোনদিন—আমি মরি কুড়িয়ে আর—

দরমা-ঘেরা ঘরের আড়ালেও বোধ হয় অন্য কেহ রাঁধিতেছিল—উত্তর দিল—তোমার কাঠ কুড়িয়ে আমি লইতে গ্যালাম ক্যান্ ? আমার হাত নেই, আমি

কুড়ুতে পারিনে? নিয়ে? যাও গিয়ে—ডিপ্‌টী সাহেবের কাছে নালিশ করেন গিয়া য্যান্‌—

একটি ঝগড়া সুবিধামত বাধিতে পারিল না, গোড়াতেই ভাঙিয়া গেল, কারণ এ সময় একটি প্রজা হাতে একটি লাউ ঝুলাইয়া রন্ধনরত অথচ দৃশ্যমান মুহুরীটির দাওয়ার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল—কহিল—গ্যালাম, আমীনবাবু লাউ তো গাছে হয়েল—তাই ভাবলাম যাই গিয়ে—

মুহুরীটি (অথবা আমীন) নিম্নস্বরে বলিল—চুপ চুপ এখুনি ডেপুটী সায়েব বেরুবেন—পরে সে ৪।৫ খানা ঘরের পরে কিছুদূরবর্তী একটা ঘরের দিকে সতর্কতার সহিত চাহিয়া দেখিয়া বলিল—দেখি লাউ আমার হাতে দ্যাও—পরে সে লাউটি হস্তে দ্রুতবেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মুহূর্ত মধ্যেই বাহির হইয়া আসিয়া উচ্চৈস্বরে বলিল—এই যে মোড়ল, সকালে কি মনে করে? বসো দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

কয়েকখানি ঘরের পরে একখানি অপেক্ষাকৃত বড় ঘরে ভীতি ও আশঙ্কার আধার এই ডেপুটী সায়েব অর্থাৎ এই ডেপুটী সেটলমেণ্ট অফিসার শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাঁহার প্রাভাতিক ক্ষৌরকার্য সমাধা করিতেছিলেন। তাঁহার ঘরের এক কোণে একখানি ক্যাম্প খাট, তাহাতে একটি বিলাতী ফুলতোলা? পাতা বিছানা ও ঝালর দেওয়া মাথার বালিশ। অন্য কোণে একটি ক্যাম্প টেবিল ও দুখানি ক্যাম্প চেয়ার। টেবিলটিতে একটি ছোট ফটো—ক্যাবিনেটে একটি নব-বিবাহিত দম্পতির ফটো এবং পাত্রের ফটো দেখিয়া যতটা মনে হয়, ইহা খোদ শ্রীযুক্ত ডেপুটী সাহেবেরই ফটো ছাড়া দ্বিতীয় কাহারও [?] নহে। ফটো ছাড়া টেবিলের উপর একটি রিস্টওয়াচ, তাহাতে ৮টা বাজিয়া ১১ মিনিট হইয়াছে, খান পাঁচেক পুরাতন চিঠি, দুখানা তুলার গদি-আঁটা সোনার জলে নামলেখা? বাংলা উপন্যাস—৫।৬ দিনের পুরাতন একখানি 'Statesman' পত্রিকা (এখানি তাঁহার নবাগত বন্ধু এখানে আসিবার দিন গাড়ীতে পড়িবার জন্য শেয়ালদহ স্টেশনে ক্রয় করিয়াছিলেন) ও দু তাড়া অফিসের লালফিতা বন্দী কাগজ-পত্র। ঘরের দেওয়ালের গায়ে ১৷৷০ টাকা মূল্যের র‍্যাকে একটি সোলার হ্যাট ও দুটি ছড়ি, ও একটি খাকির হাফ-প্যাণ্ট ও কোট ঝুলিতেছে। তাহা ছাড়া ঘরের মধ্যে একটি বড় স্টীল ট্রাঙ্ক, দুটি চামড়ার সুটকেশ, একটি বেতের ঝাঁপি দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি নীরদবাবু ঘরের বাইরের দাওয়ায় মাটিতে বসিয়া সামনে আয়না রাখিয়া দাড়িতে সাবান মাখিয়া মুখ অত্যন্ত বিকৃত করিয়া ক্ষুর টানিতেছেন অপর দিকে তাঁহার নবাগত বন্ধুটি শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র গাঙ্গুলী স্টোভ জালিবার দুরাশায় অনবরত স্পিরিট ঢালিতেছেন ও

দিয়াশালাই জ্বালিতেছেন ও স্পিরিটটুকু জ্বলিয়া ফুরাইয়া গেলে পুনরায় স্পিরিট ঢালিতেছেন।

নীরদচন্দ্র কামাইতে ২ বন্ধুর কাণ্ড দেখিয়া বলিলেন—এক বোতল যে প্রায় কাবার করে তুললে? ওসব কবিত্বের কর্ম নয়—রেখে দাও, আমি কামিয়ে নি আগে।

নিজের অকর্মণ্যতার উপলব্ধি করিয়া বন্ধু অপ্রতিভ হইয়া সরিয়া বসিলেন। নীরদবাবু দাড়ি কামানো সমাধা করিয়া ষ্টোভের পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলেন। বলিলেন—যতীশ, এক কাজ কর তো kindly, বেতের বাস্কেটটার মধ্যে wrench টা আছে, বার করে নিয়ে এস তো।

যতীশবাবু উক্ত যন্ত্রের সন্ধানে গৃহমধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

এমন সময়ে দেখা গেল তিনটি ছেলে তাঁবুর দিকে আসিতেছে—ইহারা অন্য কেহই নহে—সুনীল, অন্নদা রায়ের ছোট ছেলে ফণি ও অপু। সেদিন অন্নদা রায়ের বাটী নিমন্ত্রণে যাইয়া ডেপুটীবাবু ও তাহার বন্ধু কথায় কথায় জানিতে পারেন যে এই গ্রামেই নরেন্দ্রনাথ রায়ের বাটী। ডেপুটীবাবুর বন্ধুটির পিতা কমলকৃষ্ণ গাঙ্গুলী লাহোরে কমিশারিয়েটে বড় চাকরী করিতেন সেই উপলক্ষে দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠতা খুব বেশী ছিল। কাজেই যতীশবাবু'

'এই সন্ধান পাইয়াই সুনীলদের বাটী খুঁজিয়া বাহির করিয়া সুনীলের মা (ইহাকে পূর্ব হইতেই যতীশবাবু খুড়ীমা বলিয়া ডাকিতেন) ও সুনীলদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছেন। এই উপলক্ষে খোদ শ্রীযুক্ত ডেপুটীবাবুর সহিতও উহাদের অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠতা হইয়া গিয়াছে এবং সুনীল প্রভৃতি ছেলেদের সহিতও খুব আলাপ হইয়া গিয়াছে। এক মাত্র অপুর সহিত ইহাদের পরিচয় একটু অন্য-ভাবে ঘটিয়াছিল, উহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

৫।৬ দিন পূর্বের কথা। সেদিন দুপুর বেলা হরিহর আহারাদি সারিয়া হাট করিতে বাহির হইলেও সর্বজয়া ম্যালেরিয়া ক্লান্ত শরীরে একটুখানি আঁচল পাতিয়া ঘুমাইয়া পড়িলে, অপু (বসিয়া পড়িতে আদিষ্ট হইলেও) ঘাটী আগলাইবার কেহ নাই দেখিয়া, ৬টি মাত্র কড়ি সঙ্গে করিয়া সে একেবারে একদৌড়ে গাঙ্গুলীপাড়ার জঙ্গল ও মজুমদার পাড়ার অধিকতর ঘন জঙ্গল ভাঙিয়া একেবারে জেলেপাড়ায় উপস্থিত হইল। কড়িখেলার উপর অপুর খুব ঝোঁক ছিল এবং তাহার বিশ্বাস ছিল যে তাহার হাতে টীপ এত বেশী যে কড়িখেলায় তাহার জিত অনিবার্য। নিজ পাড়ায়, গাঙ্গুলীপাড়ায় ও মজুমদার পাড়ায় সে অনেক খেলিয়াছে ও অনেক কড়ি জিতিয়াছে, এসব স্থানে জিতিবার মত কড়িও আর বেশী নাই, বিশেষতঃ উহার

প্রতিভার উপযোগী প্রতিদ্বন্দ্বীই বা কোথায়? দিগ্বিজয়ের অদম্য আকাঙ্ক্ষায়, বীরোচিত উচ্চাশায় মুগ্ধ হইয়া সে সেদিন বনজঙ্গল ছাড়াইয়া গ্রামের প্রান্তে যখন উপস্থিত হইল তখন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে দুপুরবেলা [।] জেলেরা যাহার যাহার ঘরে আহারাদি সারিয়া সকলে শুইয়াছে, কেউ কেউ হাটে বাহির হইয়া গিয়াছে। অপু জেলেপাড়ায় পূর্বে কখনও আসে নাই, কাহাকেও বড় চিনে না, তথাপি সে এবাড়ী সেবাড়ী ঘুরিতে লাগিল। প্রথমে দুকড়ি জেলের ছেলেকে সমবয়সী দেখিতে পাইয়া বলিল—ওই, কড়ি খেলবি? ধীবরনন্দন কাছে আসিয়া বলিল—কটা কড়ি?—অপু নিজের পুঁজি দেখাইল—৬টি মাত্র। ধীবরপুত্র তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিল—"ছটা মোটে? ওতে আর খেলবে কি ঠাকুর?" অপু জানিত সে হারিতে আসে নাই, জিতিতে আসিয়াছে সুতরাং বেশী আনিবার আবশ্যক কি? কিন্তু তাহা বলা চলে না, জানাইল প্রয়োজন হইলে বাড়ী হইতে আনিবে। ধীবরপুত্র তাহাতে ভুলিল না, বলিল, খেলবো না। অপু আরও ৩।৪ বাড়ী ঘুরিল, কেহ বলিল এত রদ্দুরে আবার খেলা কি? কেহ বলিল এখনি বাবার সহিত নৌকা বাহিতে বাহির হইতে হইবে, কোনো কোনো অভিভাবক ধমক দিয়া কহিল—যাও যাও ঠাকুর, বাড়ী যাও, ঠিক দুপুর রোদে এসেচে কড়ি খেলতে। বামুনপাড়ার ছোঁড়াগুলো আমাদের গাঁয়ে সব আমাদেরই?—

অনেক স্থানে ঘুরিয়া ও বিফল মনোরথ হইয়া অবশেষে বুধ পাড়ুইয়ের ছেলে পঞ্চা খেলিতে স্বীকার করিল। অপু দু এক দান খেলিল ও জিতিয়া লইল। ক্রমে ক্রমে সে ক্রমাগত জিতিতে লাগিল। পঞ্চা একবার হারিয়া গিয়া আরও কতকগুলি কড়ি বাহির করিয়া আনিল ও ক্রমে ক্রমে সেগুলি হারিল। ক্রমে আরও অনেক খেলুড়ে আসিয়া জুটিল, অপুর কাছে সকলে হারিতেই লাগিল। ৬টি কড়ি হইতে অপুর প্রায় এক পণের কাছাকাছি কড়ি হইয়া দাঁড়াইল। এত কড়ি অপু পূর্বেও কখনও জিতে নাই, একত্রও কোনদিন দেখে নাই, সে অত্যন্ত আহ্লাদে সেগুলি কোঁচার কাপড়ে বাঁধিয়া হাত দিয়া অনুভব করিতেছে, এমন সময় জেলেপাড়ার ছেলেগুলি (প্রায় সকলেই অপু অপেক্ষা বয়সে বড়) কি পরামর্শ করিল। একজন আগাইয়া আসিয়া বলিল—এই ঠাকুর, কড়ি নিয়ে কোথায় যাবি? বের কর্ কড়ি।

এত কড়ি ইতিপূর্বে কোনোদিন সে জিতে নাই, তখন সে কড়িগুলি মহা আহ্লাদে কাপড়ের খুঁটে বাঁধিতেছে, অবাক হইয়া কহিল—বারে—আমি জিতলাম, বার করবো কেন?

আরও দুইজন আরকফলা-মার্কা ছেলে আগাইয়া আসিল—আঙুল দিয়া

দেখাইয়া বলিল—মনে ভেবেছ বুঝি ঠাকুর কড়ি জিতে নিয়ে আমাদের পাড়া থেকে পালাবে? তা হবে না—যা কড়ি এখানে রেখে যাও—

অপু বলিল—কেন রাখবো, বেশ তো, আমি যে জিতলাম। তোমরা যদি জিততে আমি চাইতাম নাকি? তোমরা এখনও খেলো না, আমি তো জিতে পালাচ্ছি নে, কড়ি আনো না, আমি বলচি তো এখনও খেলবো।

তখন ৫।৬টি ষণ্ডামার্কা ছেলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। একজন বলিল—ঘুঘু দেখেচো, ফাঁদ দেখোনি ঠাকুর, সব কড়ি এখানে রেখে তবে বাড়ী যাও নয়তো এক বাঁশের চটায় একেবারে ঠ্যাং খোঁড়া করে ছেড়ে দেবো, জানো না? এখান থেকে কড়ি নিয়ে তুমি পালাবে?

অপুর বাপের অবস্থা যদি ভাল হইত, ছেলেদের সাহস হইত না তাহারা ব্রাহ্মণ-পাড়ার কোনো ছেলেকে এরূপ করিয়া বলে। কিন্তু কে না জানে যে অপুর বাবা হরিহর গরীব ও তাহার উপর খোঁড়া। তাহার ছেলেকে মারিলে কি হইবে, কিছুই না। হরি খোঁড়ার ক্ষমতা কি কিছু করিবার? অপু এ মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞ ছিল না, সে বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া শেষ উপায় অবলম্বন করিল। বলিল—নাও না কড়ি কেড়ে? এখ্‌খুনি বাড়ী গিয়ে বাবাকে বলে দেবো না? দেখবে এমন মজা।—

সকলে হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল—হঃ হরি খোঁড়া সব করবে আমাদের, মারে ভয়ে যাবো কোথায়, পিঁপ্‌ড়ের গর্তে লুকোবো নাকি?—দু একজন কথায় কাযে সামঞ্জস্য দেখাইবার নিমিত্ত উক্ত প্রাণীর আবাসস্থান সন্ধানে ইতস্তত ধাবিত হইবার অভিনয় করিল। কিন্তু এখানে সকলেই সুকুমার শিল্পকলার প্রতি আকৃষ্ট নহে, এই শ্রেণীর একটি ছেলে আসিয়া অপুর মুখে [?] ধাঁ করিয়া এমন এক চড় কশাইল, যে, সে একেবারে দুই তিন হাত জমি ঘুরিয়া গিয়া পড়িল—কিন্তু তখনও সে প্রাণসমপ্রিয় পুঁটুলি ছাড়ে নাই, ভয়বিহ্বলভাবে প্রাণপণে দুই হাত দিয়া আঁকড়াইয়া রাখিয়াছে। আর একজন আসিয়া তাহাকে আর একটি চড় কষাইয়া তাহাকে চীৎ করিয়া শোয়াইয়া ফেলিল ও তাহার হাত সজোরে ছাড়াইয়া দিয়া কড়ির পুঁটুলী ধরিয়া টান মারিল—কড়িগুলি ছড়াইয়া পড়িয়া গেল—বাকী সকলে টপাটপ সেগুলি কুড়াইতে প্রবৃত্ত হইল। ঠিক সেই সময়ে ডেপুটী সেট্‌লমেণ্ট অফিসারের বন্ধু যতীশবাবু এক আর্দালী সঙ্গে পাশের পথে উপস্থিত হইলেন—ইনি গ্রামের জঙ্গলে শজারু পাওয়া যায় শুনিয়া বন্দুক হাতে উক্ত প্রাণী শিকার করিবার দুরাশায় উৎফুল্ল হইয়া দুপুরে রৌদ্রেই অপুর মতই বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু তিন চারটি বড় ছোট আমবাগান বাঁশবাগান খুঁজিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে যাইতে দূর হইতে দেখিতে পাইলেন একটি ছোট ছেলেকে ৫।৬টি ছেলেতে

মিলিয়া খুব মারিতেছে।

ইহারা নিকটে আসিয়া পড়িতেই জেলেপাড়ার দল যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া অদৃশ্য হইল। ভীতিব্যাকুল চোখের দিশাহারা দৃষ্টি দেখিয়া যতীশবাবু ছুটিয়া গিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন—দেখিলেন ৫।৬ বৎসরের ছোট ছেলে, দুই রগে ফর্সা রঙের উপর পাঁচটা আঙুলের দাগ রক্তে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে—বড় বড় চোখ দুটি ভীতিব্যাকুল দিশাহারা ভাব। এই (সুন্দর) সুকুমার নিষ্পেষিত অসহায় শিশুটি যে এ পাড়ার নহে তাহা ইহাদের বলিতে হইল না—মার খাইয়া অপু দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছিল? এ রকম মার সে কখনো খায় নাই, চড়ের চোটে তাহার মাথা তখনও ঝন্‌ঝন্‌ করিতেছে।

যতীশবাবু সস্নেহে তাহার গায়ের ধূলা ঝারিয়া [ঝাড়িয়া] দিতে অপুর হঠাৎ বড় কান্না আসিল। কিন্তু তাহা সে চাপিয়া রাখিল, কাঁদিল না—যতীশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কড়িগুলো তোমার না খোকা?—আচ্ছা দাঁড়াও কুড়িয়ে দিচ্ছি—ভূপতিত কড়িগুলি কুড়াইয়া তাঁহার উপরে [?] তাঁহার [তাহার] কোঁচার খুঁটে বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন—চল খোকা তোমার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসি—এরকম জায়গায় একলা আসতে আছে কখনো? আর কখনো এসো—

পরে হাত ধরিয়া তিনি অপুকে তাহাদের বাড়ীর দোর পর্য্যন্ত আসিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

ছেলের দল কাছে আসিলে যতীশবাবু অপুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—এস এস খোকা,—কি তুমি আর কি কড়ি খেলতে যাও?

অপু স্বভাবতঃ লাজুক, কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না।

নীরদবাবু বলিলেন—এ খোকাটি বেশ দেখতে, মুখখানা ভারি সুন্দর—তোমাদের বাড়ী কোথায় খোকা?

অপুর গায়ের রং ও বড বড় সুশ্রী চোখ দুটি ও মুখের সুকুমার লাবণ্য, তাহার মায়ের নিকট হইতে পাইয়াছিল, কারণ সর্বজয়া অতি গরীবের ঘরের মেয়ে হইলেও এক সময় সে দেখিতে ভালই ছিল। এখন অবশ্য রোগে, অযত্নে, দারিদ্র্যে, সংসারের খাটুনিতে শ্রীর কিছুই নাই—তবু এক সময়ে সে যে সুন্দরী ছিল, ইহা তাহার বর্তমান চেহারা দেখিয়া অনুমান করা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

সুনীল উত্তর দিল—এ আমার ভাই হয়, আমার কাকাবাবুর ছেলে, এক বাড়ীতেই বাড়ী।

যতীশবাবু অবাক হইয়া গেলেন—বল কি হে? তা তো জানিনে—হ্যাঁ হ্যাঁ সেদিন একে সঙ্গে করে তোমাদের বাড়ীর কাছেই রেখে এসেছিলাম বটে, তা ঐ

এক বাড়ীই যে বাড়ী তা কি করে জানবো? খোকাও তো আমায় কিছু বলেনি সেদিন—না খোকা?

তাহার পর ছেলেরা চা খাইতে অনুরুদ্ধ হইল। নীরদবাবু ষ্টোভে কিছু হালুয়া তৈয়ারী করিয়া ফেলিলেন। ঘরের মধ্যে বেতের ঝাঁপিটার মধ্যে পেঁপে ও শাঁক আলু ছিল (প্রজাদিগের দেওয়া) যতীশবাবু একখানি চা-বাগানের ছুরির সাহায্যে সেগুলির খোসা ছাড়াইয়া টুকরো টুকরো করিয়া কাটিলেন—ছেলেদের সকলকে দেওয়া হইল। ফণি চা খাইতে চাহিল না, সে কখনো খায় নাই—তাহার মুখে ভাল লাগে না, সে শুধু পেঁপে, শাঁক আলু ও হালুয়া খাইল।

সুনীল ঘরের মধ্যে কি আছে দেখিবার জন্য কৌতুহল [কৌতূহল] বশতঃ ঘরের মধ্যে ঢুকিল—অপু তাহার পিছনে পিছনে গেল—ফুলতোলা বিলাতী? বিছানার উপর দেখিয়া অপুর যা আনন্দ! এ রকম আসবাবপত্র সে কখনো দেখে নাই—যতীশবাবুর উপর একে তো সেই কড়িখেলায় জিতিবার দিন হইতেই তাহার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল—অদ্য তাহার উপর যতীশবাবুর হাতে রিস্ট ওয়াচ দেখিয়া পূর্বের আকর্ষণ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে পূর্ণ হইল। কেমন সুন্দর সাহেবদের মাথায় টুপীটা। ওটা কি পরে?—আচ্ছা গাছটা শাদা কেন? হাড়ের বোধ হয়। না?—কাঠের? —সে হাত দিয়া টিপিয়া দেখিবে—তাই তো! ভারি মজার তো—দূর হইতে যে হাড় বলিয়া মনে হয়। ওখানা কি? কেমন সুন্দর ছবিখানা।—পাঁজি? তো দেয়ালের গায়ে টাঙানো কেন? তাহাদের পাঁজি তো বাবার বাক্সের মধ্যে থাকে —জুতা জোড়া কেমন চকচকে দেখিতে। সে কখনো ঐ রকম জুতা পরে নাই— অনেকদিন হইল বাবা একবার ঘুন্টি দেওয়া বোতামওয়ালা জুতা নবাবগঞ্জ হইতে তাহার জন্য আনিয়াছিল—সে তখন আরও ছোট ছিল—তাহার মধ্যে রাঙা রং মাখানো, এদিক ওদিক বেড়াইয়া সে যেমন জুতা খুলিয়া রাখিত—তাহার মনে আছে, তাহায় পা দুখানা জুতার রং-এ রাঙা হইয়া যাইত—তাহার মা খেপাইত— খোকন আমার আলতা পরেচে, দ্যাখো ও মেজখুড়ী, খোকনের পায়ে কেমন আলতা। একথা তাহার মনে আছে। বাঃ ঐ বইখানা কিসের বই। এমন সুন্দর, এত বড় বই সে তো কখনো দেখে নাই—তাহাদের বাড়ী একখানাও বই নাই— সুনীলদার যে বই আছে, তাহাও এত বড় নয়—

অপু জিজ্ঞাসা করিল—ওখানা কি বই সুনু দাদা?

যতীশবাবু ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া wrench যন্ত্রটি যথাস্থানে রাখিতেছিলেন— বলিলেন, এস খোকা তোমাকে বইয়ের ছবি দেখাই। বইখানি তাঁহারই সম্পত্তি।

তিনি একটি বেতের চেয়ারে বসিলেন, অপুকে কাছে বসাইলেন—সুনীল ও

ফণি তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

বইখানি Sir Oliver Lodge-এর Pioneers of Science. তিনি ছবিগুলি একে একে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন—ইহা পৃথিবীর ম্যাপ, ইহা টেলিস্কোপ, টেলিস্কোপ কি জিনিস—ইহা বড় টেলিস্কোপের সাহায্যে লওয়া চন্দ্রমণ্ডলের ফটো-গ্রাফ—চাঁদের মধ্যের পাহাড় পর্বত (অপুর চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত) নক্ষত্রগুলি কি জিনিস—ধূমকেতু কাহাকে বলে—নিউটন কে ছিলেন—সূর্য কত বড়, পৃথিবী হইতে কত দূরে আছে, নক্ষত্রগুলি কত দূরে আছে, প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া? কথা তিনি ছবি দেখাইয়া দেখাইয়া বকিতে লাগিলেন।

নীরদবাবু বলিলেন—রাখো হে রাখো, ওসব চাপা দিয়ে রেখে দাও, বেলা দশটা বাজে, ওরা এল একটু বেড়াতে, তুমি ওদের নিয়ে বকুনি সুরু করে দিলে। বন্ধুর আপত্তি সত্ত্বেও আর প্রায় আধ ঘণ্টা পরে যতীশবাবু বকুনি থামাইলেন। ছেলেরা বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইলে দুই বন্ধুতে পুনরায় তাহাদিগকে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। অপুকে আদর করিয়া বলিলেন—তুমি আবার এস খোকা। ঠিক ঠিক আসবে তো?

অপুর এবার লজ্জা ভাঙ্গিল—সে বলিল—আপনিও আমাদের বাড়ী আসবেন —কবে আসবেন বলুন।—

যতীশবাবু বলিলেন—নেমন্তন্ন না কর্লে যাবো কেন খোকা?

অপু বলিল—আমি মাকে গিয়ে বলবো, আপনাকে নেমন্তন্ন কর্তে।

সকলে হাসিয়া উঠিল—অপু একটু অপ্রতিভ হইল। তাহার কথায় হাসিবার এমন কি কারণ আছে?

তাহার পর ছেলের দল বাড়ী চলিল। অপু অবাক হইয়া গিয়াছিল।

লাউকুমড়ার মাচার ফাঁকে, শেওড়া রাংচিতা বনের গণ্ডী পার হইয়া ফণি, নেড়ার কাকা, কড়ি-খেলা, ও পাড়ার রাণু, চড়কতলার মাঠের দুপুর রোদে বাখারির চটায় ধনুকবাণ তৈয়ারী করিবার [?] ছুঁড়িবার পরেও, মায়ের হাতের রান্না কচুর শাক ও বড়িভাজা ছাড়াইয়াও কোন্ দূরের জগৎ আবছাওয়া আবছাওয়া ভাবে তাহার শিশুদৃষ্টি আজ নূতন যেন দেখিতে পাইয়াছে। তাহার শিশুমন যেন নূতন ধরিতে পারিয়াছে...

আচ্ছা ও কথাগুলি সব সত্যি তো? সত্যি নিশ্চয় যে যে ছবি দেখিল। উহা ছাড়া যতীশবাবু যে বলিলেন—

চাঁদের মধ্যে পাহাড় পর্বত? আচ্ছা পাহাড়-পর্বত কি? উঁচু উঁচু মাটির ঢিবি তো? যেমন ঐ পালিতপাড়ার জঙ্গলের মধ্যে আছে? ঐরকম সব চাঁদের মধ্যেও

আছে? আশ্চর্য কাণ্ড!

বাড়ী গিয়াই মাকে সে এসব কথা এক্ষুণি বলিবে।'

পটুর কথা বিভূতিভূষণকে কেউ জিজ্ঞাসা করেননি। করলে হয়তো বলতেন, দুর্গার মত ঐরকম বাইরে থেকে জুড়ে দেওয়া। হয়ত বা অন্যরকমও হতে পারে। বিভূতিভূষণের এক খেলার সাথী ছিল। নাম ভরত। বন্ধু হলেও বিভূতিভূষণকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখত। যেমন পটু দেখত অপুকে।

পথের পাঁচালীতে দুর্গা ছাড়া আমরা যেমন অপুকে ভাবতে পারি না, অতখানি না হলেও অপুর বাল্যসঙ্গী বলতে আমরা একমাত্র পটুকেই বুঝি। ইন্দ্রনাথের যেমন শ্রীকান্ত, অপুর তেমনি পটু। কড়িখেলা, নদীতে নৌকো বাওয়া, মাছধরা—সব ব্যাপারেই সে অপুর সঙ্গী। দুর্গাকে যদি বলা যায় অপুর বহির্মুখ, তাহলে পটু সেই মুখের প্রত্যন্ত। অপুর ভাবনাকে বালিকার পক্ষে যতখানি সম্ভব ততখানি রূপ দিয়েছে দুর্গা,—পটু দিয়েছে তার পরিসীমা। অপুর দুরন্ত কল্পনার সাথী সে, শিষ্য সে। বাস্তব প্রয়োজন সে।

বিভূতিভূষণেরও তাকে দরকার ছিল। এবং তারও কারণ অপু। কড়িখেলার ব্যাপারে পটুকে বাঁচতে গিয়ে যে নির্যাতন তাতে অপুর কিন্তু লাভই হয়েছে। একা যখন সে ছেলেদের হাতে মার খেয়েছে তখন সে অসহায়। অসহায়ত্ব ফোটানই সেখানে বিভূতিভূষণের অভিপ্রেত। কিন্তু অপুদের যে করুণ অবস্থা তাতে সে অভিপ্রায় তো অনেক আগেই সিদ্ধ হয়েছে। এর পরেও আবার জেলে ছেলেদের হাতে মার খাওয়া? খুব কি দরকারি? নয় বলেই বিভূতিভূষণ বদলে দিয়েছেন। পটুর জন্যে লাঞ্ছিত হওয়ায় সহানুভূতি-মমতায় অপুর চরিত্রগৌরব আরও বেড়ে গিয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা গেল প্রচলিত সংস্করণে হরিহরকে কোথাও খোঁড়া বলে দেখান হয়নি। কিন্তু প্রথম পাণ্ডুলিপিতে তাই ছিল। জেলে ছেলেরাও হরিহরের দৈহিক বিকৃতির এবং দারিদ্র্যের জন্যে অপুকে বিদ্রূপ করেছে। এখানেও সেই একই কারণ। অতিরিক্ত সহানুভূতি আকর্ষণ। বিভূতিভূষণ বুঝতে পেরেছিলেন এর আর কোন দরকার নেই।

পাণ্ডুলিপির সঙ্গে প্রচলিত সংস্করণের আর সামান্য পার্থক্য, পাণ্ডুলিপিতে ডেপুটী সেটলমেণ্ট অফিসার হয়ে আসে নীরদচন্দ্র চৌধুরী, সঙ্গে তার বন্ধু যতীশচন্দ্র গাঙ্গুলী। এরা আবার হরিহরের লাহোর-প্রত্যাগত আত্মীয়ের পরিচিত। এই যতীশচন্দ্রই অপুকে জেলে ছেলেদের হাত থেকে বাঁচায়। প্রচলিত সংস্করণে শুধু জরীপদলের আসার কথাই আছে, আর কোন কাহিনী নেই। সেখানে অন্নদা রায়ের

জ্ঞাতিভাইয়ের ছেলে নীরেন, যার সঙ্গে দুর্গার বিয়ের কথাবার্তা হয়, সেই অপুকে বাঁচায়।

বিভূতিভূষণ নামধামসহ জরীপদলের বিস্তৃত কাহিনী বাদ দিয়ে ভালই করেছেন। পথের পাঁচালীতে তার কী দরকার? অন্ততঃ ডেপুটী সেটলমেণ্ট অফিসার হিসেবে একেবারে খোদ সহপাঠী বন্ধু, নীরদচন্দ্র চৌধুরীর নামটুকু বাদ দিয়ে পথের পাঁচালীকে তো বটেই বন্ধুকেও বোধ হয় বাঁচিয়েছেন।

•

খণ্ডিত আদি পাণ্ডুলিপিতে আর একটি পাতা, যা প্রচলিতে সম্পূর্ণই পরিত্যক্ত, তা এই—

'কাপড় কঞ্চিতে আটকাইয়া গিয়াছিল—ছাড়াইয়া দিয়া সে রায়পাড়ার ছেলেদের দিকে ফিরিয়া বলিল—খুব তো সব? এক্ষুনি ছেলেমানুষ যে গিয়েছিল। নিজেকে যদি এরকম কেউ কর্ত্ত, তাহলে কিরকম হয়?'

পচা-সুনীলের অপেক্ষা বড়—সে আগাইয়া আসিয়া বলিল—ওঃ ভারি যে চোখ রাঙ্গানি। পশ্চিমে খোট্টা কোথাকার, তোমায় আমরা ভয় করি নাকি। মেলা চালাকি করো না বলে দিচ্চি—

সুনীল বলিল—আচ্ছা ভয় না কর, কি করবে আমায় করো। এই দাঁড়ালুম—এসো দিকি।

সুনীল চিৎকারও করিল না—মারিতেও গেল না—বা পিছাইয়া আসিল না, পরে অপুকে বলিল—অপু তুই আমার পেছনে এসে দাঁড়া। যুদ্ধটা ভালরকম করিয়াই বাঁধিত, এমন সময় সে পথে? নেড়ার পিসি নেত্য ঠাকরুণকে আসিতে দেখিয়া দলের ছেলেপিলেরা অন্ততঃ নেড়া—একটুখানি তটস্থ হইল। নেত্য ঠাকরুণ নিকট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি রে সব কিসের চেঁচামেচি কিসের শুনি? নেড়া বলিল—পিসিমা, অই রায়বাড়ীর ছোঁড়া দুটো আমাদের মারতে এসেচে। নেত্য ঠাকরুণ চোখে ভাল দেখিতেন না। আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, রায় বাড়ীর? কাদের ছোঁড়ারে? ফণি বলিল—ঐ হরি খোঁড়ার ছেলে অপু। তাদের বাড়ী এই পশ্চিম থেকে—ফণির কথার শেষ দিকটায় সকলে মিলিয়া একসঙ্গে নামতা পড়ার সুরে বলিল—একটা খোট্টা এসেচে। নেত্য ঠাকরুণ মুখ বিকৃত করিয়া? তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—'এঃ বলে চালে নেই খড়, চুলোয় নেই ছাই ধনি এসেচেন আবার কাপড় কসাই [?] করে ঝগড়া কর্ত্তে, বাপের তো মুরোদ কত তার ছেলে আবার আত্মারাম সদ্দার…ফের যদি এ পাড়া মাড়াবি, ঠ্যাং একেবারে খোঁড়া করে ছাড়বো—আরে রে—চল্, এই আয় নেড়া,

ফণি, এস আর ঝগড়া কর্ত্তে হবে না, এস বাড়ী এস।

ঠিক তাহার দিদিমার মত দেখিতে এমন কেহ যে এরূপ ধরনে কথা কহিতে পারে সুনীলের সে অভিজ্ঞতা না থাকায় সে নেত্য ঠাকরুণের কথা কহিবার সময় অবাক হইয়াই রহিল—পরে নেত্য ঠাকরুণ সদলবলে পিছন ফিরিলে সে অপূর দিকে ফিরিল—পিতার অপমানসূচক উল্লেখে অপূর চোখে জল আসিয়াছিল—সুনীল তাহার কাঁধে হাত দিয়া নেত্য ঠাকরুণের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল, 'নেড়ার দিদিমা'। সুনীল বলিল—আয় অপূ চল বাড়ী যাই, কাঁদিস নে, আয় তোকে সেই বাড়ীর ? দিয়ে দোব।

অপূ চলিতে চলিতে ভাবিয়া ঠাহর করিতে পারিতেছিল না—নেড়ার পিসিমা কেন তাহাকে এমন করিয়া বকিল। সে কি করিয়াছে ? সে তো ? বাঁশ ডিঙ্গাইতে যাইতেছিল। আর ওরাই বা বাবাকে কেন ওরকম করে বল্লে ? বাবাকে বলে খোঁড়া, খোঁড়া বল্লেই হোল—কোথায় তার বাবা খোঁড়া ?—নেড়াটা কি মিথ্যুক ?'

প্রচলিত সংস্করণে এই অংশটি পরিত্যক্ত তো বটেই, খানিকটা আলাদাও। সুনীলের ব্যাপারে। সুনীল সম্পর্কে অপুর ভাই ; ধনী নীলমণি রায়ের ছেলে। এখানে সে অপুর বন্ধু, সহায়। কিন্তু প্রচলিত সংস্করণে বন্ধুত্বের ব্যাপারে বিভূতিভূষণ তাকে নীরব রেখেছেন। সুনীলের মা দরিদ্র আত্মীয়দের তেমন আমল দিতে চাইতেন না, গরিব দেওরপুত্রের সঙ্গে নিজের ছেলের মেলামেশা তিনি পছন্দ করতেন না। প্রচলিত সংস্করণে ভূমিকার এই সামান্য পরিবর্তনটুকু উপযোগীই হয়েছে। অপুদের প্রতি অবহেলার ছবিটি এতে আরও নিখুঁতভাবেই ফুটেছে।

পাণ্ডুলিপির পথের পাঁচালীর শেষ।

সেই মাঝেরপাড়া স্টেশন, বেত্রবতী, আষাঢ়ুর হাট। দূরে সোনাডাঙার ঠাঙাড়ে বটগাছটা দেখা যায়। অপুর বুকের মধ্যে থেকে একটা ডেলা গলার ওপর পর্যন্ত যেন উঠে আসে। হরিহরের মৃত্যুর পর সে মাকে নিয়ে নিশ্চিন্দিপুরে ফিরছে।

প্রথম পথের পাঁচালীর শেষ এইরকমই ছিল।

'ভাদ্রমাসের শেষ। এতদিন তাহাদের ইছামতীতে ঢল নামিয়াছে, হয়তো তাহাদের ঘাটের পথে শিমুলতলাটায় [?] জল উঠিয়াছে। ঝোপে ঝাড়ে বড়-কলমীর ফুল ফুটিয়াছে, শ্যামল বনান্তস্থলী মাটাফুলের, নীল বনকলমী ফুলের সম্মিলিত সুবাসে ভরিয়া গিয়াছে, সেই লেজঝোলা হলদে পাখিটা হয়তো ডালে দুলিতেছে।

সে জানে নিশ্চিন্দিপুর দিনে রাতে, সন্ধ্যা সকালে সব সময় তাহাকে ডাক দেয়, সোনাডাঙার মাঠটা ডাক দেয়, কদমতলার পারের পথটা ডাক দেয়। সে যতক্ষণ না ফিরিয়া যাইবে, ততক্ষণ ডাক তাহাদের একটানা চলিবে।

অধিক [?] পরে ঘুম পাওয়ায় জানলা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

অনেক বলাবলির পর সে তাহার মাকে রাজী করাইল। নিশ্চিন্দিপুরেই ফেরা ঠিক। গিন্নিমা টাকা দিলেন, মেজ বৌরাণীও টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

অনেক বেলায় মাঝের পাড়া ষ্টেশনে তাহারা নামিল। সে একখানা গোরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া মাকে জিনিসপত্র সমেত গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া—নিজে গাড়ীর পাশে পাশে হাঁটিতে লাগিল। বেত্রবতী নদীর ছোট খেয়া পার হইয়া তাহারা আষাঢ়ুর বাজারে পৌঁছিল। সেক্‌রা দোকানে সেইরকম ঠুক্‌ঠাক্ শব্দ হইতেছে, 'আজও হাটবার, অনেক গোরুর গাড়ী ওপারে জড় হইয়াছে। নতিডাঙার বাঁওড়ের উপর সেই কাঠের পুলটা, নীচে সেইরকম কচুরীপানার বেগুনী রং-এর ফুলে শীষ্ মন্দ মন্দ স্রোতে দুলিতেছে।

মাঝের হাটে গ্রামের বাজারের বারোয়ারীতলায় বড় শামিয়ানা টাঙাইয়াছে, অনেক দোকান পসার বসিতেছে, বারোয়ারী বসিবে। সে মাকে বলিল, সে এখানে যাত্রা শুনিতে আসিবে।

দূর [?] সোনামাঠের সেই ঠ্যাঙাড়ে বটগাছটা চোখে পড়িতেই তাহার বুকের [?] হইতে কি একটা ডেলা উঠিয়া গলায় আটকাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি'—

পাণ্ডুলিপির পথের পাঁচালীর এইখানেই শেষ।

অপুর নিশ্চিন্দিপুর ফেরা। অর্থাৎ কিনা গোটা অপরাজিতটাই বাদ? ভাবতে পারা যায়? না তা হওয়া সম্ভব? বিভূতিভূষণ নিজেই বলেছিলেন, 'পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া করে এনেছি···চল এগিয়ে যাই।'

যেতে যেতেই চব্বিশ বছর বাদে আর এক চড়কপুজোর দিন কাজলকে নিয়ে অপুর নিশ্চিন্দিপুরে ফেরা। পথের পাঁচালীতে যখন তারা নিশ্চিন্দিপুর ছেড়েছিল সেও ছিল এক চড়কপুজোর পরদিন। চব্বিশ বছর আগের এক চড়কপুজো থেকে চব্বিশ বছর পরের আর এক চড়কপুজো। এ কি শুধুই চব্বিশ বছর না অনন্তেরই একটি ছোট্ট বৃত্ত, মহাকালের সম, সত্তার শান্তি? বীরু রায় থেকে হরিহর, হরিহর থেকে অপু, অপু থেকে কাজল, কাজলের মধ্যে দিয়ে আবার অপু; নিশ্চিন্দিপুর থেকে কাশী, কাশী থেকে মনসাপোতা, সেখান থেকে আড়বোয়াল, দেওয়ানপুর, কলকাতা, অমরকণ্টক হয়ে আবার সেই

নিশ্চিন্দিপুর—এক অন্তহীন আগে থেকে আর এক অন্তহীন পর পর্যন্ত জীবনের কী নিরন্তর অভিযান, অপরাজিত প্রাণের কী অশেষ আবর্তন !

'কতবার যেন সে আসিয়াছে…জন্ম হইতে জন্মান্তরে মৃত্যু হইতে মৃত্যুর মধ্য দিয়া বহু বহু দূর অতীতে ও ভবিষ্যতে বিস্তৃত সে পথটা যেন বেশ দেখিতে পাইল… কত নিশ্চিন্দিপুর কত অপর্ণা, কত দুর্গা দিদি—জীবনের ও জন্মমৃত্যুর বীথিপথ বাহিয়া ক্লান্ত ও আনন্দিত আত্মার সে কি অপরূপ অভিযান…শুধু আনন্দে, যৌবনে, জীবনে, পুণ্যে ও দুঃখে, শোকে ও শান্তিতে।

এসব বাদ দিয়ে কি শুধুই নিশ্চিন্দিপুরে ফেরা যায় ? না ফিরলেই অপু শান্তি পেত, সার্থক হত ?

বিভূতিভূষণ তা মনে করেননি।

আরও একটি ব্যাপারে এক বছরে তিনি যথেষ্ট বদলেছেন। তা পথের পাঁচালীর ভাষা।

বিভূতিভূষণের আর এক অতুলনীয় সম্পদ। পথের পাঁচালীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেই পাঠকের অবস্থা কি সেই শ্রুতিলিখন-মুগ্ধ অপুর মত হয় না ? অমনই মোহাবিষ্ট, স্বপ্নাচ্ছন্ন, দূরাভিসারী। পথের পাঁচালীর শুধু স্বভাবে নয়, এর ভাষাতেও এমন এক স্বপ্নময়তা জড়িয়ে আছে যা পাঠককে অভিভূত না করে পারে না। অথচ এত অকৃত্রিম, অঙ্গাঙ্গী, অকল্পিত। সত্যিই ভাবা যায় না। পথের পাঁচালীর ভাবনারই মত তার ভাষা স্বপ্নেরই বনে আমাদের পথ হারায়।

পাণ্ডুলিপির পথের পাঁচালীতেও অনেকটা তাই ছিল। নানান ধরনের বৈয়াকরণিক ত্রুটি, অন্যমনস্কতা এতে আছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে স্বপ্নও আছে। কিন্তু এক বছরে সেই ভাষার আরও বিস্ময়কর রকমের পরিবর্তন হয়েছে। তার স্বপ্নের মধ্যে যেটুকু এলানো ভাব, বিবরণধর্মিতা ছিল, তা গিয়ে প্রচলিত পথের পাঁচালীর ভাষা আরও জমাট, মায়াময় হয়ে উঠেছে।

বিভূতিভূষণের কবিতা

ভাবতে খুব আশ্চর্য লাগে, বিভূতিভূষণের মত মানুষ কবিতা লেখেননি! অথচ তাঁর সমসাময়িক প্রায় সব উপন্যাসিক বন্ধুরাই তো কবি।

তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবন শুরুই তো কবিতা দিয়ে। ত্রিপত্র; তাঁর কাব্য-গ্রন্থের নাম। তারপর আর অবশ্য তিনি কবিতা লেখেননি। সবই গল্প-উপন্যাস। তবু তারই ফাঁকে ফাঁকে এমন সব গান লিখেছেন যা পাঠককে মুহূর্তের মধ্যে অভিভূত, আবিষ্ট করে ফেলে। কী গভীর আর নিরাভরণ সে সবের অন্তর-বাহির! কবি-র গানের কথা কার না মনে আছে? সেই 'ভালবেসে মিটল না সাধ/জীবন এত ছোট কেনে', নয়তো 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে' কিংবা 'চাঁদ তুমি আকাশে থাক—আমি তোমায় দেখব খালি'?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—এমন নিরাবেগ ঔপন্যাসিক, কিন্তু তাঁরও কবিতা আছে। কল্লোলের তিনজনের কথা তো সবারই জানা। ঔপন্যাসিকের মত কবি-পরিচয়ও প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, বুদ্ধদেবের বড় পরিচয়। এঁরা বাদে শরদিন্দু, বনফুল, সজনীকান্ত এমন অনেক নামই একটু ভাবলে মনে পড়বে। অথচ বিভূতিভূষণ, যিনি সেই সময়কার অগ্রণী সাহিত্যিক, তিনি সেই যে রিপন কলেজে পড়ার সময়ে একবার কবিতা লিখেছিলেন জীবনে তিনি আর কবিতার ধার-কাছ দিয়ে গেলেন না, এ কীরকম? পরশুরাম বলেছিলেন, সব বাঙালি ছেলেমেয়েরই হামবসন্তের মত একবার কবিতার বাতিক হয়। তারপর বয়সকালে সেরে যায়। কিন্তু বিভূতি-ভূষণের ক্ষেত্রে তো তা বলা যাবে না। কারণ তা বাতিক হলে শুধু কবিতা নয়, তাঁর পুরো সাহিত্য বাতিকটাই সেরে যেত।

অবশ্য বিভূতিভূষণ যে কলেজ ছাড়ার পর এক আধটা কবিতা লেখেননি তা নয়। কিন্তু সংখ্যায় তারা এত কম! সর্বসাকুল্যে কত আর হবে? গোটা চারেক। এবং কবিতা আকারে দু চার লাইন যা লিখেছেন তাও প্রায় ঐরকম—গোটা চারেক। কিন্তু এগুলোর কোনটিই উল্লেখযোগ্য নয়।

বিভূতিভূষণের কবিতা বা কবিতাকৃতি লেখা তাঁর গল্পে-উপন্যাসে, কখনও তাঁর দু একটি দিনলিপিতে ছড়িয়ে আছে।

এগুলোর প্রকাশের সময় ধরলে অপরাজিততেই তাঁর প্রথম কবিতা চোখে পড়ে। অপু তখন রিপন কলেজের ছাত্র। কলেজ ইউনিয়নের সভায় সে একটি

প্রবন্ধ পড়েছিল, 'নূতনের আহ্বান'। তার এই প্রবন্ধের বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এক গুণমুগ্ধ সতীর্থ অপুকে একটি কবিতা উৎসর্গ করে।

শ্রীযুক্ত অপূর্বকুমার রায় করকমলেষু—

বাঙ্গালী সমাজ যেন পঙ্কময় বদ্ধ জলাশয়
নাহি আলো স্বাস্থ্যভরা, বহে হেথা বায়ু বিষময়।
জীবন-কোরকগুলি, অকালে শুকায়ে পড়ে ঝরি,
বাঁচিবার নাহি কেহ, সকলেই আছে যেন মরি।
নাহি চিন্তা, নাহি বুদ্ধি, নাহি ইচ্ছা, নাহি উচ্চ আশা,
সুখদুঃখ এক জড়পিণ্ড, নাহি মুখে ভাষা।
এরি মাঝে দেখি যবে কোনো মুখ উজ্জ্বল সরস,
নয়নে আশার দৃষ্টি, ওষ্ঠপ্রান্তে জীবন হরষ—
অধরে ললাটে ভ্রূতে প্রতিভার সুন্দর বিকাশ,
স্থির দৃঢ় কণ্ঠস্বরে ইচ্ছাশক্তি প্রত্যক্ষ প্রকাশ
সম্ভ্রমে হৃদয় পুরে, আনন্দ ও আশা জাগে প্রাণে,
সম্ভাষিতে চাহে হিয়া বিমল প্রীতির অর্ঘ্যদানে।
তাই এই ক্ষীণ-ভাষা ছন্দে গাঁথি দীন উপহার
লজ্জাহীন অসঙ্কোচে আসিয়াছি সম্মুখে তোমার,
উচ্চ লক্ষ্য, উচ্চ আশা বাংলায় এনে দাও বীর
সুযোগ্য সন্তান যে রে তোরা সবে বঙ্গ জননীর।

গুণমুগ্ধ শ্রী—

ফার্স্ট ইয়ার সায়েন্স, সেকসন বি।

এরপর দৃষ্টিপ্রদীপ এবং তৃণাঙ্কুর-এ কবিতার আকারে দু চার লাইন চোখে পড়ে। দৃষ্টিপ্রদীপ-এর একেবারে শেষে যেখানে জিতুর ভবঘুরে জীবনের পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে, তারই একদা প্রিয় মালতী কতদিন হল চলে গিয়েছে। গভীর ঘুমের মাঝখানে জিতু সেই মালতীর গান শোনে।

মুক্ত আমার প্রাণের মাঠে
ধেনু চরায় রাখাল কিশোর
প্রিয়জনে লয় সে হরি
ননী খায় সে ননীচোর।

তৃণাঙ্কুর বিভূতিভূষণের অন্যতম দিনলিপি। জন্মমৃত্যুচক্র বিশাল দেবশিল্পীর হাতে আবর্তিত হচ্ছে—একথা ভাবতে ভাবতে বিভূতিভূষণ নিজেই গান রচনা,

করে গাইতে লাগলেন।

গভীর আনন্দরূপে দিলে দেখা এ জীবনে
হে অজানা অনন্ত—

উৎকর্ণও তাঁর আর একটি দিনলিপি। সেখানেও একটি বড় কবিতা আছে ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে লেখা। স্বগ্রামের একটি মেয়েকে নিয়ে।

ওগো সখি, ওগো মোর প্রিয়া, তব স্মৃতিখানি
মধুমাখা আঁকা রবে মম হৃদিতলে
চিরদিন। বহু প্রীতি ভালবাসা দিয়ে
এ জীবনে রাঙাইলে স্বপ্ন মাধুরিমা,
ভুলিবার নহে যাহা কভু। নিশীথের মর্মর
বাতাসে, অবিশ্রান্ত বিহগ-কূজনসনে—
কত নিশা, কত জ্যোছনা-যামিনী,
শরতের শান্ত সন্ধ্যা—পউষের স্বর্ণরাঙা মধুর বৈকাল
আমারে হেরিয়া প্রীতিপূর্ণ হাসিমাখা ডাগর নয়নে
সিঞ্চিয়াছে স্বর্গের অমৃত। কত ঢিল
ফেলা অতর্কিতে মোর ঘরে, কিশোরীর
কত চঞ্চলতা মাঝে মন মম
ঘুরিয়া ফিরিবে। বকুলের তলে কত গল্প
নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে। যবে ঘাট
থেকে সিক্তদেহ, আসিতে উঠিয়া—
আমি কত ছল করি লোভাতুর
দৃষ্টি মেলে রহিতাম চাহি—
বলিতাম—বড় ভাল-দেখি তোরে স্নানার্দ্র বসনে।
তুমি হেসে শাসনের ছলে তর্জনী
তুলিয়া চলে যেতে দ্রুতপদে। সিক্ত
চরণের দুটি চিহ্ন বহু যুগ ধরি
আঁকা রবে সে ঘাটের মৃত্তিকার পথে।

এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু উপলক্ষে এ বইয়ে দুটি লাইন আছে।

গগনে গগনে নব নব দেশে রবি
নব প্রাতে জাগে নবীন জীবন লভি।

বিভূতিভূষণ তাঁর অন্যতম গল্পগ্রন্থ অসাধারণ-এ 'মাকাল লতার কাহিনী' গল্পে

কবিতাকৃতি দু-চারটে লাইন লিখেছেন। প্রকৃতির পাতায় মাকাল লতার কাহিনী পড়তে পড়তে বিভূতিভূষণ সৃষ্টির সেই আদি কাহিনীকারের উদ্দেশে লিখেছেন,—

হেথা নীল আকাশের তলে
প্রজাপতি ওড়ে ফুলে ফুলে
হোথা কোথা কত দূরে
'ওমিক্রম সেটি' ঘোরে
সঙ্গে তার সুশুভ্র বামন।

রচনা করে নিজেই লিখেছেন, কবিতা হিশেবে লোকে হয়ত হাসবে।

হে অরণ্য কথা কও বিভূতিভূষণের আর একটি দিনলিপি। বিশ্বের সৃজন-কর্তাকে নিয়ে এখানে তাঁর লাইন দুয়েকের একটি কবিতা আছে।

সৃজিয়া বিশ্ব করিয়া পালন প্রলয়ে নাশেন যিনি
শোভনা বুদ্ধি আমা সবাকার প্রদান করুন তিনি।

বিভূতিভূষণের ইচ্ছে ছিল, অপরাজিত-এর শেষ পর্ব নিয়ে একটি উপন্যাস লিখবেন। তার নামও তিনি দিয়েছিলেন। কাজল। কিন্তু সে ইচ্ছে শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। কারণ তার আগেই তিনি মারা যান। ১৩৫৭ সালের আশ্বিন মাসে 'কাজল কেন লিখব ?' এই নামে কথাসাহিত্যে তিনি একটি কবিতা লেখেন।

বিজন পথে চলি, একাকী আমি কি ?
সাথী কি কেহ মোর নাহি গো ?
অসীম নদী-স্রোতে অজানা দূরে কোন্
একা কি ভেলা মোর বাহি গো।
একাকী বলি মুখে, 'না-না-না' বলে মন
ঘেরিয়া লয়ে চলে আমারি নিজ জন
বিটপী-মর্মর, পাখীর কল গান
আমারে বলে, 'আছি' গাহি গো।
যত না নিরজনে রহি গো একাকী
হাজারো সাথী পাই আমি যে।
আ-ভানু ধূলিকণা, সবে যে আত্মীয়
গোপনে আসে বুকে নামি যে!

বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পর তাঁর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র, প্রবন্ধ এবং অন্যান্য লেখা নিয়ে আমার লেখা নামে একটি বই বেরয়। তাতেও দুটি কবিতা আছে।

১৯৪০ সন পুজোর সময় তাঁর গোয়ালিয়ার যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ

পর্যন্ত যাওয়া হয়নি। বাঙলা দেশের এই শারদ রোদে-জ্যোৎস্নায়, ঘুঘুর ডাক শুনে দিন কাটাতে কী যে ভাল লাগে। বিভূতিভূষণ স্ত্রীকে লিখছেন। সঙ্গে কয়েক ছত্রের একটি কবিতা।

প্রকৃতির কোলে শুয়ে সৌন্দর্যে ভাসায়ে আঁখি
সাধ যায় দিবা নিশি অনিমেষ চেয়ে থাকি।
নিঝুম নীরবে সেথা কি যেন চোখের পরে
উজল জোছনা সম নিয়ত ঝরিয়া পড়ে।
পরমাণু নিভে যায় ভাঙিয়া জড়ের কারা,
কে তুমি ডাকিছ মোরে করিয়া পাগল-পারা?

এই বইয়ে স্ত্রীকে লেখা আর একটি চিঠির সঙ্গে আর একটি কবিতা আছে। লিখেছেন, কবিতা আমি লিখি না, কেমন লাগে জানিও। কবিতাটির নাম. 'নবযুগের কবি'।

দুঃখ হতে ক্ষতি হতে যে অমৃত করেছি সঞ্চয়
নিত্য পলে পলে
মৃত্তিকার ধরণীতে কণ্ঠ ভরি গাহি তার জয়
নানা কুতুহলে
রজনীর অন্ধকারে অগণিত তারকার দ্যুতি
গগনে অঙ্গনে
কি বিস্ময়ে হেরিয়াছি পুলকিত একা সারারাতি
মুগ্ধ শিহরণে
মনে হবে জন্মে জন্মে জন্ম হতে নব জন্মান্তরে
মৃত্যুলোক পারে
সেই কথা রেখে যাব অরণ্যের পল্লব মর্মরে
ধরার দুয়ারে
দুঃখভরা পৃথিবীর কবি আমি নামগোত্রহীন
অখ্যাত অনামী
মানুষের চিত্ত মাঝে তবু কবে মোর মর্মবীণ
শাশ্বত সে বাণী
অনন্ত বেদনা মাঝে চিরন্তন সৃষ্টির সম্ভার
আনন্দ স্বরূপে
আমি যে দেখেছি তার প্রশান্ত স্বভাব

অপরূপ রূপে
তাই মোর কাব্যকথা নবছন্দে হয়েছে মুখর
অশ্রুজল মাঝে
কুসুম সঙ্গীতে তাই ধরিত্রীর ব্যাকুল অন্তর
ক্ষণে ক্ষণে বাজে।

—এই হচ্ছে সর্বসাকুল্যে বিভূতিভূষণের গোটা এবং টুকরো কবিতা। হয়ত বা আরও দু একটা থাকতে পারে। তাঁর সব লেখা তন্ন তন্ন করে খুঁজলে তবেই এইসব কবিতা চোখে পড়ে। এমনিতে তারা উঠে আসে না, পাঠকের কাজে উপদ্রব করে না।

কিন্তু তবু বিভূতিভূষণের কবিতার জন্য বিভূতিভূষণ দায়ী নন। কারণ তাঁর এসব কবিতা কবিতার আকারে লেখা হলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, কবিতার জন্য লেখা নয়। বরং তার উল্টোটাই। গল্প-উপন্যাসের দরকারেই এরা এসেছে। এবং দুর্ভাগ্যক্রমে সে জায়গাগুলোও কবিতার কিনারায় নয়। অপরাজিত-এর বা দিন-লিপির কবিতা, কী দৃষ্টিপ্রদীপ-এর কবিতার টুকরো—অনিবার্য কোন অনুভবের জন্য রচিত হয়নি। নেহাৎই রচনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি অন্যমনস্কভাবে এগুলোকে এনেছেন। যেমনই ইতস্ততঃ, তেমনি যদৃচ্ছ। তুলে নিলেও কিছু এসে যায় না। হয়ত বা ভালই হয়। যেমন দুর্বল, অসুখী তাদের মিল—'তলে'-র সঙ্গে 'ফুলে', 'দূবে'-র সঙ্গে 'ঘোবে' , তেমনি মামুলি পদ্যগন্ধী তাদের প্রকাশ। একান্ত ব্যক্তিগত হওযার ফলে কোথাও বা কৌতুককর সব শব্দ নির্বাচন। 'কত ঢিল ফেলা অতর্কিতে মোর ঘরে'। অথচ গ্রাম সম্পর্কিত একটি মেয়ের সঙ্গে ভালবাসার এই কবিতাটি এত সম্ভাব্য কবিতা। কিন্তু বিভূতিভূষণ তাকে কবিতার পরিণতিতে পৌছনর আগেই অত্যন্ত কাঁচা অবস্থায় পাঠকের কাছে তুলে নিয়ে এসেছেন।

তবু এর মধ্যে 'নবযুগের কবি' এবং 'কাজল' এ দুটিই অপেক্ষাকৃত ভাল কবিতা। দুটি কবিতাই কোন গল্প-উপন্যাসের কাহিনীর প্রয়োজনে (যেমন অপরাজিততে) বা অন্যমনস্কভাবে লেখা নয়। দুটিই কিছুটা কবিতার জন্য লেখা। অপেক্ষাকৃত কবিতাধর্মীও। যদিও প্রথমটিতে রবীন্দ্রনাথের ছাপ খুব বেশি। 'কাজল' অবশ্য অনেক বেশি নিজস্ব। এর জগৎও যেমন 'বিটপী-মর্মর'-এ, 'পাখির কলগান'-এ বিভূতিভূষণের, তেমনি তার ছন্দের ভেতরেও এমন একটি গান, একটি গুঞ্জরিত দোলা আছে যা বিষয়োপযোগী সহজেরই দোলা। বোঝা যায় তা বিভূতিভূষণের অন্তর থেকেই এসেছে।

যদিও বিভূতিভূষণের কবিতা নেহাৎই নগণ্য।

তবুও বিভূতিভূষণের কবিতা কী বিপুল এবং অনবদ্য! কী প্রচুর এবং পরাক্রান্ত! হলই বা তারা কবিতার আকারে না হয়ে গদ্যে। পথের পাঁচালী থেকে শুরু করে ইছামতী পর্যন্ত। 'উপেক্ষিতা' থেকে শুরু করে 'কুশল পাহাড়ী'। তাঁর সাহিত্যে কী অবিশ্রান্ত কবিতা, কবিতার কী অজস্র আয়োজন। বিভূতিভূষণের কবিতা যেমন কবিতার না হয়ে অনেক বেশি গল্প-উপন্যাসের, তাঁর গল্প-উপন্যাসও তেমনি অনেক বেশি গল্প-উপন্যাসের না হয়ে কবিতার। অপার্থিব, স্বপ্নচারী, বিহ্বল। পথের পাঁচালীর সেই অপরাহ্ণের প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালা, অপরাজিত-এর সেই অমরকণ্টকের পথ, আরণ্যক-এর সেই সুবিশাল প্রান্তর ফুলকিয়া বইহার, ইছামতীর সেই পাঁচপোতার বাঁওড়ের ধারের শান্ত বিকেল, স্মৃতির রেখার সেই উদাত্ত অনুভূতি, 'কুশল পাহাড়ী'র সেই দ্যুলোক-ভূলোক ছড়ান ছবি—বর্ণনায় গদ্যে লেখা হলেও তা কবিতাই। ভাষাতেও কবিতার কুহক। অর্থাতীত, মায়াবী।

: এক একদিন এই সময় অপুর ঘুম ভাঙিয়া যাইত।

সেই দেবী যেন আসিয়াছেন, সেই গ্রামের বিস্মৃতা অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষী।

পুলিনশালিনী ইছামতীর ডালিমের রোঁয়ার মত স্বচ্ছ জলের ধারে, কুচা শেওলা ভরা ঠাণ্ডা কাদায় কতদিন আগে যাহাদের চরণ-চিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তীরের প্রাচীন সপ্তপর্ণটাও হয়তো যাদের দেখে নাই, পুরনো কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরে তারাই এক সময়ে ফুল-ফল-নৈবেদ্যে পূজা দিত, আজকালকার লোকেরা কে তাঁহাকে জানে?

কিন্তু তিনি এ গ্রামকে এখনও ভোলেন নাই।

গ্রাম নিষুতি হইয়া গেলে অনেক রাত্রে, তিনি বনে বনে ফুল ফুটাইয়া বেড়ান, বিহঙ্গ শিশুদের দেখাশুনা করেন, জ্যোৎস্না-রাত্রের শেষ প্রহরে ছোট্ট, ছোট্ট মৌমাছিদের চাকগুলি বুনো-ভাঁওরা, নাটকান, পুঁয়ো ফুলের মিষ্ট মধুতে ভরাইয়া দেন।

তিনি জানেন কোন্ ঝোপের কোণে বাসক ফুলের মাথা লুকাইয়া আছে, গাছের নিভৃত বনের মধ্যে ছাতিম ফুলের দল কোথায় গাছের ছায়ায় শুইয়া, ইছামতীর কোন্ বাঁকে সবুজ শেওলার ফাঁকে ফাঁকে নীল-পাপ্‌ড়ি বনকলমীফুলের দল ভিড় পাকাইয়া তুলিতেছে, কাঁটা গাছের ডাল-পালার মধ্যে ছোট্ট খড়ের বাসায় টুনটুনি পাখীর ছেলেমেয়েরা কোথায় ঘুম ভাঙিয়া উঠিল।

তাঁর রূপের স্নিগ্ধ আলোয় বন যেন ভরিয়া গিয়াছে। নীরবতায়, জ্যোৎস্নায়, সুগন্ধে, অস্পষ্ট আলো-আঁধারের মায়ায় রাত্রির অপরূপ শ্রী।

দিনের আলো ফুটিবার আগেই কিন্তু বনলক্ষ্মী কোথায় মিলাইয়া যান, স্বরূপ

চক্রবর্তীর পর তাঁহাকে কেহ কোনদিন দেখে নাই।

অথবা অপরাজিত-তে অপুর সেই মহাজীবনের উপলব্ধি।

: তাহার মনে হইল সত্য, সত্য, সত্য—এই শান্ত নির্জন আরণ্যভূমিতে বনের ডালপালার আলোছায়ার মধ্যে পুষ্পিত কোবিদারের সুগন্ধে দিনের পর দিন ধরিয়া এক একটি নবজগতের জন্ম হয়—ঐ দূর ছায়াপথের মত দূরবিসর্পিত, এটুকু শেষ নয়, এখানে আরম্ভও নয়—তাহাকে ধরা যায় না অথচ এই সব নীরব জীবন মুহূর্তে অনন্ত দিগন্তের দিকে বিস্তৃত তাহার রহস্যময় প্রসার মনে মনে বেশ অনুভব করা যায়। এই এক বৎসরের মধ্যে মাঝে-মাঝে সে তাহা অনুভব করিয়াছেও—এই অদৃশ্য জগতের মোহস্পর্শ মাঝে-মাঝে বৈশাখী শালমঞ্জরীর উন্মাদ সুবাসে, সন্ধ্যা-ধূসর অনতিস্পষ্ট গিরিমালার সীমারেখায়, নেকড়ে বাঘের ডাক ভরা জ্যোৎস্নাস্নাত শুভ্র জনহীন আরণ্যভূমির গাম্ভীর্যে, অগণিত তারাখচিত নিঃসীম শূন্যের ছবিতে। বৈকালে ঘোড়াটি বাঁধিয়া যখনই বক্রতোয়ার ধারে বসিয়াছে, যখনই অপর্ণার মুখ মনে পড়িয়াছে, কতকাল ভুলিয়া যাওয়া দিদির মুখখানা মনে পড়িয়াছে, একদিন শৈশব-মধ্যাহ্নে মায়ের-মুখে-শোনা মহাভারতের দিনগুলির কথা মনে পড়িয়াছে—তখনই সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইহাও মনে হইয়াছে যে, যে জগৎকে আমরা প্রতিদিনের কাজকর্মে হাটে-ঘাটে হাতের কাছে পাইতেছি জীবন তাহা নয়, এই কর্মব্যস্ত অগভীর একঘেয়ে জীবনের পিছনে একটি সুন্দর পরিপূর্ণ, আনন্দ-ভরা সৌম্য জীবন লুকানো আছে—সে এক শাশ্বত রহস্যভরা গহন গভীর জীবন-মন্দাকিনী, যাহার গতি কল্প হইতে কল্পান্তরে, দুঃখকে তাহা করিয়াছে অমৃতত্বের পাথেয়, অশ্রুকে করিয়াছে অনন্ত জীবনের উৎসধারা...।

কিংবা আরণ্যক-এর অরণ্য-নাভিমূলে সেই সত্যচরণের যাত্রা।

: কতবার এই ক্ষান্তবর্ষণ মেঘ-থমকানো সন্ধ্যার এই মুক্ত প্রান্তরে সীমাহীনতার মধ্যে কোন্ দেবতার স্বপ্ন যেন দেখিয়াছি—এই মেঘ, এই সন্ধ্যা, এই বন, কোলাহলরত শিয়ালের দল, সরস্বতী হ্রদের জলজ পুষ্প, মঞ্চী, রাজু পাড়ে, ভানুমতী, মহালিখারূপের পাহাড়, সেই দরিদ্র গোঁড-পরিবার, আকাশ, ব্যোম সবই তাঁর সুমহতী কল্পনায় একদিন ছিল বীজরূপে নিহিত—তাঁরই আশীর্বাদ আজিকার এই নবনীলনীরদমালার মতই সমুদয় বিশ্বকে অস্তিত্বের অমৃতধারায় সিক্ত করিতেছে—এই বর্ষা-সন্ধ্যা তাঁরই প্রকাশ, এই মুক্ত জীবনানন্দ তাঁরই বাণী, অন্তরের অন্তরে যে বাণী মানুষকে সচেতন করিয়া তোলে। সে দেবতাকে ভয় করিবার কিছুই নাই—এই সুবিশাল ফুলকিয়া বইহারের চেয়েও, ঐ বিশাল মেঘভরা আকাশের চেয়েও সীমাহীন, অনন্ত তাঁর প্রেম ও আশীর্বাদ। যে যত হীন, যে যত ছোট, সেই

বিরাট দেবতার অদৃশ্য প্রসাদ ও অনুকম্পা তার উপর তত বেশী।

আমার মনে যে দেবতার স্বপ্ন জাগিত, তিনি যে শুধু প্রবীণ বিচারক, ন্যায় ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী কিংবা অব্যয় অক্ষয় প্রভৃতি দুরূহ দার্শনিকতার আবরণে আবৃত ব্যাপার তাহা নয়—নাঢ়া বইহারের কি আজমাবাদের মুক্তপ্রান্তরে কত গোধূলিবেলায় রক্তমেঘ স্তূপের কত দিগন্তহারা জনহীন জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া মনে হইত তিনিই প্রেম ও রোমান্স, কবিতা ও সৌন্দর্য, শিল্প ও ভাবুকতা—তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, সুকুমার কলাবৃত্তি দিয়া সৃষ্টি করেন, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়া থাকেন নিঃশেষে প্রিয়জনের প্রীতির জন্য—আবার বিরাট বৈজ্ঞানিকের শক্তি ও দৃষ্টি দিয়া গ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকার সৃষ্টি করেন।

অথবা হে অরণ্য কথা কও-এ বিভূতিভূষণের সেই রূপসী বাঙলার কমনীয় অনন্ত।

: অপরাহ্ণে গহন ছায়া নেমে আসে মাঠে খাটে পথে, বনযূঁইয়ের সুগন্ধে বাতাস হয় সুরভিত, বাঁশঝাড়ের মগডাল দুলিয়ে আমবন-শীর্ষ কাঁপিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ওঠে নদীর বাঁক থেকে, নদীর স্নিগ্ধ কালো জলে ঢেউ ওঠে পানকলস শেওলার কুচো সাদা ফুলের সারিকে নাড়িয়ে দেয় ডাঙার দিকে, পানকৌড়িকে উড়িয়ে দেয় সাঁইবাবলার ডাল থেকে, শেফালি ফুলের হলুদ পাপড়ি ঝরিয়ে দেয় নিবিড় বনের তলায়, বর্ষাপুষ্ট তৃণভূমির তলে কিংবা নবোদ্গত চারা গাছের মাথায়। গোধূলির রাঙা আলো বনে, মাঠে, চরে, জলে, নলখাগড়া আর কষাড় ঝোপে, উড়ন্ত বকের সারির পাখায়। এই নিস্তব্ধ অপরাহ্ণে ছায়াগহন প্রাচীন আমবাগানে ঢুকে দেখছি বনের কোন কোণে তিনি পত্রশয্যায় ঘুমিয়ে আছেন।

ছায়া-ঝোপের নিবিড় আশ্রয়ে তিনি ঘুমিয়ে আছেন। নারীর মত সুকুমার, কমনীয় মুখে এক অপার্থিব ভাব মাখা, দীর্ঘ দীর্ঘ চোখ দুটি নিমীলিত দীর্ঘ কালো জোড়া ভুরুর তলায়। সুন্দরী নারীর মত লাবণ্যভরা মুখ। মুখ ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না ওঁর। ঝুর ঝুর করে ঝরা পাপড়ি ঝরে পড়চে সোঁদালি ফুলের ওর শয্যার ওপর। ডালে ডালে বনের পাখি নেচে নেচে উড়ে বেড়াচ্চে, কত কি বন্যলতার গাছ ওপরের ডাল থেকে নেমে এসে দুলচে ওর বুকের কাছে, মুখের কাছে। তিৎপল্লী ফুল ফুটে আছে একটু দূরে একটা ঝোপে, রঙিন প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে সোঁদালি ফুলের ঝাড়ে ঝাড়ে, পিড়িং পিড়িং দুর্গা টুনটুনি ডাকচে, উঁচু গাছের মগডালে ডাকচে কুলো, কি সুন্দর গোধূলির রাঙা রোদ সাজানো বনকুঞ্জ, কি স্নিগ্ধ ছায়া নিবিড় বীথিতল!

কি সুন্দর অপরূপ স্নিগ্ধ ছবিখানা আমার সামনে।

বিপুল মহাসাগরের ইথারের মহাসমুদ্র, যেখানে কোটি তারা ডোবে জলে, তার মধ্যে ক্ষুদ্র একটি সবুজ খড়ের পৃথিবী।

বিশ্বের রাজাধিরাজ পরম সৌম্য, পরম প্রেমী অধিদেবতা, যাঁর তৈরী আব্রহ্মস্তম্ভ এই জগৎ, মহাজগৎ, সেই পরম রহস্যময় দেবতা আজ শায়িত এই আমবাগানে। সোঁদালি ফুল ঝরচে তাঁর সুকুমার লাবণ্য-মাখা মুখের ওপর, সে মুখ দেখে তখনি ভালবাসতে ইচ্ছা করে—বিশেষ করে যখন মনে হয় জগতে কজনই বা ওঁকে জানে বা ওঁকে ভালবাসে বা ওঁর কথা ভাবে। উনি সবচেয়ে বেশি অবহেলিত জগতের মধ্যে। কচি কচি লতা দুলচে, একটু দূরে রঙিন প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে, সোঁদালি ফুলের ঝাড়ে ঝাড়ে নীল বনকলমির ফুলে ভর্তি একটা লতা উঠেছে শাঁড়া গাছের মাথায়, অকালে একটা শিমুলের শাখায় রাঙা ফুল ফুটে আছে, টুকটুকে মাকাল ফল ঝুলচে, লেজ ঝোলা হলদে পাখী বসে আছে, যে ফুল কেউ দেখে না ও কেউ আদর করে না, তেমন ফুল ফুটে আছে ঐ বনতলে, তাই দিয়ে রচিত তাঁর পত্রশয্যা।

প্রণাম, হে খেয়ালী দেবতা, প্রণাম।

নয়তো 'কুশল পাহাড়ী'র সেই প্রাচীন সাধুর মুখে দ্যুলোক-ভূলোকের মহাশিল্পীর বন্দনা।

: শুক্লা নবমী তিথির জ্যোৎস্না ডালপালার ফাঁকে ওঁর আসনে এসে পড়েচে। কুশল পাহাড়ীর শৈলশ্রেণী ভৈরব থানকে চারিদিকে ঘিরেছে। বহু পুরাতন পাথরের চাঁই। সব যেন এখানে সুপ্রাচীন—প্রাচীন সাধু, প্রাচীন শালবৃক্ষ, প্রাচীন শিলাসন, প্রাচীন অরণ্যভূমি।

মুগ্ধ হোলাম। সাধুজী ঈশোপনিষদের একটা শ্লোক বার বার বলতে লাগলেন। 'কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ। শ্লোকটার মধ্যেকার 'কবি' কথাটার অর্থ—বৃক্ষ। সাধুর মুখের সেই মধুর গম্ভীর বাণী আজও কানে বাজচে :

'কবিই তিনি বটেন বাবা। এখানে বসে বসে দেখি। এই শালগাছটাতে ফুল ফোটে, বর্ষাকালে পাহাড়ে ময়ূর ডাকে, ঝর্ণা দিয়ে জল বয়ে যায়, তখন ভাবি, কবিই বটে তিনি।'

কবিতার কত যে উদাহরণ।

আসলে বিভূতিভূষণের সমগ্র সাহিত্য জুড়েই কবিতার একচ্ছত্র আধিপত্য। আলাদা নয়, ওতপ্রোত।

আর এই কারণেই বিভূতিভূষণ বোধ হয় আলাদা করে কবিতা লেখেননি। লেখার দরকার বোধ করেননি।

তবু সবাই জানেন, বিভূতিভূষণ কবিই।

রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণ

১৯০২ কি ১৯০৩ সাল। বিভূতিভূষণের তখন আট ন বছর বয়স। পড়েন আপার প্রাইমারি পাঠশালায়। এক দিন হেডমাস্টার গগনচন্দ্র পাল একখানি শিশুপাঠ্য বই থেকে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। কবিতাটির ধ্বনি ও ছন্দ বিভূতিভূষণের কানে এক অভূতপূর্ব গানের মত বাজল। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মত হেডমাস্টারমশায়ের মুখের দিকে চেয়ে কবিতাটি শেষ পর্যন্ত শুনলেন। আবৃত্তির শেষে হেডমাস্টারমশায় জানালেন কবিতাটির নাম 'শরৎ', কবির নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'রবীন্দ্রনাথের নাম সেই প্রথম শুনলাম জীবনে। দাশু রায়ের পাঁচালি শুনেছি, কবি-জারি-গান শুনেছি, কাশীরাম দাসের মহাভারত নিজেও পড়েছি, গুরুজনদের মুখেও শুনেছি, কিন্তু এমন সুললিত কবিতা কখনও শুনি নি। যেন একটি অপূর্ব সংগীত—অভূতপূর্ব বাণী। এই নামটির সঙ্গে বাল্যকালে শ্রুত সেই কবিতাটির অপরিচিত সৌন্দর্য মিশে গিয়ে ওই নামটির চারি পাশে একটি মায়ালোক গড়ে উঠল আমার মনে সেই দিন থেকেই।'[১]

বিভূতিভূষণ যখন বনগাঁ হাই স্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্র সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান। পাঠশালায় রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হলেও এবং বনগাঁ হাই স্কুলে পড়তে পড়তে তাঁর কবিখ্যাতির কথা যথেষ্ট শুনলেও তখনও রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে বিভূতিভূষণের তেমন পরিচয় হয়নি। তার কারণ সেই সময়ে বনগাঁর মতো একটি ক্ষুদ্র মফস্বল শহরে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের বিশেষ প্রচলন ছিল না। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ঘটনায় তাঁর মনে আছে, 'সে সময়ে গর্ব অনুভব করেছিলুম এই ভেবে যে, আমাদেরই এক জন আজ বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উচ্চ সম্মান লাভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সম্মান সারা বাংলা দেশের তথা সারা ভারতবর্ষের সম্মান—আমাদের সম্মান।—'

১৯১৪ সাল। বিভূতিভূষণ তখন কলেজে পড়ার জন্য সবে কলকাতায় এসেছেন। এখনকার সুরেন্দ্রনাথ (আগেকার রিপন) কলেজে তিনি আই. এ. পড়ছেন; কলকাতার পথ-ঘাট কিছুই ভালো করে চেনেন না। এক দিন দুপুর বেলায় কলেজে কে বললে—'আজ সেন্ট পলস্ কলেজ হস্টেলে রবিবাবু আসবেন, দেখতে যাবে?' রোদ্দুর ঝাঁ-ঝাঁ করছে, বেলা তখন তিনটে মতো হবে। কলেজ

১ আমার লেখা (১ম সংস্করণ), 'প্রথম দর্শন', পৃ. ৩২-৩৩।

হস্টেলের সামনের মাঠে রবীন্দ্রনাথ আসবেন। সেখানে তাঁর জন্য চেয়ার-টেবিল পড়েছে, টেবিলের পাশে দর্শনার্থীদের ভিড়ের মধ্যে বিভূতিভূষণ দাঁড়িয়ে আছেন। ছাত্রদের ভিড়ের মাঝখানে সরু পথ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঢুকলেন। বিভূতিভূষণ এর আগে ছবিতে তাঁর চেহারা অনেকবার দেখেছেন, কিন্তু এখন তাঁকে দেখে তাঁর মনে হল কোনো ছবিতেই রবীন্দ্রনাথের যথার্থ রূপ ফুটে ওঠেনি। 'কি একটি অনন্যসাধারণ দীপ্তদৃষ্টি চোখ, চিবুকের নীচে শ্মশ্রুরাজির বাঁকা ভাব। একেবারে তাঁর কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছি, তাঁর অতটা নিকট সান্নিধ্য লাভের আনন্দে তখন আমি আত্মহারা। সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছেলে বেলায় তাঁর কবিতা গগন পালের মুখে প্রথম শুনে মুগ্ধ হই।' হস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ বেনেডি রবীন্দ্রনাথের সামনের টেবিলে বড়ো একটা কাচের জগ ভর্তি করে জল ও গ্লাস রাখলেন। বিভূতিভূষণ সকৌতুকে ভাবছেন, অতটা জল কি ওঁর খাওয়ার দরকার হবে?

রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিতে উঠলেন। বিভূতিভূষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। এমন অসাধারণ কণ্ঠস্বর তিনি আর কখনও শোনেননি। মনে হল জীবনে এই প্রথম এমন কণ্ঠস্বর শুনলেন যা হাজার লোকের মাঝখানেও আলাদা করে চেনা যায়। তাঁর বক্তৃতার আর কোনো কথাই বিভূতিভূষণের মনে নেই। শুধু মনে আছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতার মধ্যে একটি কথা ডান হাতের চাঁপার কলির মতো আঙুলের সাহায্যে সুশ্রী মুদ্রা রচনা করে বলছিলেন, 'কল্পলোক …কল্পলোক।'

হস্টেলের মাঠে ক্রমে ছায়া পড়ে এল, বক্তৃতাও শেষ হল। অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথের পায়ের ধুলো নিলেন। তাঁর মনে আছে সেদিন রবীন্দ্রনাথের পায়ে ছিল চকচকে বাদামি চামড়ার জুতো।

১৯৩৩ সালের ৫ই এপ্রিল। বিভূতিভূষণ এখন শিক্ষকতা করেন ধর্মতলা স্ট্রীটে খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইন্সটিটিউশনে, থাকেন ৪১নং মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসে। স্কুল থেকে তিনি বাড়ি ফিরে এসেছেন। খবর পেলেন, আজ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বরানগরের বাড়িতে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে হবে। বিভূতিভূষণ উপস্থিত। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং কালিদাস নাগ এঁরা সব আগেই এসেছেন। প্রশান্তবাবুর স্ত্রী সবার জন্য খাবার আনলেন, তারপরে এল আইসক্রীম। রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, 'আরে, still they come!' এইবার পথের পাঁচালীর কথা উঠল; বললেন, এইবারের 'পরিচয়'-এ পথের পাঁচালী সম্পর্কে তিনি লিখেছেন।[১] ১৩৪০ সালে বৈশাখ মাসে পুস্তক-পরিচয় বিভাগে চারুচন্দ্র

১ অপ্রকাশিত দিনলিপি, ৫।৪।১৯৩৩।

দত্তের কৃষ্ণরাও-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি পথের পাঁচালী সম্পর্কে লেখেন।

'আধুনিক অনেক ভালো গল্প সম্বন্ধে আজও কোনো মত দিই নি—সেই অপরাধ হল নিবিড়—যথা বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'। 'পথের পাঁচালী'র আখ্যানটাও অত্যন্ত দেশী। কিন্তু কাছের জিনিসেরও অনেক পরিচয় বাকি থাকে। যেখানে আজন্মকাল আছি সেখানেও সব মানুষের সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে না। 'পথের পাঁচালী' যে বাংলা পাড়াগাঁয়ের কথা সেও অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়। লেখার গুণ এই যে, নতুন জিনিস ঝাপসা হয় নি, মনে হয় খুব খাঁটি, উঁচুদরের কথায় মন ভোলাবার জন্যে সস্তা দরের শাঙতার সাজ পরাবার চেষ্টা নেই। বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে। এই বইখানিতে পেয়েছি যথার্থ গল্পের স্বাদ। এর থেকে শিক্ষা হয় নি কিছুই, দেখা হয়েছে অনেক যা পূর্বে এমন করে দেখি নি। এই গল্পে গাছপালা পথঘাট মেয়ে-পুরুষ সুখদুঃখ সমস্তকে আমাদের আধুনিক অভিজ্ঞতায় প্রাত্যহিক পরিবেষ্টনের থেকে দূরে প্রক্ষিপ্ত করে দেখানো হয়েছে। সাহিত্যে একটা নতুন জিনিস পাওয়া গেল অথচ পুরাতন পরিচিত জিনিসের মতো সে সুস্পষ্ট।'

১৯৩৩ সালের ১লা মে রবীন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণকে তাঁর নাটক (সম্ভবতঃ বাঁশরি) শোনাবার জন্য ডেকে পাঠান। বিভূতিভূষণ তাঁর ঐ দিনের দিনলিপিতে লিখে গিয়েছেন—'স্কুল থেকে টাকা নিয়ে বঙ্গশ্রী। সেখানে গিয়ে শুনি রবীন্দ্রনাথ আমার সন্ধান করেচেন—রবীন্দ্রনাথ নতুন নাটক পড়বেন—বলেচেন বিভূতিকে আনা চাই।' যতদূর মনে হয় বিভূতিভূষণ ঐ দিন রবীন্দ্রনাথের নাটক শুনতে যেতে পারেননি।

বিভূতিভূষণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পূর্বোল্লিখিত লেখাটি ছাড়া আর একটি আশীর্বাণীর উল্লেখমাত্র পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে হাওড়া টাউন হলে বিভূতিভূষণের সম্বর্ধনা উপলক্ষে এক সভা হয়। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাণী পাঠান।[১] কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই আশীর্বাণীর কোনো সন্ধান আজও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ। বিভূতিভূষণ তখন মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসে রয়েছেন। এই দিন সকালে উঠে তিনি লেখাপড়া করছেন, এমন সময় এক জন এসে খবর দিলে—রবীন্দ্রনাথ আর নেই। শুনেই তিনি জোড়াসাঁকো চলে এলেন। সেখানে বেজায় ভিড়, ঢোকা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তখনও জীবিত, তবে তাঁর অবস্থা খুব খারাপ। বিভূতিভূষণ ওখান থেকে স্কুলে এলেন এবং স্কুলেই শুনলেন

১ উৎকর্ণ (২য় মুদ্রণ), পৃ. ১৬৩।

১২টা ১৩ মিনিটের সময় রবীন্দ্রনাথ গত হয়েছেন। শুনেই তিনি স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্গে কলেজ স্কোয়ার দিয়ে হেঁটে গিরিশ পার্কের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শবযাত্রীদের বিরাট জনতা তাঁকে ঠেলতে ঠেলতে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়ে নিয়ে চলল। সেনেটের সামনে বিভূতিভূষণ শেষবারের মতো রবীন্দ্রনাথকে দেখার সুযোগ পেলেন। 'তারপর ট্রেনে চলে এলুম বনগাঁ। শ্রাবণের মেঘনির্মুক্ত নীল আকাশ ও ঘন সবুজ দিগন্তবিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেতের শোভা দেখতে দেখতে কেবলই মনে হচ্ছিল

গগনে গগনে নব নব দেশে রবি
নব প্রাতে জাগে নূতন জনম লভি—

অনেক দিন আগে ঠিক এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' পড়তে পড়তে ব্যারাকপুর ফিরছিলুম—মায়ের হাতের তালের বড়া খেয়েছিলুম, সে কথা মনে পড়ল।'[১] বাড়ি ফিরে রবীন্দ্রনাথের শবাধারের একটি শ্বেতপদ্ম তিনি তাঁর স্ত্রীকে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবৎসরপূর্তি উপলক্ষে ১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাসের 'বিচিত্রা'য় (রবীন্দ্রজয়ন্তী সংখ্যা) বিভূতিভূষণ 'রবীন্দ্রনাথের দান' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এটি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পর্কে বিভূতিভূষণের প্রথম আলোচনা। তিনি এই প্রবন্ধে ইংরেজ ঐতিহাসিক অ্যাক্টনের কথা তুলে বলেছিলেন, উনিশ শতকের মানুষের পক্ষে নবম অথবা দশম শতকের মানুষের মন বোঝা বেশ কঠিন। এই কারণে কঠিন যে. কী রাষ্ট্রে ও সমাজে, কী ব্যক্তিগত কাজে ও ভাবনায় নবম অথবা দশম শতকের মানুষ বর্তমান মানুষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই মৌলিক পার্থক্যের মূল সূত্রটি মনে রাখলে সেকালের অবিচারের নৃশংসতার ও রক্তলোভের কাহিনী একালে আর দুর্বোধ্য লাগে না। বিভূতিভূষণ লর্ড অ্যাক্টনের উক্তিতে শুধু যে সেকাল আর একালের পার্থক্য দেখতে পেয়েছিলেন তা নয়, সেকাল থেকে একালের অন্তর্নিহিত অগ্রগতির তত্ত্বকে বুঝতে পেরেছিলেন। লিখেছিলেন, 'শতাব্দীর পর শতাব্দী যতই পার হয়ে যাচ্ছে, মানুষ ততই দ্রুত এগিয়ে চলেছে—একযুগের গোঁড়ামি ধর্মান্ধতা কুসংস্কার অন্য যুগের মানুষের পক্ষে পরম বিস্ময়ের বস্তু, এ যুগের মিরাকল পরবর্তী যুগের সুপরিচিত দৈনিক ঘটনা—সহস্র শতাব্দীর পারের কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষের উদ্দেশ্যে তার যাত্রা, এখনও সে গৌরবময় বিবর্তনের কাহিনী আমাদের কল্পনারও অতীত। বিশ্বমানবের অগ্রগতির সাহায্যের জন্য মাঝে মাঝে এক একজন লোক আসেন। যাঁরা একাধারে মানুষের সকল দিকে সকল পরিণতির আদর্শ।' তাঁর ধারণায় রবীন্দ্রনাথ তেমন এক আদর্শ মানুষ।

১ উৎকর্ণ (২য় মুদ্রণ). পৃ. ২১৮।

অসীমের জন্য যে তৃষ্ণা সভ্যতার অগ্রগতির পথের সাথী ও প্রদর্শক আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যেই সেই তৃষ্ণার সন্ধান পাই। আগে আমাদের দেশের লেখকদের উৎকর্ষের পরিচয় দিতে হলে বিদেশি সাহিত্যিকদের মাপকাঠি হিশেবে ব্যবহার করা হত। তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে বাঙলার স্কট, মধুসূদনকে বাঙলার মিল্টন, কালীপ্রসন্ন ঘোষকে বাঙলার এমার্সন না বলা পর্যন্ত আমরা স্বস্তি পেতাম না। আমাদের এই দাসমনোবৃত্তি রবীন্দ্রনাথই দূর করলেন। আমরা নিশ্চিন্ত মুরুব্বিয়ানার স্বরে তাঁকে বাঙলার শেলি অথবা মেটারলিঙ্ক বলতে পারলাম না। রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যের একটি 'unclassified phenomenon' হয়ে রইলেন। বিভূতিভূষণের মতে রবীন্দ্রনাথ যেমন সভ্যতার অগ্রগতি ঘটিয়েছেন নানা দিকে, সাহিত্যের মোড়ও তেমনি ফিরিয়েছেন বিশেষ প্রকৃতি বর্ণনায়। তাঁর আগে প্রকৃতির বর্ণনার মধ্যে ছিল 'decadent' যুগের সংস্কৃত কাব্যের অনুকরণে আড়ষ্ট ও মামুলী ধরনের বাঁধিগৎ। পূর্ণিমা থেকে কোকিলের কুহু পর্যন্ত তাতে সবই আছে, নেই কেবল প্রাণ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতি বর্ণনাও সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবমুক্ত নয়, কিন্তু সর্বপ্রথমে রবীন্দ্রনাথেরই মধ্যে পাই প্রকৃতির বিপুলত্ব ও রহস্যকে। অনাড়ম্বর বাহুল্যবর্জিত বলেই তা প্রাণবন্ত। অসাধারণ শক্তিমান প্রতিভা সেখানে কেতাবী বর্ণনাপদ্ধতির মোহপাশ কাটিয়ে দিয়ে নিজের চোখ ও মনকে বড়ো বলে মেনেছে, সে দর্শনও যেমন নিখুঁত, তেমনি convincing—পদ্মাচরের বিপুল প্রসারের সঙ্গে, পুষ্পিত কাশবনের সৌন্দর্যের সঙ্গে মন সেখানে এক দিকে যেমন এক হয়ে মিশে যায়, অন্য দিকে তেমনি নতুন শক্তির উৎসমুখের সন্ধান পেয়ে নতুন পথে দিগ্বিজয়ে বার হবার অদম্য স্ফূর্তিকে লাভ করে।' বিভূতিভূষণ বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকৃতির বিপুলতার ও রহস্যের সঙ্গে সঙ্গে আর-একটি ব্যাপার আমরা সর্বপ্রথম লক্ষ করি। তা হল, জীবন ও জগতের প্রসঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিতেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির আত্মীয়তা খুঁজে পেয়েছেন। প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপী প্রভাবের কথা উল্লেখ করে বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন, শরতের মধ্যাহ্ন থেকে শুরু করে নাম উচ্চারণের পদ্ধতি পর্যন্ত জীবনের মহৎ ও ক্ষুদ্র এমন কোনো দিক নেই যেদিকে তাঁর নজর পড়েনি। 'এ যুগের বাংলার কবি কথাসাহিত্যিক প্রবন্ধলেখক—তাঁর কাছে সবারই ঋণের বোঝা বিপুল, বর্তমান চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন তিনি, রূপ দিয়েছেন তিনি—বিশ্লেষণ করে দেখলে সকলেরই চিন্তার উপর রবীন্দ্রনাথের এই প্রভাব ধরা পড়বেই।'

বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, নাম 'রবি-

প্রশস্তি'। আসলে এটি ছিল ২৫শে বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব উপলক্ষে বর্ধমানে অনুষ্ঠিত এক সভায় সভাপতি বিভূতিভূষণের ভাষণ। লেখাটি অধুনালুপ্ত 'অভ্যুদয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পরে ১৩৬৮ সালের বৈশাখ সংখ্যায় 'শনিবারের চিঠি'তে পুনঃপ্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথের কবিতার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে বহুব্যবহৃত সৌন্দর্যানুভূতি কথাটির ব্যবহার ও বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন—লিওনার্দো যেমন রেখার ও রঙের অপূর্ব সমাবেশে, বেঠোফেন যেমন সুকৌশল ধ্বনিসমন্বয়ে, রবীন্দ্রনাথ তেমনি অনন্য শব্দচয়নে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন। তবু তাঁদের তৈরি কল্পলোক রেখার আর রঙের, ধ্বনির আর শব্দের সমষ্টিমাত্র নয়। আসলে এই কল্প বা আনন্দলোক সৃষ্টির মূলে আছে এ সবের অতীত কোনো অদৃশ্য প্রভাব, কোনো ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি। 'এই অনুভূতি বর্ণ ও ধ্বনির বহু ঊর্ধ্বে স্থাপিত এক মহত্তর সত্য।' এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্পর্শ বোঝাতে গিয়ে তিনি গল্পগুচ্ছ-এর উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের আগে বাঙলা সাহিত্যে ছোটোগল্প ছিল না। যা ছিল তা ছোটোগল্প নয়—হয় কাহিনী, নয় অসার্থক উপন্যাসের অধ্যায়। ছোটোগল্প 'কথা'র একটি বিশেষ ধরণের প্রকাশ। এই 'কথা' আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে ছিল। যেমন কথাসরিৎসাগর, উদয়সুন্দরীকথা, পঞ্চতন্ত্র, দশকুমারচরিত। কিন্তু ছোটোগল্প এই ধরণের 'কথা' নয়। ফরাশি সাহিত্যে উনিশ শতকের মধ্যভাগে মোপাসাঁ ব্যালজাক অ্যালফাস দোঁদে প্রভৃতির হাতে conte নামে এক ধরণের রচনা খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং এই রচনা ফ্রান্স পেরিয়ে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন দেশের লেখক ফরাশি conteএর রূপের সামান্য অদল বদল করেন বটে কিন্তু এর রচনার মূল কৌশলটি এঁরা যথাযথভাবে আয়ত্ত করে নেন। সে মূল কৌশল হল মুহূর্ত বা moment সৃষ্টি, যা 'ছোটোগল্পের আর্টের প্রাণবস্তু'। ইউরোপের এই নতুন ধরণের সৃষ্টির ওপর রবীন্দ্রনাথেরও নজর পড়ল এবং আমাদের সাহিত্যে তিনি conte ধরণের রচনার আমদানি করলেন, যার ফলস্বরূপ আমরা গল্পগুচ্ছ-এর অপূর্ব গল্পগুলি পেলাম। ফরাশি সাহিত্যের এই ধরণের রচনাশিল্পের সুনির্দিষ্ট ক্রমগুলির কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ফরাশি সাহিত্যের গল্পের নিয়মগুলো এত স্থিতিশীল ও সুনির্দিষ্ট যে এর সঙ্গে ইউরোপীয় সংগীতের বিভিন্ন ক্রমগুলির তুলনা চলে। এই রচনাশিল্পের পাঁচটি পর্যায়—ভূমিকা, সম্প্রসারণ, পুনরাবৃত্তি, বিরতি ও চরমোৎকর্ষ। এই শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিশেবে তিনি আনাতোল ফ্রাঁসের 'জুডিয়ার শাসনকর্তা' গল্পটির উল্লেখ করেছেন। 'রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছোটোগল্প এ বিষয়ে একেবারে নিখুঁত ফরাসি আর্ট।' যেমন অপূর্ব তাহার

পরিবেশ, তেমনি অপূর্বতম তাহার মুহূর্তসৃষ্টি। মুহূর্তসৃষ্টির সাহায্যেই ছোটোগল্প অমর হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ এইরূপ অমর মুহূর্ত সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার 'পোস্ট-মাস্টার' 'কাবুলিওয়ালা' 'দৃষ্টিদান' 'ব্যবধান'' প্রভৃতি বিখ্যাত গল্পগুলিতে। এই মুহূর্তগুলি এতই সুস্পষ্ট ও যথাযথ, যে কখনও ছোটোগল্প পড়ে নাই বা ছোটোগল্পের আর্ট যে জানে না সেও এগুলির মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিবে।' রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের এই অনুভূতিপ্রধান মুহূর্তসৃষ্টির সঙ্গে ক্যাথারিন ম্যান্‌স্‌ফিল্‌ডের গল্পগুলির তুলনা চলে। রবীন্দ্রনাথের শেষদিকের গল্পগুলি সম্বন্ধে বিভূতিভূষণ বলেছিলেন, এই পর্বের গল্পগুলিতে ফরাশি conte-এর প্রভাব আর দেখা যায় না। যেমন, 'বোষ্টমী'। এই পর্বে ফরাশি শিল্পের শৃঙ্খল ভেঙে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব একটি অপূর্ব ধারা আবিষ্কার করেছেন, যার চরম পরিণতি আমরা দেখতে পাই চতুরঙ্গ-এ।

বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথের যে বইটি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন সে বই ক্ষণিকা। দিনলিপির এক জায়গায় তিনি লিখে গিয়েছেন, 'আমি ক্ষণিকার বড ভক্ত। 'ক্ষণিকা'র কথা একবার উঠলে আমি স্থির থাকতে পারি না।'[১]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের কাছে একালের বাঙলার কবি-শিল্পীদের ঋণের বোঝা বিপুল। এ কথা সাধারণ ভাবে জানিয়ে প্রকৃতির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্পর্কে বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন, প্রকৃতির বিপুলতা ও রহস্যকে আমরা রবীন্দ্রনাথের মাঝখানে প্রথম চিনতে শিখি। তাঁর গল্প কবিতায় পদ্মাচরের বিপুল প্রসার ও পুষ্পিত কাশবনের সৌন্দর্যের সঙ্গে মন যেমন এক দিকে এক হয়ে যায়, অন্য দিকে আবার এই নতুন শক্তির উৎসমুখের পরিচয় পেয়ে নতুন পথে বার হবার প্রেরণা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ-এ অথবা সোনার তরী চিত্রা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলিতে পদ্মার এই বিপুল প্রসার ও রহস্যের চিত্র মেলে। 'নিশীথে' গল্পে কথক যখন মনোরমাকে নিয়ে বোটে করে পদ্মায় এসে পৌচেছে 'ভয়ংকরী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভুজঙ্গিনীর মতো কৃশনির্জীবভাবে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় নিবিষ্ট ছিল। উত্তরপারে জনশূন্য তৃণশূন্য দিগন্তপ্রসারিত বালির চর ধূ ধূ করিতেছে, এবং দক্ষিণের উচ্চ পাড়ের উপর গ্রামের আমবাগানগুলি এই রাক্ষসী নদীর নিতান্ত মুখের কাছে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে; পদ্মা ঘুমের ঘোরে এক-একবার পাশ ফিরিতেছে এবং বিদীর্ণ তটভূমি ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে।' পদ্মার এই প্রসার সোনার তরীর কবির চোখে পড়েছে, 'মানসসুন্দরী'তে তিনি লিখেছেন—

১ অপ্রকাশিত দিনলিপি, ১১।৮।১৯৩৩।

হেরিব অদূরে পদ্মা, উচ্চতটতলে
শ্রান্ত রূপসীর মতো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে
প্রসারিয়া তনুখানি, সায়াহ্ন-আলোকে
শুয়ে আছে।

প্রকৃতির মধ্যে বিপুলতার ও রহস্যের সন্ধান ও মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক স্থাপন আমাদের দেশে সফলতায় ও ব্যাপকতায় রবীন্দ্রনাথে প্রথম হলেও এই ধারার সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথে সর্বপ্রথম নয়। ইংলণ্ডে উনিশ শতকীয় রোমান্টিক কবি-গোষ্ঠীর কাছ থেকে বাঙলা সাহিত্যে বিহারীলালই সর্বপ্রথম এই ধারা গ্রহণ করেন। এর পরে বিহারীলালের কাছ থেকে পান রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যিক গোষ্ঠী। রবীন্দ্রোত্তর কথাশিল্পীদের মধ্যে আবার বিভূতি-ভূষণই এই ধারা সবচেয়ে অধিক পরিমাণে গ্রহণ করেন। বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির মধ্যে যে বিপুলতার ও রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন সে সন্ধান বিভূতিভূষণেরও প্রকৃতিবোধের অন্যতম উৎস-সন্ধান। প্রকৃতির অনির্বচনীয় বিপুলতা ও রহস্য-ময়তার বার্তানিবেদনের জন্য বিভূতিভূষণেরও কী অশান্ত ব্যাকুলতা! 'যে-কথাটা বার-বার নানাভাবে বলিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কোনোবারই ঠিকমত বুঝাইতে পারিতেছি না, সেটা হইতেছে এই প্রকৃতির একটা রহস্যময় অসীমতার, দুরধিগম্য-তার, বিরাটত্বের ও ভয়াল গা-ছম্-ছম্-করানো সৌন্দর্যের দিকটা।'[১] নিস্তব্ধ অপরাহ্নে লবটুলিয়া বইহারের দিগন্তবিস্তৃত বনঝাউ ও কাশের বনে প্রকৃতির বিশাল রূপ বিভূতিভূষণের মনকে অসীম রহস্যানুভূতিতে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। বিভূতিভূষণ তাকে বলেছেন, সে যেন খুব উঁচু দরের নীরব সংগীত। সে মহাসংগীতের লয় ও সঙ্গতি 'নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোর তালে, জ্যোৎস্নারাত্রের অবাস্তবতায়, ঝিল্লীর তানে, ধাবমান উল্কার অগ্নিপুচ্ছের জ্যোতিতে।'[২]

রবীন্দ্রনাথের মতো বিভূতিভূষণও বিপুল বিস্ময় নিয়ে প্রকৃতির দিকে তাকিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের এই বিস্ময় এক দিকে যেমন অনির্দেশ্যতায় রোমান্টিক অপর দিকে তেমনি তাত্ত্বিকতায় মরমিয়া বা মিস্টিক। পুরীর সমুদ্রের ধারে বসে প্রকৃতির প্রতি রোমান্টিক দৃষ্টি মেলে কখনও তিনি সমুদ্রের 'প্রথম গর্ভের মহারহস্য বিপুল'তায় বিস্মিত হয়েছেন, কখনও বিস্ময়ে পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হয়েছেন এই কথা ভেবে 'আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই

১ আরণ্যক (৬ষ্ঠ মুদ্রণ), পৃ. ১১৪।

২ ঐ, পৃ. ১১৫।

ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে, এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মতো একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্‌গত হত।'[১]

রোমান্টিক দৃষ্টিতে বিভূতিভূষণেরও কাছে এই পৃথিবী দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নায় এক অপার্থিব স্বপ্নভূমি বলে মনে হয়েছে, কখনও তিনি পায়ে পায়ে সময়ের উজান বেয়ে ফিরে গিয়েছেন কোনো এক অতীত দিনে যে দিন মহালিখারূপের পাহাড় আর অরণ্যের জায়গায় ছিল 'মহাসমুদ্র—প্রাচীন সেই মহাসমুদ্রের ঢেউ আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িত ক্যাম্বিয়ান যুগের এই বালুময় তীরে—এখন যাহা বিরাট পর্বতে পরিণত হইয়াছে। মানুষ তখন ছিল না, এ ধরণের গাছপালাও ছিল না। যে ধরণের গাছপালা জীবজন্তু ছিল, পাথরের বুকে তারা তাদের ছাঁচ রাখিয়া গিয়াছে।'[২]

যে-রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক ভাবদৃষ্টিতে কখনও বসুন্ধরার জন্মলগ্নের আদিম ক্ষণটিতে ফিরে যেতে চান, কখনও তার বিচিত্র সৃষ্টিকে স্পর্শ করতে চান, সেই রবীন্দ্রনাথই মরমীর গভীর তত্ত্বদৃষ্টিতে প্রকৃতির আদি সত্তার কাছে আত্মনিবেদন করেন—

আমারে ফিরায়ে লহো
সেই সর্ব-মাঝে যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে প্রাণ…।[৩]

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যেমন এই বিশ্বপ্রকৃতির মাঝখানে পরমের স্পর্শ অনুভব করেছেন ('And I have felt a presence') রবীন্দ্রনাথও তেমনি জ্যোৎস্নাসুপ্ত নিস্তব্ধ প্রহরে আনন্দে ও বিষাদে-গাঁথা ছায়ালোকের মাঝখানে তাঁর আসন পেতেছেন—

---

১ ছিন্নপত্রাবলী, পত্র সংখ্যা ৭৪।

২ আরণ্যক, (৬ষ্ঠ মুদ্রণ), পৃ. ১০০।

৩ সোনার তরী, 'বসুন্ধরা'।

শুনিতেছি তৃণে তৃণে, ধূলায় ধূলায়
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধ'রে
অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল।[১]

রবীন্দ্রনাথের মতো বিভূতিভূষণও মরমীর গভীর তত্ত্বদৃষ্টিতে প্রকৃতির দিকে তাকিয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে এই বিশ্বপ্রকৃতি এক মহান্ শিল্পীর মহাকাব্য। 'মহাকবি তিনি, অনাদ্যন্ত শাশ্বত যুগ ধরে এই রকম শিলাস্তৃত ঝর্ণার তটে, অনন্ত নীহারিকামণ্ডলী ছড়ানো আকাশপটে, বনকুসুমের পাপড়ির দলে, বিহঙ্গকাকলীতে, অগ্নিপুচ্ছ ও ধূমকেতুদলের যাতায়াতে, তিনি আপন মনে তাঁর বিরাট এপিক কাব্য লিখেই চলেছেন।'[২] কখনও ক্ষান্তবর্ষণ মেঘথমকান সন্ধ্যায় ফুলকিয়া বইহারের দিগন্তহারা প্রান্তরের মধ্যে তিনি সেই দেবশিল্পীর স্বপ্ন দেখেছেন। 'এই মেঘ, এই সন্ধ্যা, এই বন, কোলাহলরত শিয়ালের দল, সরস্বতী-হ্রদের জলজ পুষ্প, মহালিখা-রূপের পাহাড়, আকাশ, ব্যোম সবই তাঁর সুমহতী কল্পনায় এক দিন ছিল বীজরূপে নিহিত—তাঁরই আশীর্বাদ আজিকার এই নবনীলনীরদমালার মতোই সমুদয় বিশ্বকে অস্তিত্বের অমৃতধারায় সিক্ত করিতেছে'।'[৩]

প্রকৃতিভাবনায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিভূতিভূষণের আর-একটি মৌলিক মিল চোখে পড়ে। সে মিল মূলতঃ মনোভাবের। এবং তার আদি উৎসে রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য। রবীন্দ্রনাথ এবং বিভূতিভূষণ উভয়েরই দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানতঃ শান্তরসাশ্রিত এবং সেই অর্থে যথার্থ ভারতীয়। ফলে উভয়ের হাতে প্রকৃতির শান্তরূপটি বেশি করে ফুটেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ে শুকনো পাতায় অলস মধ্যাহ্নের খেলা, অশ্বত্থের দীর্ঘতর ছায়া, দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে রৌদ্রপীত অঞ্চল-বক্ষে উদাসিনী বসুন্ধরার মূর্তি, কানে ভাসে তরু মর্মরের ব্যাকুলতা, মেঠোসুরে অনন্তের বাঁশির কান্না।[৪] তার পাশে বিভূতিভূষণের চোখে পড়ে সোনাডাঙার মাঠে সোঁদালি ফুলের ঝাড়, দূরবিসর্পিত প্রান্তরের ওপর তিসিফুলের মতো নীল আকাশ, গৃহত্যাগী উদাসী বাউলের মতো কাঁচা মাটির পথ।[৫] প্রকৃতিভাবনায়

১ নৈবেদ্য, ২৩ সংখ্যক কবিতা।

২ হে অরণ্য কথা কও (৬ষ্ঠ মুদ্রণ), পৃ. ১৬০।

৩ আরণ্যক (৬ষ্ঠ মুদ্রণ), পৃ. ২৫২।

৪ সোনার তরী, 'যেতে নাহি দিব'।

৫ পথের পাঁচালী (৮ম সংস্করণ), ২৮ পরিচ্ছেদ, পৃ. ২৭৫।

উভয়েই শান্তির ও কল্যাণের পূজারী হয়েও প্রকৃতির অশান্ত ও অমঙ্গল রূপের প্রতি যে উভয়েই উদাসীন ছিলেন তা নয়। একান্তই স্বল্পসংখ্যক হলেও রবীন্দ্রনাথ যেমন 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' 'সিন্ধু তরঙ্গ' প্রভৃতি কবিতায়, 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'-এর মতো গল্পে প্রকৃতির ধ্বংসমূর্তি দেখেছেন, বিভূতিভূষণও তেমনি গ্রীষ্মের দাবদাহে, বোমাইবুরুর জঙ্গলে প্রকৃতির রুদ্র মূর্তি দেখেছেন। তাঁর ধারণা 'মানুষ প্রকৃতির এই মুক্ত সৌন্দর্যকে ধ্বংস করিতেছে সত্য, গাছপালাকে দূর করিয়া দিতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি এক দিন প্রতিশোধ লইবে। ট্রপিকস-এর অরণ্য আবার জাগিবে, মানুষকে তাহারা তাড়াইবে, আদিম অরণ্যানী আবার ফিরিবে।'[১]

রবীন্দ্রনাথের শান্তরসাশ্রিত প্রকৃতিভাবনায় শান্তরসের পথ বেয়ে যে দুই ঋতুর প্রকৃতি তাঁর গল্প-কবিতায় অধিকতর আনাগোনা করেছে সে দুই ঋতু বর্ষা ও শরৎ। বর্ষা ও শরৎ অবশ্য একান্তভাবেই শান্তরসের ঋতু নয়। উভয় ঋতুরই মাঝখানে বিপুল উদ্দামতার ও উৎসবের সুর রয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শান্ত দৃষ্টিতে এক দিকে বর্ষার স্নিগ্ধ সজল করুণরূপ, অপর দিকে শরতের সুদূর স্বপ্নাচ্ছন্ন উদাসরূপ চোখে পড়েছে। ঋতুর মধ্যে যেমন বর্ষা ও শরৎ তাঁর স্বভাবের অনুকূল বলেই গল্পে-কবিতায় বেশি জায়গা পেয়েছে, ঠিক তেমনি পেয়েছে দিনের মধ্যে মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা। বর্ষার সঙ্গে সন্ধ্যার এবং শরতের সঙ্গে মধ্যাহ্নের মেজাজ মিলে প্রকৃতির ওপরে বর্ষা-সন্ধ্যা ও শরৎ-মধ্যাহ্ন এক করুণ ও উদাস ছায়া ফেলেছে। তাই আষাঢ়ের এক সন্ধ্যায় বাঁধনহারা বৃষ্টিধারার মাঝখানে গৃহকোণবাসী একাকী কবি বলেন,

দূরের পানে মেলে আঁখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি,
পরান আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে।[২]

কখনও শরৎ-মধ্যাহ্নের আকাশের নীচে কবির চোখে পড়েছে রৌদ্রস্নাত দিগন্ত-বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, নীলাভ্রের স্বচ্ছতম নির্মল বিস্তার; স্বপ্নাচ্ছন্ন ক্ষণটিতে মনে হয়েছে—

কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসী
দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন
কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে।[৩]

---

১ অপরাজিত (৬ষ্ঠ মুদ্রণ), ২০ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩০৭।

২ গীতাঞ্জলি, ১৬ সংখ্যক কবিতা।

৩ কড়ি ও কোমল, 'সারাবেলা'।

এই শাস্ত্রদৃষ্টির ফলে বিভূতিভূষণের সাহিত্যেও শারদীয়া প্রকৃতি ভিড় করেছে। 'আকাশে বাতাসে গরম রৌদ্রের গন্ধ, নীল নির্মেঘ আকাশের দিকে চাহিলে মনে হঠাৎ উল্লাস আসে, বর্ষাশেষের সবুজ লতাপাতায়, পথিকের চরণভঙ্গিতে কেমন একটা আনন্দ মাখান। রেলপথের দু পাশে কাশফুলের ঝাড় গাড়ির বেগে লুটাইয়া পড়িতেছে।'[১] এই শরৎ-মধ্যাহ্নে অপরাজিত-এর শেষে অপুর এক অদ্ভুত জীবনানুভূতি হয়েছে। 'নিস্তব্ধ শরৎ-দুপুরে যখন অতীতকালের এমনি এক মধুর মুগ্ধ শৈশব দুপুরের ছায়াপাতে স্নিগ্ধ ও করুণ হইয়া উঠে তখনই সে বুঝিতে পারে চেতনার এ স্তর বাহিয়া সে বহুদূর যাইতে পারে।'[২]

বিভূতিভূষণ তাঁর মনোভাব প্রকাশের উপায় হিশেবে কোনো বিশেষ ঋতুর চেয়ে দিবসের দুটি বিশেষ কালকে অধিকতর অনুকূল বলে বিবেচনা করেছেন। সেই দুটি কাল—অপরাহ্ণ ও জ্যোৎস্নারাত্রি। তাঁর দিনলিপির এক স্থানে তিনি প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন, 'আমি বৈকাল ভালোবাসি বড়ো আর ভালোবাসি—জ্যোৎস্নারাত।'[৩] বিভূতিভূষণের স্বভাবের মাঝখানে যে উদাসী ও রহস্যময় সত্তা লুকিয়ে আছে সেই সত্তা অপরাহ্ণ ও জ্যোৎস্নারাত্রিরও মাঝখানে লুকিয়ে আছে। বিভূতিভূষণ তাই তাঁর মনোভাবকে বোঝাতে গিয়ে অপরাহ্ণের ও জ্যোৎস্নারাত্রির প্রকৃতিকে এনে ফেলেছেন। বাঙালি কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে বিভূতিভূষণের মতো আর কারও সাহিত্য অপরাহ্ণের আলোতে এত মায়াময় হয়ে ওঠেনি। বিভূতিভূষণের অধিকাংশ গল্প উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলোর অনেক নিবিড় মুহূর্তের সঙ্গে এই অপরাহ্ণ জড়িয়ে আছে। অপুর 'পাঠশালার চারি পাশের বনজঙ্গলে অপরাহ্ণের রাঙা রৌদ্র বাঁকা ভাবে আসিয়া পড়িত। কাঁটালগাছের জগডুমুরগাছের ডালে-ঝোলা গুলঞ্চলতার গায়ে টুনটুনি পাখি মুখ উঁচু করিয়া বসিয়া দোল খাইত। পাঠশালাঘরে বনের গন্ধের সঙ্গে লতাপাতার চাটাই, ছেঁড়াখোঁড়া বই-দপ্তর, পাঠশালার মাটির মেঝে, ও কড়া দা-কাটা তামাকের ধোঁয়া; সবসুদ্ধ মিলিয়া এক জটিল গন্ধের সৃষ্টি করিত।'[৪] বিভূতিভূষণের এই প্রিয় অপরাহ্ণ তাঁর ভাবনায় অতীতে-ভবিষ্যতে দূরবিসর্পিত। বিকেলকে দেখে অপুর কখনও মনে হয়েছে কোনো এক অতীতে এই মায়াময় অপরাহ্ণ তার জীবনে এসেছিল, আবার কখনও মনে হয়েছে কোনো এক ভবিষ্যতে 'তখনও এই রকম বৈকাল, এই রকম কালবৈশাখী নামিবে তিন হাজার বর্ষ পরের

---

১ পথের পাঁচালী (৮ম সংস্করণ), ২৬ পরিচ্ছেদ, পৃ. ২৩১।

২ অপরাজিত (৬ষ্ঠ মুদ্রণ), ২৬ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩১৮।

৩ অপ্রকাশিত দিনলিপি, ২।২।১৯৩৪।

৪ পথের পাঁচালী (৮ম সংস্করণ), ১৪ পরিচ্ছেদ, পৃ. ১০১।

বৈশাখ দিনের শেষে।'[১] এই উদাস অপরাহ্ণের পাশে পাশে তাঁর সাহিত্যে জ্যোৎস্নারাত্রির কোথাও স্নিগ্ধকরুণ, কোথাও অপার্থিব রহস্যময় রূপ ধরা পড়েছে। কখনও বৈশাখী শুক্লাদ্বাদশীর জ্যোৎস্না পরলোকগত দুঃখিনী মায়ের আশীর্বাদের মতো অপুর ওপর বর্ষিত হয়েছে, কখনও দোলপূর্ণিমারাতের জ্যোৎস্না সত্যচরণের মনে কেমন এক উদাস বাঁধনহীন ভাব এনেছে। 'সে-রকম ছায়াবিহীন জ্যোৎস্না জীবনে দেখি নাই। এখানে খুব বড়ো বড়ো গাছ নাই, ছোটোখাট বনঝাউ ও কাশবন—তাহাতে তেমন ছায়া হয় না। চকচকে সাদা বালি মিশানো জমি ও শীতের রৌদ্রে অর্ধশুষ্ক কাশবনে জ্যোৎস্না পড়িয়া এমন এক অপার্থিব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা দেখিলে মনে কেমন ভয় হয়। মনে কেমন যেন একটা উদাস বাঁধনহীন মুক্ত ভাব—মন হু হু করিয়া উঠে, চারি দিকে চাহিয়া সেই নীরব নিশীথরাত্রে জ্যোৎস্নাভরা আকাশতলে দাঁড়াইয়া মনে হইল এক অজানা পরীরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।'[২] প্রকৃতির উদাস ও করুণ এই দুই রূপ রবীন্দ্রনাথ এবং বিভূতিভূষণ উভয়ের মাঝখানে থাকলেও রবীন্দ্রনাথে যেমন প্রকৃতির দুই রূপই যথেষ্ট, বিভূতিভূষণে কিন্তু তা নয়। বিভূতিভূষণের চোখে প্রকৃতির উদাস ও রহস্য-ময় রূপই বেশি করে ধরা পড়েছে। অবশ্য সব শান্তরসের কেন্দ্রেই এই রহস্য বা বিস্ময়বোধ বর্তমান—বিভূতিভূষণে আবার এই বোধেরই প্রাধান্য। বিভূতিভূষণের শিশুদৃষ্টি বিরাট সৃষ্টির খেলাঘর নিয়ে এত মুগ্ধ, এবং মশগুল যে তার মাঝখানে মানুষের সুখ-দুঃখকে একান্তভাবে নজর দেওয়ার সময় তিনি পান না। অরণ্য এবং জীবজগতের মতোই মানুষও এই খেলাঘরের খেলনা। মোহিতলালকে বিভূতিভূষণ যে 'vastness of space' and passing time'-এর কথা বলেছিলেন সেই দিশাহারা দেশকাল, সেই 'মহাকালের মিছিল' নিয়ে তিনি অধিকতর কুতূহলী। 'আমি শুধু কৌতূহলাক্রান্ত এই মহাকালের মিছিলে। এই সম্রাট সম্রাজ্ঞী খোজা ভৃত্য সৈন্য সেনাপতি—তৃণের মতো স্রোতের মুখে ভেসে যাওয়ার দিকটা আমায় মুগ্ধ করে। মহাকালের এই তাণ্ডবনৃত্যছন্দ যুগ যুগ ধরে রাজা মহারাজা সাম্রাজ্য কাহিনীকে উড়িয়ে ফেলে দিয়ে আপন মনে কোন বিশাল অন্তরের মৃদঙ্গের গম্ভীর বোলের সঙ্গে তাল রেখে চলছে—দিকে দিকে, যুগে যুগে, ইউট্রোপিয়াস্ গিল্ডে ক্লফাইলাসের দল ও তাদের কড়ির পুঁটুলি ফেনার ফুলের মতো মিলিয়ে যাচ্ছে—জাতি মহাদেশ মথিত হয়ে যাচ্ছে তাঁর বিরাট চরণ-পেষণে। মহাশূন্যে তাঁর

১ অপরাজিত (৬ষ্ঠ মুদ্রণ), ২৪ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩৮৫।

২ আরণ্যক (৬ষ্ঠ মুদ্রণ), পৃ. ২৫-২৬।

মহাবিষাণ শুধু অনন্তকাল ধরে এই চলে যাওয়ার উদাসভেরীধ্বনি বাজাচ্ছে… অনাহত শব্দের মতো তা সাধারণ মানুষের শক্তির বাইরে।'[১] প্রকৃতির মাঝখানেও এই গতির ছন্দকে আবিষ্কার করে বিভূতিভূষণ বিস্মিত হয়েছেন। বাইরে থেকে যে জগৎকে এত শান্ত ও সনাতন লাগে তিনি তার আড়ালে এক ভয়ানক রুদ্র গতিবেগ উপলব্ধি করেছেন। 'রাত্রি গভীর হইবার সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রগুলি কি অদ্ভুতভাবে স্থান পরিবর্তন করে। আবলুস ডালের ফাঁকের তারাগুলি ক্রমশ নীচে নামে, কালপুরুষ ক্রমে পর্বতসানুর দিক হইতে মাথার উপরকার আকাশে সরিয়া আসে, বিশালকায় ছায়াপথটা তেরছা হইয়া ঘুরিয়া যায়, বৃহস্পতি পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়ে। রাত্রির পর রাত্রি এই গতির অপূর্ব লীলা দেখিতে দেখিতে এই শান্ত, সনাতন জগৎটা যে কি ভয়ানক রুদ্র গতিবেগ প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে তাহার স্নিগ্ধতা ও সনাতনত্বের আড়ালে, সে সম্বন্ধে অপুর মন সচেতন হইয়া উঠিল —অদ্ভুতভাবে সচেতন হইয়া উঠিল।'[২]

রবীন্দ্রনাথের মতো বিভূতিভূষণেরও প্রকৃতিভাবনা শাস্ত্রসাশ্রিত বলে উভয়েই যেমন বিশেষ ঋতুর ও ক্ষণের প্রকৃতির রূপকে দেখিয়েছেন ঠিক তেমনি এই কথাটিকেই আবার ঘুরিয়ে বলা চলে, রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণ উভয়েই প্রকৃতির দুই রূপের রূপকল্প দিয়ে তাঁদের জীবনবোধের পরিচয় দিতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এবং বিভূতিভূষণ সৃষ্টির মাঝখানে যে সীমাহীনতা ও গতির স্বপ্ন দেখেছেন সেই স্বপ্নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কোথাও নিরুদ্দেশ নদ-নদীর, কোথাও উধাও পথ-প্রান্তরের ছবি। রবীন্দ্রনাথ সীমাহীনতা ও গতির ভাবনাকে যেমন কখনও নিরবধি পদ্মার নয়তো বীরভূমের শাল-তাল-আমলকির পত্রমর্মরিত উধাও মাঠের চিত্রকল্পে রূপায়িত করেছেন, তেমনি বিভূতিভূষণও কখনও ইছামতীর চলমান ছবিতে, কখনও দিগন্তবিস্তৃত ফুলকিয়া বইহার-লবটুলিয়ার ছবিতে তাকে রূপায়িত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন পদ্মামাতৃক, বিভূতিভূষণ তেমনি ইছামতীমাতৃক। রবীন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণের মতো আজন্ম না হলেও দীর্ঘকাল নদীর সঙ্গে বসবাস করেছেন। ১৮৯১ সালে উত্তরবঙ্গে জমিদারি দেখতে যাওয়া থেকে শুরু করে ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত এই দীর্ঘ দশ বছর পদ্মার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়। আর বিভূতিভূষণের সঙ্গে ইছামতীর সম্পর্ক তো আরও আবাল্যের।

ইছামতীর শান্ত প্রবাহের সঙ্গে বিভূতিভূষণের মনের মিল থাকায় তাঁর

---

১ স্মৃতির রেখা (৪র্থ মুদ্রণ), ৬।১২।১৯১৭, পৃ. ৭৪-৭৫।
২ অপরাজিত (ষষ্ঠ মুদ্রণ), ১৮ পরিচ্ছেদ, পৃ. ২৭৫।

ইছামতী-প্রীতি যেমন স্বাভাবিক লাগে, রবীন্দ্রনাথের পদ্মা-প্রীতি আপাততঃ তেমন লাগে না। এই কথা ভেবে লাগে না, পদ্মা তো প্রমত্তা। অপ্রমত্ত রবীন্দ্রনাথ তাকে এত ভালোবাসলেন কী করে? কী করে বললেন 'বাস্তবিক, পদ্মাকে আমি বড়ো ভালোবাসি।...পদ্মা আমার যথার্থ বাহন'? এই ভালোবাসা কি নেহাতই পদ্মার সঙ্গে দশ বছর বসবাসের ফল? এর উত্তরে বলা চলে, রবীন্দ্রনাথ যে পদ্মাকে ভালোবেসেছেন সে পদ্মা যে কোথাও ভয়ংকরী ও সর্বনাশা নয়, তা নয়। কবির চোখে সে পদ্মা বিশেষ করে সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলন পূর্ণ সংসারযাত্রার পণ্যবাহী, নয় সে একটি idea বা ভাবমূর্তি। তার পাশে কোথাও নামগোত্রহীন মানব-সমাজের বিপুল সংসারলীলা চলেছে, নয় তার মাঝখানে চলেছে নিঃশব্দ এক গতিচ্ছন্দ। যে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ পদ্মাকে ভালোবাসার কথা লিখেছেন সে চিঠির সবটা পড়লে বোঝা যাবে তাঁর প্রিয় পদ্মা স্ফীত ও নীলাভ নয়, তন্বী ও পাণ্ডুর। 'পদ্মার জল অনেক কমে গেছে—বেশ স্বচ্ছ কৃশকায় হয়ে এসেছে—একটি পাণ্ডুরবর্ণ ছিপছিপে মেয়ের মতো, নরম শাড়িটি গায়ের সঙ্গে বেশ সংলগ্ন।'[১] তবে ইছামতীর মতো মানুষের সঙ্গে তার এত 'মাখামাখি সখিত্ব' নয়, সে 'খুব বেশি পোষমানা নয়, কিছু বুনোরকম'।

ছোটোগল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিভূতিভূষণের একটি তুলনা-মূলক আলোচনা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রসাহিত্যে গল্প-উপন্যাসের অঞ্চল সাধারণতঃ এক নয়। বউ-ঠাকুরানীর হাট ও রাজর্ষি, যা প্রধানতঃ বঙ্কিমী ভাবনায় রচিত, তা বাদ দিলে তাঁর উপন্যাসের অঞ্চল শহর ও অধিবাসীরা নাগরিক এবং তাঁর ছোটোগল্পের অঞ্চল গ্রাম ও অধিবাসীরা গ্রামবাসী। তা হবারও যথেষ্ট কারণ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম খাস কলকাতা শহরে এবং শিক্ষা-দীক্ষাও প্রধানতঃ শহরে। তারপর অবশ্য জমিদারির দায়িত্ব নিয়ে তাঁকে উত্তরবঙ্গে যেতে হয় এবং সেখানেই পল্লীবঙ্গের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ও গল্প কবিতায় তার প্রকাশ। জন্ম থেকে শুরু করে জমিদারি দেখার পূর্ব পর্যন্ত এই দীর্ঘ ত্রিশ বছর শহর বাঙলাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের সংস্কার ও নাগরিক ভাবনা গড়ে উঠেছে। বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে তা কিন্তু হয়নি। তাঁর জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা, প্রথমজীবনের কর্মস্থল (জাঙ্গি-পাড়া, হরিনাভি, ভাগলপুর-আজমাবাদ) ও উত্তরজীবনের আশ্রয় (বারাকপুর ও ঘাটশিলা) পল্লীতে ও মফস্বল শহরে। সেজন্য তাঁর গল্প-উপন্যাসের অঞ্চল স্বাভাবিক ভাবেই গ্রাম-বাঙলা। অপরাজিত (অংশবিশেষ), দম্পতি, অনুবর্তন এই তিনটি উপন্যাস এবং 'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' 'মরফোলজি' প্রভৃতি গল্পের স্থান অবশ্য

১ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ৯৩।

কলকাতা। তবু, প্রথমতঃ তাঁর সাহিত্যের একান্ত কম আয়তন জুড়ে এই শহর ও শহরে জীবন। দ্বিতীয়তঃ অপুর মতো সার্থক এবং প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্রের জীবন-বোধের বিবর্তন ও পরিণতি নিশ্চিন্দিপুরের পল্লীতে। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে বিভূতিভূষণ নগরবিমুখ। তাঁর দিনলিপিতে কলকাতার আকর্ষণের কথা রয়েছে। কলকাতার মতো শহরে না থাকলে যে 'মন বড় হয় না, চোখ ফোটে না', এ শিক্ষা দেওয়ানপুরের হেডমাস্টারমশায় অপুকে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের অধিবাসীরা যেমন শহরের আদবকায়দায় ও স্বভাবে গঠিত, গল্পের অধিবাসীরা তেমনি মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত-পালিত। বিভূতিভূষণের গল্পে উপন্যাসে তা কিন্তু নয়। তাঁর গল্প-উপন্যাসের অঞ্চল রবীন্দ্রনাথের মতো ভিন্ন নয়, এক। অর্থাৎ তা প্রধানতঃ পল্লীই। দ্বিতীয়তঃ তাঁর গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথের বিপরীত। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে প্রকৃতি ও মানুষ একত্রে গ্রথিত, যার জন্য অপুকে 'অর্ধেক মানব তুমি অর্ধেক প্রকৃতি'[১] বলা হয়েছে। অপরাজিত, দৃষ্টি-প্রদীপ, আরণ্যক, ইছামতী প্রভৃতি প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাসগুলিতে বিভূতি-ভূষণের প্রকৃতিচেতনা যেখানে অত্যন্ত প্রবল, কোথাও বা একান্তই লক্ষ্যস্থানীয় সেখানে তাঁর ছোটোগল্পের প্রধান লক্ষ মানুষ। তাঁর উপন্যাসে যেমন প্রকৃতির ও মানুষের সম্পর্ক প্রধান, ছোটোগল্পে তেমনি মানুষই প্রধান। রবীন্দ্রনাথের ছোটো-গল্পের বিষয়বস্তু যা—পল্লীবঙ্গের নদ-নদীর, আকাশ ও প্রান্তরের পটভূমিতে সুখ-দুঃখ ও বিরহ-মিলন-পূর্ণ মানুষের জীবনযাত্রা—বিভূতিভূষণের উপন্যাসের বিষয়বস্তু তাই। আবার, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের বিষয়বস্তু যা—অর্থাৎ প্রকৃতিসম্পর্কবর্জিত নিছক মানুষ, বিভূতিভূষণের ছোটোগল্পের বিষয়বস্তু প্রায় তাই। তবে এই-মানুষ একান্তই দুই ভিন্ন প্রকৃতির—একজন নাগরিক অপরজন গ্রাম্য। অবশ্য এই বিভাগ একেবারেই সাধারণ। কারণ প্রকৃতিকে নিয়ে বিভূতিভূষণ 'কুশল পাহাড়ী' 'আচার্য কৃপালনী কলোনি' 'কনে দেখা' প্রভৃতির মতো সুন্দর গল্প লিখেছেন। গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে উভয়ের তুলনা প্রসঙ্গে এই কথাটি সাধারণভাবে বলা চলে, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস যেমন মানুষ ও ছোটোগল্প প্রকৃতি ও মানুষকে নিয়ে, বিভূতিভূষণে ঠিক তদ্বিপরীত।

প্রকৃতির মাঝখানে এক নিগূঢ় প্রাণসত্তার আবিষ্কারে বিভূতিভূষণের ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এবং উভয়ের মনোভঙ্গির মিল থাকলেও প্রকৃতির প্রতি উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কিছুটা তফাত আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি নানান ঋতুতে আপন

---

১ প্রমথনাথ বিশী, ভূমিকা ।/০, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প (পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ)।

বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য নিয়ে গ্রাম্য জনপদের পাশে সহানুভূতিশীল মূক এক আত্মীয়ের মতো বেড়ে উঠেছে—পরস্পর পরস্পরের সমঝদার ও সম্পূরক। এক দিকে পদ্মা-তীরের মুক্ত প্রসার ও পুষ্পিত কাশবন নিয়ে সমগ্র প্রকৃতি, অপর দিকে বন্ধনভীরু বালক তারাপদ এবং মুগ্ধা বালিকা শুভাকে নিয়ে সমগ্র মানবসমাজ। এদের কাউকেই স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে ভাবা যায় না। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে নিশ্চিন্দিপুরের পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে অপুর নিবিড় সম্পর্কে প্রকৃতির ও মানুষের আত্মীয়তার কথা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতো বিভূতিভূষণের প্রকৃতিও মানুষের সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য আত্মীয়তার বন্ধনে বাধা পড়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে বিভূতিভূষণের সাহিত্যে অপরাজিত-আরণ্যক বনে পাহাড়ে প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকৃতির আর-একটি রূপ প্রকাশিত হয়েছে। সে রূপ ঋতুতে ঋতুতে রঙ-বদলানো গাছপালা-বনজঙ্গল নিয়ে প্রকৃতির এক স্বয়ংসম্পূর্ণ মনুষ্যসম্পর্কনিরপেক্ষ সজীব রূপ। বিভূতি-ভূষণের এই মনুষ্যসম্পর্কনিরপেক্ষ ও খুঁটিনাটি বর্ণনায় বিশদ প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথে তেমন নেই। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতির প্রতি উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি রোমান্টিক হয়েও 'অহল্যার প্রতি' 'বসুন্ধরা' 'মাটির ডাক' প্রভৃতি কবিতায় এবং বিশেষ করে ছিন্নপত্র-এর চিঠিগুলিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রকৃতিভাবনায় যত দার্শনিক ও তত্ত্বাশ্রয়ী এবং রূপরচনায় চিন্তাশীল ও পরিমার্জিত, বিভূতিভূষণ কিন্তু তা নন। প্রকৃতির ব্যাপারে তাঁর বিস্ময়ের ঘোর কোনো দিনই কাটেনি। তাঁর মতে বিস্ময়কে যারা 'Mother of philosophy' বলেছেন, তাঁরা কম বলেছেন। বিস্ময়ই philosophy, বাকিটা তার অর্থসঙ্গতি মাত্র।[১] অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথে প্রকৃতির প্রতি বিস্ময় থেকে যেখানে দার্শনিক তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে বিভূতিভূষণে বিস্ময়ই দার্শনিক তত্ত্ব থেকে গিয়েছে। বিভূতিভূষণ প্রকৃতিকে দেখেছেন শিশুর অপরিসীম বিস্ময়দৃষ্টি দিয়ে। তাই তাঁর উপন্যাসে অপু-দুর্গা-জিতুর মতো এমন শিশুর নয়তো সত্যচরণ-ভবানীর মতো শিশু-প্রাণের ভিড়। প্রকৃতিভাবনায় বিভূতিভূষণ শেষ পর্যন্ত বিস্মিত ও মুগ্ধমতি এক চিরকিশোর। ফলে, রূপ রচনায় তিনি একান্তই অকৃত্রিম ও অমার্জিত এবং একটু অগোছাল। কী ব্যক্তিগত, কী সাহিত্যিক কোনো জীবনেই বিভূতিভূষণের স্বভাবে তেমন পারিপাট্য ছিল না। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন তিনি চেক সময় মতো না ভাঙিয়ে ফেলে রেখেছেন, সাহিত্যিক জীবনেও তিনি তাঁর লেখা পড়ে দেখতেন না বা মাজাঘষা করতেন না। ফলে তাঁর লেখায়, কোথাও কোথাও স্থূল বৈয়াকরণিক ত্রুটি থেকে গিয়েছে। কিন্তু এসব সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও বিভূতিভূষণের সাহিত্যের ভাষা তার বক্তব্যের সঙ্গে বেমালুম মিশে যায়। বিভূতি-

১ অপরাজিত (ষষ্ঠ মুদ্রণ), ৬ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৯১।

ভূষণের ভাষার আলোচনা করতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশী বলেছিলেন, তাঁর ভাষা হচ্ছে রেশমি কাপড়ের মতো, ভাবের গায়ে তা নির্বিশেষে লেগে আছে। এমন যে হতে পেরেছে তার কারণ, বিভূতিভূষণের মনে শিল্পী ও ব্যক্তিসত্তায় কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। তাঁর সামান্য রচনা থেকে সেরা গল্প-উপন্যাস পর্যন্ত বিষয় নির্বাচনে তিনি কোথাও ভুল করেননি। তাঁর স্বভাব অনুযায়ী তিনি বিষয় নির্বাচন করেছেন ; ফলে, ভাষাও একান্ত স্বাভাবিক হয়েছে।

মুখ্যতঃ যে তিনটি উপাদানে বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক মানস গড়ে উঠেছে, সে তিনটি উপাদান হল : অধ্যাত্ম বা ঈশ্বর, প্রকৃতি এবং মানুষ। আধ্যাত্মিকতার এবং প্রকৃতিবোধের ব্যাপারে তাঁর যুগের তথা তাঁর নিজস্ব রচনার ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে যথেষ্ট তা তিনি নিজের আলোচনাতেই স্বীকার করেছেন এবং সে আলোচনাও পূর্বে করা হয়েছে। বিভূতিভূষণের সাহিত্যের শেষোক্ত উপাদানের ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কম নয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বিভূতিভূষণ তাঁর দিনলিপির এক জায়গায় বলেছেন, 'আমি 'ক্ষণিকা'র বড়ো ভক্ত। 'ক্ষণিকা'র কথা একবার উঠলে আমি স্থির থাকতে পারি না।' ক্ষণিকা কাব্য এককথায় সহজ সাধারণ মানুষের দুঃখসুখের কথা। বিভূতিভূষণের সাহিত্যজগতের একাংশ এই সহজ সাধারণ মানুষকে নিয়ে। ইন্দির-ঠাকরুণ হরিহর সর্বজয়া দুর্গা অপু জিতু ভানুমতী সুশীলা—এরা সবাই সেই জগতের অধিবাসী। বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত জীবনেও এই সহজ সাধারণ মানুষগুলোর আনাগোনা ও পরিচয় অত্যন্ত বেশি ছিল। তাঁর সাহিত্যের একটা বড়ো অংশ এদের নিয়ে তাঁর আত্মস্মৃতি। তিনি নিজে যেমন এদের নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন তেমনি ভাবী সাহিত্যিকদের কাছে এদের নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করার মিনতি রেখে গিয়েছেন। বলেছেন, এদের দুঃখদারিদ্র্যময় জীবন, আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না-পুলক, 'বাঁশবনের আমবাগানের নিভৃতছায়ায় ঝরা সজনে ফুল বিছানো পথের ধারে যেসব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে—তাদের কথাই বলতে হবে, তাদের সে গোপন সুখ-দুঃখকেই রূপ দিতে হবে।'[১] সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের ব্যাপারে তাঁর যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি, তা এক দিকে যেমন তাঁর অভিজ্ঞতার, অপর দিকে তেমনি গল্পগুচ্ছ-ক্ষণিকার অনুশীলনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল। সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের প্রতি বিভূতিভূষণের যে সহজাত মমতা ছিল সেই মমতা গল্পগুচ্ছ-ক্ষণিকাতে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন বলেই গ্রন্থ দুটিকে এত ভালোবেসেছিলেন এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৯২৯ সালে পথের পাঁচালী যখন গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত

১ স্মৃতির রেখা (৪র্থ মুদ্রণ), 'সাহিত্যের কথা'।

হয় তখন সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের ('short and simple annals of the poor') ব্যাপারে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে তাঁর তুলনা করা হয়েছিল। সত্যি, মেজাজের দিক থেকে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সঙ্গে বিভূতিভূষণের মিল খুব। কিন্তু এ ব্যাপারে অতদূরে যাবার দরকার কি? কাছেই তো আছেন রবীন্দ্রনাথ।

আর একটি বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিভূতিভূষণের তুলনা চলতে পারে। সে বিষয়, উভয়ের লিপিসাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ এবং বিভূতিভূষণ উভয়েই পত্রলিপি ও স্মৃতিলিপি রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো এত বেশি না হলেও বিভূতিভূষণের কিছু সংখ্যক পত্র আমার লেখা নামক গ্রন্থে ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং তার চেয়েও বেশি অপ্রকাশিত পত্র উদ্ধার করা গিয়েছে। এই পত্রগুলো এক দিকে যেমন তাঁর জীবনী-রচনার অপরিহার্য উপাদান, অপর দিকে তেমনি এগুলো উচ্চাঙ্গের সাহিত্যও। পত্রসাহিত্যের গুণের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, 'ভারহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস'।[১] এই সহজ রসের পরিচয় তাঁর ছিন্নপত্র-এর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। 'এই নৌকো-পারাপার দেখতে বেশ লাগে। ও পারে হাট, তাই খেয়ানৌকোয় এত ভিড়। কেউ বা ঘাসের বোঝা, কেউ বা একটা চুপড়ি, কেউ বা একটা বস্তা কাঁধে করে হাটে যাচ্ছে এবং হাট থেকে ফিরে আসছে, ছোটো নদীটি এবং দুই পারের দুই ছোটো গ্রামের মধ্যে নিস্তব্ধ দুপুরবেলায় এই একটুখানি কাজকর্ম, মনুষ্যজীবনের এই একটুখানি স্রোত অতি ধীরে ধীরে চলেছে।'[২] ছিন্নপত্র-এর তুলনায় একান্ত কম হলেও বিভূতিভূষণের চিঠিতে এই সহজ রসের সন্ধান মেলে। বাসা বদলের একটি সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ করে বিভূতিভূষণ তাঁর স্ত্রী কল্যাণীকে লিখেছেন, 'যাবার আগে আমাদের ছোট্ট ঘরটিতে এসে একা দাঁড়ালাম একবার। জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ঘরে, নির্জন বাড়িটা,—আমার কেবল মনে হচ্ছিল, যে বালিকার সঙ্গে এই ছোট্ট ঘরটির অতি ঘনিষ্ঠ ও মধুর সম্পর্ক, যার কতদিনের কত কথাবার্তা, ঝগড়া, বকুনি, আদর-ভালবাসা, হাসি ও কান্না এই ঘরের হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়ে আছে—সে যেন এইমাত্র এখানে ছিল, কোথায় গিয়েচে, এখুনি এল বলে। কতকটা তার নীরব প্রতীক্ষায় একা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম জ্যোৎস্নার আলোয়, আধ-অন্ধকারে খাবারের ঘরের মেঝেতে তার পদশব্দ শুনবার প্রত্যাশা করছি যেন প্রতিমুহূর্তে—কিন্তু সে কই এল না তো? এই বাড়িতে তার আঠারো বৎসরের যৌবন ও নববিবাহিতার বহু অনভিজ্ঞ সাধ-আহ্লাদকে ফেলে

১ পথে ও পথের প্রান্তে, পৃ. ৮০।

২ ছিন্নপত্রাবলী, পত্র সংখ্যা ২৩।

গেলাম চিরকালের জন্য।'[১]

পত্র ছাড়া আর-এক ধরণের লিপিসাহিত্য—যাকে স্মৃতিলিপি বলা হয়েছে—উভয়েই রচনা করেন। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে বিভূতিভূষণের মতো এত অধিক সংখ্যক স্মৃতি বা দিন-লিপি আর কেউ রচনা করেননি। তাঁর প্রকাশিত দিনলিপির সংখ্যা ৬, তা ছাড়া রয়েছে তাঁর একাধিক অপ্রকাশিত দিন-লিপি। দিনলিপির কথায় সজনীকান্ত দাস একদা লিখেছিলেন, 'এগুলো ঠিক সাহিত্যসেবকের ডায়েরি নয়। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রে'র সঙ্গে ইহার কিছুটা মিল আছে। পাশ্চাত্ত্য দেশে এমিয়েল, আর্নল্ড বেনেট এবং আঁদ্রে জীদ্ যে ধরণের 'জার্নাল' রাখিয়া গিয়াছেন, বিভূতিভূষণের দিনলিপি কতকটা সেই ধরণের।'[২] উপলব্ধির গভীরতার ও তার মনোরম প্রকাশের কথা ভেবে তিনি সম্ভবতঃ এই তুলনা করেছিলেন। চিঠির মতোই বিভূতিভূষণের এই দিনলিপিগুলো এক দিকে যেমন তাঁর জীবনী রচনার উপাদান অপর দিকে তেমনি সরস সাহিত্য। অবশ্য বিভূতিভূষণ একটি দিনলিপির ভূমিকায় তাঁর এই ধরণের লেখা সম্বন্ধে বিনীতভাবে উল্লেখ করেছেন, 'এই সব রচনার উদ্ভব চলন্ত রেলগাড়ির কামরায়, পথের পাশের বৃক্ষতলে অথবা শিলাসনে। প্রকাশের কথা ভেবে এগুলো লেখা হয় নি। এগুলোর মূলে লিপিকৌশল অথবা 'লেখক মনের কারিকুরি' প্রকাশের কোনো ইচ্ছা ছিল না।'[৩] এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিলিপির সঙ্গে তাঁর রচনার পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিলিপি রচনা বিভূতিভূষণের মতো সদ্য নয়, সুদূর এবং আত্মবিস্মৃত নয়, সচেতন। জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা এবং আত্মপরিচয় রবীন্দ্রনাথের এই তিনটি স্মৃতিলিপি সম্বন্ধে একই কথা বলা চলে। এর মধ্যে আত্মপরিচয়কে এক প্রকার বাদ দেওয়া চলে এই কারণে যে, আত্মপরিচয় ঠিক জীবনস্মৃতি নয়, কবিজীবনের স্মৃতি বা কবিভাবনার ব্যাখ্যা। এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, 'এ স্থলে আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম। কেবল, কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব।' আত্মপরিচয় রচনার শুরুও সৃষ্টির তাগিদে নয়, 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদকের আহ্বানে। রবীন্দ্রনাথের আর বাকি দুটি গ্রন্থ যথার্থ জীবন-স্মৃতি। জীবনস্মৃতির ঘটনাকাল যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষারম্ভ থেকে কড়ি ও

১ আমার লেখা (১ম সংস্করণ), পরিশিষ্ট, পত্রসংখ্যা ২, পৃ. ৭২।

২ শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭, বিভূতিভূষণের জীবনকথা।

৩ তৃণাঙ্কুর (৪র্থ মুদ্রণ), ভূমিকা।

কোমল অর্থাৎ বাল্যকাল থেকে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত। ছেলেবেলা-র ঘটনাকাল রবীন্দ্রনাথের জন্ম থেকে বিলেত যাওয়া অর্থাৎ সতের বৎসর বয়স পর্যন্ত। জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা এই দুই গ্রন্থে বাল্য কৈশোর ও যৌবন কালের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রৌঢ় বয়সে চর্চা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা এই গ্রন্থ দুটি রচনার পেছনে ছিল যথাক্রমে 'প্রবাসী'র সহ-সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং শান্তিনিকেতনের সাহিত্যের অধ্যাপক নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামীর (গোঁসাইজি) অনুরোধ। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিলিপি সম্বন্ধে এত কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, দূরত্বের ও সচেতনতার ফলে তাঁর এই ধরণের রচনায় 'লেখকমনের কারিকুরি' প্রকাশ বা লিপিকৌশলের অবকাশ যথেষ্ট ছিল। আর এই গুণের জন্যই জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা সাহিত্য হয়ে উঠেছে। বিভূতিভূষণের দিনলিপি যে সবার জন্য নয়, নিজের জন্য লেখা এ সম্বন্ধে তিনি সচেতন। 'আমার জীবনে ব্যক্তিগত অনুভূতির অতীত ইতিহাসের দিক হইতে ইহার মূল্য আমার নিজের কাছে যথেষ্ট বেশি। বহু হারানো দিনের মনের ভাব ও বিস্মৃত অনুভূতিরাজি আবার স্পষ্ট হইয়া ওঠে। যে সব অবস্থার মধ্যে আর কখনো পড়িব না, ক্ষণকালের জন্য তাহার মধ্যে আবার ডুবিয়া এগুলি পড়িতে পড়িতে—ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকে বাণীমূর্তি দেওয়ার ইহাই একটি বড় সার্থকতা বলিয়া মনে করি।'[১] বিভূতিভূষণের এই ধরণের লেখা এক দিকে রোজনামচার মতো তথ্যবাহুল্যে, অপর দিকে লিপি-কৌশলের অভাবে সর্বত্র সাহিত্য হয়ে উঠতে পারেনি। তা ছাড়া অবশ্য দিনলিপির সাহিত্য হয়ে ওঠার একটা সাধারণ অন্তরায় আছে। সে অন্তরায় বিষয়বস্তুর অতিনৈকট্য। অথচ সাহিত্যসৃষ্টির মূলে রয়েছে এক ধরনের দূরত্ব বা দূরত্ব-বোধ। তার ফলে স্মৃতিলিপি যত সহজে সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে, দিনলিপি সেই মৌলিক কারণের অভাবে অনেক সময় সাহিত্য হয়ে ওঠে না। কিন্তু বিভূতিভূষণের দিনলিপি সম্পর্কে এ ধরণের কোনো অভিযোগ আনা চলে না; কারণ তাঁর কবি-স্বভাবের মূলে এক সহজাত দূরত্ববোধ ছিল। তাঁর স্বপ্নচারী ক্রান্তদর্শী মন বর্তমানের বিষয়বস্তুকে নিয়ে অতীতে ভবিষ্যতে উধাও হতে পারত। তাঁর সাহিত্য-চিঠিপত্র-দিনলিপিতে এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং অতিনৈকট্যের ফলে তাঁর দিনলিপি যে সব-ক্ষেত্রে সাহিত্য হতে পারেনি, সে কথা বলা চলে না। এদিক থেকে, তথ্যবাহুল্য ও লিপিদুর্বলতা তাঁর দিনলিপির সাহিত্যিক ব্যর্থতার যথার্থ কারণ। কিন্তু সে তো তাঁর ব্যর্থতার দিক। তাঁর দিনলিপির সাহিত্যিক সার্থকতা কোথায়? বিভূতিভূষণ বিশ্বাস করতেন মানুষের 'sincere দুঃখের কাহিনী চিরদিন অমর থাকবে'।

বিভূতিভূষণের সাহিত্য তো মূলতঃ এক গভীর [illegible] কথা। এবং তার দিনলিপিও তাই। লিপিকুশলতা বা বিভূতিভূষণ যাকে 'লেখকমনের কারিকুরি' বলেছেন, তার অভাব সত্ত্বেও জীবনের সার্থকতার গভীর উপলব্ধিতে এগুলি হৃদয়ের আদি উৎসমুখে দৈবী ভাষা নিয়ে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ পথের পাঁচালী সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন, এই ধরণের দিনলিপি সম্বন্ধে সে কথার জের টেনে বলা যায়—এগুলো 'দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে'। শিল্পীমনের সচেতনতায় এর রূপ ও ভাষা আবিষ্কৃত হয়নি, বিভূতিভূষণের ধ্যানতন্ময়তায় এর রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে। সামান্য দীর্ঘ হলেও বিভূতিভূষণের দিনলিপির এমন এক অনন্য অংশ উদ্ধার করা গেল।

ঃ ভয় নেই, ব্যাঙ্কে টাকা জমিও না, অসময়ে দেখবার ভয়ে ব্যাকুলও হয়ো না। আমি অনন্ত জীবন তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি। কোনো ভয় নেই, পৃথিবীর কোনো শান্ত, গ্রাম্য নদীর কূলের চিতায় তোমার হুঁসিয়ার জীবন যখন শেষ হয়ে যাবে সেদিন থেকে এই অসীম শূন্য অনন্ত রহস্য তোমার সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াবে। আপনা আপনিই হবে, কোনো ব্যাঙ্কে জমাবার কোনো প্রয়োজন নেই। জ্যোৎস্না ভালোবাস? ফুল, ফল, পাখি ভালোবাস? গান ভালোবাস? পৃথিবীর ভাগ্যহত ছেলেমেয়েদের করুণ দুঃখের কাহিনী শুনে চোখে জল আসে? মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে? আর্তের কান্না শুনে অন্যমনস্ক হয়ে যাও? তবে তুমি অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী, তোমার সুখের সীমা হবে না। সে খুসি আনন্দের মধ্যে দিয়ে নয়, দুঃখের মধ্যে দিয়ে। নক্ষত্রে নক্ষত্রে দেখে বেড়িও, কত দীন-দরিদ্র, আতুর-জীব কঠিন সংগ্রামে পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নির্জন নদীর তীরে কেউ হয়তো বসে বসে কাঁদছে—ওদের চোখের জল মুছে দেবার চেষ্টা কোরো, তাদের সঙ্গে কেঁদো, সেই তোমার স্বর্গ হবে। চোখের জলেই এ বিশ্বসৃষ্টি ধন্য হয়েছে। চোখের জল, কান্না, অত্যাচার না থাকলে বিশ্বের সৌন্দর্য থাকতো না। সব সুখ, সব পরিপূর্ণতা, সব ঐশ্বর্য, সব সন্তোষ, শান্তি কেমন মরুভূমির মতো ভয়ানক খাঁ খাঁ করতো। মাঝে মাঝে আর্তদের চোখের জলের শ্যামশান্তিভরা ওয়েসিস আছে বলেই তা করুণ মধুর হয়েছে। জ্যোৎস্না যখন ওঠে, তখন অনেক দিন আগে মরে-যাওয়া ছেলের কথা ভেবো—দেখবে, জ্যোৎস্না মধুর করুণ হয়ে আসছে। পাখির গানে করুণ গৌরীর উদাস মীড় ধ্বনিত হচ্ছে। যে বুড়িটা গ্রামের পাঁচ জনের ঝাঁটা লাথি খেয়ে কিছু দিন আগে ঘরে ছেঁড়া কাঁথার মধ্যে জল-অভাবে মৃত্যুতৃষ্ণা নিবারণ করতে না পেরে মরেছিল তার কথা ভেবো—মন উদার শোক ও শান্তিতে ভরে আসবে—জগতের পবিত্র কারুণ্যের, আশাহত ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে অনন্তের অনাহত ধ্বনি কানে বাজবে।[১]

১ স্মৃতির রেখা (৪র্থ মুদ্রণ), ৪।২।১৯২৬, পৃ. ২৬-২৭।

বিভূতিভূষণের 'উপেক্ষিতা'

বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প লেখার গল্প বড় মজার। এবং সে গল্প তিনি নিজেই শুনিয়েছেন। সাধারণতঃ সাহিত্যিকদের জীবনের শুরুতে যে ভাবের বা কল্পনার প্রেরণা থাকে বিভূতিভূষণের জীবনে বাইরের দিক থেকে তেমন কিছুই ছিল না। বরং তার বদলে ছিল মিথ্যা মান বাঁচানোর বিষম দায়িত্ব।

সাহিত্যিক হবার বাসনা বিভূতিভূষণের কোনদিনই ছিল না। অবশ্য তার মানে এ নয় যে, তিনি এর আগে একেবারেই কিছু লেখেননি। বাল্যকালে তিনি নাকি তারাশঙ্কর তর্করত্নের কাদম্বরীর ভঙ্গিতে রচনা লিখতেন। সেই ঢঙে লেখার নমুনা তিনি তাঁর এক বন্ধুকে একবার শোনান। 'ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। মুনিগণ যে রক্তচন্দন সংযুক্ত অর্ঘ্য দান করিয়াছেন তদ্দ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া যেন সূর্যদেব রক্তিম-বর্ণ ধারণ করিলেন।' ছাত্রাবস্থায়ও তিনি কলেজ ম্যাগাজিন এবং বিবাহের প্রীতি-উপহার উপলক্ষে ২।৪টি কবিতা লেখেন।

১৯২০ সালের ২১শে জুন বিভূতিভূষণ হরিনাভি স্কুলের অ্যাসিসটেন্ট টিচার নিযুক্ত হন। ডায়মণ্ড হারবার লাইনে তখনকার হরিনাভি ছিল এক অজ পাড়াগাঁ। তাঁর কাছে যেমন নতুন, তেমনি সেখানকার মানুষও তাঁর অপরিচিত। বর্ষাকাল। বৈঠকখানা ঘরের সামনে ঢাকা বারান্দায় তিনি একলা বসে আছেন, ভাবছেন হাতে ২।১ খানা বই থাকলে এই নিঃসঙ্গতা হয়ত খানিকটা দূর হত। এমন সময় দেখেন ১৬।১৭ বছরের একটি ছেলে একখানা বই হাতে যাচ্ছে। বিভূতিভূষণ ছেলেটিকে ডেকে তার সঙ্গে আলাপ করলেন। বইখানিও দেখলেন। একটি উপন্যাস। কথায় কথায় জানতে পারলেন এখানে একটি স্থানীয় লাইব্রেরি আছে, নাম বিপন লাইব্রেরি। তাতে ভর্তি হবার চাঁদা দু আনা। শুনে বিভূতিভূষণ ভর্তি হতে উৎসাহিত হলেন এবং ছেলেটি ফেরবার পথে তাঁর জন্য একখানি বইও নিয়ে এল। এতক্ষণ ছেলেটির নাম জিজ্ঞাসা করেননি। এবার নাম জিজ্ঞাসা করতে সে জানালে, পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী (আসল নাম যতীন্দ্রমোহন রায়)। সবাই অবশ্য তাকে 'বালক-কবি' বলেই জানে। বিভূতিভূষণ বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলেন, 'বালক-কবি কেন? কবিতা-টবিতা লেখ নাকি?' পাঁচুগোপাল বললে, 'লিখি বইকি।' পরদিন সকালে বালক-কবি একখানা ছাপানো গ্রাম্য মাসিক পত্রিকা হাতে হাজির। নাম 'বিশ্ব'। পত্রিকার প্রথম পাতাতেই তার কবিতা। নাম 'মানুষ'। বিভূতিভূষণের ঈর্ষা শ্রদ্ধা দুই-ই হল। ভাবলেন, এতটুকু

ছেলে, এর নামও ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে! আবার ভাবলেন, বেশ ছেলে তো! মিল দিয়ে দিয়ে কেমন কবিতা লিখেছে। তার ওপর সে সমালোচকও। সেকালের জনপ্রিয় উপন্যাসগুলোর ওপর তার কোন আস্থা নেই। তার মতে ওসব ট্র্যাশ। এর পর পাঁচুগোপাল মাঝে মাঝে বিভূতিভূষণকে নিয়ে গ্রামের বাইরে মাঠে বেড়াতে যেত, মুখে মুখে কবিতা তৈরি করে শোনাত। বাসনা, অনেকগুলি কবিতা হলে সে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করবে।

১৩২৭ সালের বৈশাখ মাসে শিশির পাবলিশিং হাউস থেকে ছ আনা সিরিজের বই বের হতে শুরু করে। প্রথম বই রবীন্দ্রনাথের 'পয়লা নম্বর'।

ছ আনা সিরিজের বই দেখে পাঁচুগোপালের বুদ্ধি খুলে গেল। বিভূতিভূষণের কাছে সে এক পরিকল্পনা নিয়ে উপস্থিত হল। বললে, 'আসুন আপনাতে আমাতে এইরকম একটা উপন্যাস সিরিজ বের করি। খুব বিক্রি হবে, আর নামও হবে। বিভূতিভূষণ তো প্রস্তাব শুনে হতভম্ব। বললেন, 'এ কখনও সম্ভব? এ ব্যবসার আমরা কিই বা জানি? তাছাড়া বই লিখবেই বা কে?' পাঁচুগোপাল তো বিভূতিভূষণের ক্ষমতা সম্বন্ধে একেবারে অসন্দিগ্ধ। প্রশ্নের জবাবে বললে, 'কেন? বই লিখবেন আপনি, আমিও দু-একখানা লিখব।' বিভূতিভূষণ এবার একটু তিরস্কারের স্বরেই বললেন, 'লেখা কি ছেলেখেলা হে যে কলম নিয়ে বসলেই হল? ওসব খামখেয়ালি ছাড়। আমি কখনও লিখিনি, লিখতে পারবও না। তুমি হয়ত পারবে —আমার দ্বারা ওসব হবে না।' এরপর পাঁচুগোপাল এমন এক মোক্ষম যুক্তি দিলে যা একেবারে অকাট্য। বললে, 'আপনি যখন বি-এ পাস, তখন আপনার কাছে কিছু কঠিন হবে না।' বিভূতিভূষণ আর তর্ক করলেন না। কিন্তু করলে হয়ত ভাল করতেন।

এরপর পাঁচুগোপাল এমন এক কাণ্ড করে বসলে যাতে বিভূতিভূষণের একেবারে চক্ষুঃস্থির। দিন কয়েক বাদে তিনি স্কুলে গিয়েছেন, দেখেন, স্কুলের নোটিস বোর্ডে, বাইরে নারকেল গাছের গুঁড়িতে, রাস্তার দেওয়ালে চারিদিকে বিজ্ঞাপন। লেখা— 'বাহির হইল! বাহির হইল!! বাহির হইল!!! এক টাকা মূল্যের গ্রন্থমালার প্রথম উপন্যাস। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চঞ্চলা উপন্যাস—দাম এক টাকা।'

স্কুলে ঢুকতেই হেডমাস্টার মশাই বিভূতিভূষণকে ডেকে পাঠালেন, বললেন, লাইব্রেরিতে একখানা বই দেবেন। সহকর্মী শিক্ষকরা বললেন, 'আপনি লেখক তা তো এতদিন জানতাম না মশাই। তা বই কি বেরিয়েছে? আমাদের এক বার দেখাবেন।'

কী আর করবেন? স্কুলে যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণ সবাইকে একপ্রকার এড়িয়ে চলেন, ছুটি হলে বাইরে বেরিয়ে কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। কিন্তু এড়িয়ে এড়িয়ে আর কতদিন চলবে? দেখা হলেই সেই এক প্রশ্ন, 'বই বেরচ্ছে কবে?'

জর্জরিত হয়ে বিভূতিভূষণ শেষে এক মতলব ফাঁদলেন। স্থির করলেন, একটা খাতায় যা হয় কিছু লেখা যাক। পাঁচুগোপালের যা অবস্থা তাতে সে কোন দিনই এক টাকা সিরিজের বই বার করতে পারবে না। লোকে যদি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে তাহলে খাতা দেখিয়ে বলবেন, 'আমার তো লেখাই রয়েছে, ছাপা না হলে আমি কি করব? কিন্তু কী নিয়ে লিখবেন? জীবনে কোনদিনই গল্প লেখেননি। কীভাবে প্লট সংগ্রহ হবে, কেমন করে তাকে লেখা হবে, এসব কোথা থেকে তিনি পাবেন? সবচেয়ে বড় কথা, প্লট কোথায়? এমনি করেই প্রতিদিনই তিনি ভাবেন।

হরিনাভি স্কুলে কাজ করার সময় বিভূতিভূষণ আছেন রাজপুরে নগেন বাগচীর বাড়িতে। পল্লীগ্রামের ছায়াময় নিভৃত পথে শরতের অমল আলোর ও অজস্র পাখপাখালির ডাকের মধ্য দিয়ে তিনি প্রতিদিন স্কুলে যান। প্রায়ই দেখেন, পথের পাশের পুকুর থেকে এক গ্রাম্যবধূ স্নান শেষ করে কলসী কাঁখে বাড়ি ফেরে। ভাবলেন, প্রায় প্রতিদিনের দেখা অথচ সম্পূর্ণ অপরিচিত এই বধূটিকে নিয়ে গল্প লিখলে কেমন হয়?

লেখা শেষ হল। নাম দিলেন 'পূজনীয়া'। পাঁচুগোপাল ও গ্রামের ২।৪ জনকে পড়েও শোনালেন। কলেজ জীবনের সাথী নীরদচন্দ্র চৌধুরীর সমঝদারিত্বের ওপর তাঁর বরাবরই আস্থা ছিল। তাঁকেও শোনালেন। অভিমত শুনে আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু ছাপানোর ব্যাপারে কী করবেন কিছুই ভেবে উঠতে পারলেন না। কলকাতায় সাহিত্যিক বা সম্পাদক কাউকেই তিনি চেনেন না। পুজোর ছুটি এল। ছুটিটা দেশে কাটিয়ে আবার কর্মস্থলে ফিরে এলেন। কিন্তু এতদিনেও ছাপানোর ব্যাপারে তিনি মনঃস্থির করে উঠতে পারেননি। শেষে একদিন ভাবলেন, যা আছে কপালে, কলকাতায় একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। বিভূতিভূষণ সোজা চলে এলেন 'প্রবাসী' পত্রিকার অফিসে। সম্পাদকীয় বিভাগে তখন ছিলেন প্যারীমোহন সেনগুপ্ত। ঘরে ঢুকে বললেন, 'একটা লেখা এনেছিলাম—'। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর কোথাও আপনার লেখা বেরিয়েছিল?' পরে বললেন, 'আচ্ছা রেখে যান, মনোনীত না হলে ফেরত যাবে।'

বিভূতিভূষণ হরিনাভি ফিরে ডাকঘরে গোপনে জানিয়ে এলেন। তাঁর নামে যদি কোন বুকপোস্ট আসে তাহলে সেটা যেন স্কুলে না বিলি করা হয়। দুরু দুরু বক্ষে তিনি দিন গোনেন। একদিন সত্যিই ডাকপিওন এসে জানালে তাঁর নামে একটা বুকপোস্ট এসেছে। শুনে বিভূতিভূষণের মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। লেখা তাহলে ফেরত এসেছে। বুকপোস্ট খুলে দেখেন, সত্যিই তাই। তবে তার সঙ্গে পত্রিকার সহকারী সম্পাদক সুধীর চৌধুরীর একখানি চিঠি। তাতে লেখা, লেখা ছাপা হবে। সামান্য পরিবর্তনের জন্যে লেখাটি ফেরত পাঠান হল। সেটুকু করে তিনি যেন লেখাটি পাঠান। ডাকঘর থেকে বিভূতিভূষণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে ফিরলেন। গ্রামে যার সঙ্গে দেখা হয় সবাইকেই চিঠিখানা একবার করে দেখান এবং বিপন্নমুখে বলেন, 'তাই তো, ওরা আবার একখানা চিঠি দিয়েছে, একটা লেখা চায়—সময়ই বা তেমন কই!'

১৩২৮ সালে মাঘ মাসে প্রবাসীতে বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' নামে প্রকাশিত হল। লেখাটি পড়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁকে অভিনন্দন জানালেন।

'উপেক্ষিতা' যখন বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প সংকলন মেঘমল্লার-এ অন্তর্ভুক্ত হল তখন 'আমার সাহিত্যিক-জীবনের সর্বপ্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' সুতরাং গল্পটির ওপর আমার মায়া থাকা স্বাভাবিক' এই ভূমিকা করে পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পটির শেষাংশ তিনি বাদ দিলেন। সে পরিত্যক্ত অংশ এই—'এ কাকে দেখলুম বলবো? আমাদের এই পৃথিবীর জীবনের বহু ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত রাজ্যে অনন্তের পথের যাত্রীরা আবার বাসা বাঁধবে, হয়তো যে দেশের আকাশটা রঙে রঙে রঙীন, যার বাতাসে কত সুর, কত গন্ধ, কত সৌন্দর্য, কত মহিমা, ক্ষীণ জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া কত সুন্দরী তরুণীরা যে দেশের পুষ্পসম্ভার সমৃদ্ধ বনে উপবনে ফুলের গায় বসন্তের হাওয়ার মত তাঁদের ক্ষীণ দেহের পরশ দিয়ে বেড়াচ্ছেন, সেই অপার্থিব দিব্য সৌন্দর্যের দেশে গিয়ে আমাদের পৃথিবীর মা বোনেরা যে দেহধারণ করে বেড়াবেন —এ যেন তাঁদের সেই সুদূর ভবিষ্যৎ রূপেরই একটা আভাস আমার বউদিদিকে দেখতে পেলুম।'

বিভূতিভূষণ ঠিক কী ভেবে এই অংশ বাদ দিয়েছিলেন তা বলেননি, তবে 'উপেক্ষিতা'র মত মানবপ্রীতিপ্রধান গল্প থেকে অধ্যাত্মবিশ্বাসের এই অংশ বাদ দিয়ে তিনি সুবিবেচনারই পরিচয় দিয়েছেন। তবু প্রথম 'উপেক্ষিতা' তাঁর সাহিত্য-রাজ্যে অনুপেক্ষিত। তার কারণ, গল্পটি তাঁর সাহিত্য-রাজ্যে প্রবেশের সিংহদ্বার, তাঁর সাহিত্যভাবনার প্রবেশিকা। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে মানুষ, প্রকৃতি ও অধ্যাত্মকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। তারই প্রকাশ প্রথম 'উপেক্ষিতা'য়।

গল্পের নায়ক বিমল হুগলি জেলার এক পাড়াগাঁয়ের স্কুলে মাস্টারির চাকরি নিয়ে আসে। সেখানে বর্ষার এক মেঘাচ্ছন্ন দিনে বাসস্থান থেকে স্কুলে যাবার 'পথে যেতে যেতেই তাঁর সঙ্গে পরিচয়।' বিভূতিভূষণ বিনীতভাবে প্রথম গল্প লেখার স্মৃতি-চারণে স্বীকার করেছেন, 'জীবনে কখনও গল্প লিখিনি, কি করে লিখতে হয় তাও জানা নেই।' অথচ 'উপেক্ষিতা'র উপরি-উদ্ধৃত আরম্ভে নিপুণ গল্প-বলিয়ের মত 'তাঁর' শব্দের ব্যবহার দেখে প্রকরণকুশলী লেখকের বা সমালোচকের বুঝতে অসুবিধে হয় না—গল্প না লিখলেও গল্প বলার আর্ট বিভূতিভূষণের অজানা ছিল না। সত্যিই তো, তাঁর বাল্যকালের গল্প যাঁরা জানেন, তাঁরা জানেন ছেলেবয়স থেকে কী সুন্দর গুছিয়ে তিনি গল্প বলতে পারতেন। যতক্ষণ না বলে দিতেন ততক্ষণ সঙ্গীসাথীরা ধরতেই পারত না, তাঁর গল্প বানানো। বাল্যবন্ধু ভরত (নামান্তরে ভারত) তো গল্প শুনে তাঁকে বলত, 'তুই বড় হয়ে একজন লেখক হবি।' এ বাদে ইছামতীর নির্জন তীর, ঝোপঝাড় প্রভৃতিকে উদ্দেশ করে দিনের পর দিন তাঁর গল্প বলার গল্প তো অনেকেরই জানা।

যাই হোক, পুকুরের পথ দিয়ে যেতে যেতে গল্পের নায়কের তাঁকে দেখা। তাঁর সুশ্রী তারুণ্য, বালা-পরা হাত ছুটির সুঠাম সৌন্দর্য, সর্বোপরি 'দেহের মহিমান্বিত সীমারেখা' সংস্কৃত-ইংরেজী কাব্যপড়া তরুণ নায়ককে মুগ্ধ করল। বিকেলবেলা বাস-স্থানের অদূরবর্তী রেললাইনের ধারে বসে তার চোখে পড়ল তালবনের মাথার ওপর সূর্য অস্ত যাচ্ছে। 'বেগনী রঙের মেঘগুলো দেখতে দেখতে ক্রমে ধূসর, পরে আবার কালো হয়ে উঠতে লাগল। আকাশের অনেকটা জুড়ে মেঘগুলো দেখতে হয়েছিল যেন একটা আদিম যুগের জগতের উপরিভাগের বিস্তীর্ণ মহাসাগর।...বেশ কল্পনা করে নেওয়া যাচ্ছিল এই সমুদ্রের চারিপাশে একটা গূঢ় রহস্যভরা অজ্ঞাত মহাদেশ, যার অন্ধকারময় বিশাল অরণ্যানীর মধ্যে প্রাচীন যুগের লুপ্ত অতিকায় প্রাণীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।' বিভূতিভূষণের সাহিত্যে যে অধ্যাত্ম উপাদানের কথা বলা হয়েছে সেই অধ্যাত্ম উপাদানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সীমাহীন দেশকালের ভাবনা। 'উপেক্ষিতা'র এই অংশে অতীতকালের ভাবনা, যা পরবর্তীকালে মহাকাল-প্রীতিতে পরিণত হয়েছে, প্রথম ধরা পড়ল।

এমনি করে প্রতিদিনের যাওয়া-আসার পথে শরতের রৌদ্রালোকিত শেওড়া-ভাঁটকুঁচলতার কটুতিক্ত গন্ধসুবাসিত এক প্রসন্ন দিনে 'তাঁর' সঙ্গে গল্পের নায়কের পরিচয় হয়। বিভূতিভূষণের সাহিত্যের পরিচিত গ্রাম্য গন্ধও 'উপেক্ষিতা'তেই প্রথম পাওয়া গেল। যাই হোক, সেদিন ভরা ঘট কক্ষে তিনি ঘাট থেকে উঠে আসছেন। গল্পের নায়ক সে মূর্তির কাছে নিজেকে নিবেদন করল। জানাল 'আমার বড় ইচ্ছা

করে আপনি আমার বোন হন। আমি আপনাকে বউদি বলব, আমি আপনার ছোটভাই। কেমন তো?' শরতের প্রায় অনবগুণ্ঠিত আকাশের নীচে সেদিন তিনি-ও প্রায় অনবগুণ্ঠিত অবস্থায় স্থির শান্ত দৃষ্টিতে প্রার্থনাকারীর দিকে তাকালেন। তারপর তার নাম, বাড়ির কথা জানতে চাইলেন। নায়কের মৃত বোনের কথায় তাঁর দৃষ্টি ব্যথাকাতর হয়ে এল, জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাই বুঝি ভাইটির আমার একজন বোন খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে?' নায়ক মাথা নীচু করে তাঁকে প্রণাম করে তার বাসস্থানে ফিরে এল। সেদিন অপরাহ্ণে তার হৃদয়ের ভার লঘু বলে বোধ হতে লাগল। 'মনে হতে লাগল জীবনটা কেবল কতকগুলো স্নিগ্ধ ছায়াশীতল পাখির গানে ভরা অপরাহ্ণের সমষ্টি, আর পৃথিবীটা শুধু নীল আকাশের তলায় ইতস্তত বর্ধিত অযত্নসম্ভূত তালনারিকেল গাছের বন দিয়ে তৈরী—যাদের ঈষৎ কম্পমান দীর্ঘ শ্যামল পত্রশীর্ষ অপরাহ্ণে আসন্ন রৌদ্রে চিকচিক করছে।' বিভূতিভূষণের সাহিত্যে যে অপরাহ্ণ প্রকৃতির ও মেজাজের পরিচয় মেলে 'উপেক্ষিতা'তে তারও প্রথম প্রকাশ।

তারপর দিনের পর দিন যাওয়া-আসার পথে দুই ভাইবোনের প্রায় নিত্য দেখা-সাক্ষাৎ। অগ্রজা কোনোদিন ভাইয়ের জন্যে চাপড়াষষ্ঠীর উপলক্ষে কলাব বড়া, ভাই-ফোঁটা উপলক্ষে কাপড় কেনার টাকা আনেন, কোনদিন ছুঁচসুতো দিয়ে ভাইয়ের জামায় বোতাম লাগিয়ে দেন। ভাইটিকে তিনি কাছে রাখতে চান। তার কারণ তাঁরও বিমল নামে একটি ছোট ভাই ছিল। পাঁচ বছর হল সে মারা গিয়েছে। গল্পের এই সব অংশ যে বাস্তবতাকে সব সময় রক্ষা করেছে তা বলা যায় না। এক-দিকে মিল যেমন একটু বেশি রকমের কাকতালীয়, অপরদিকে বাঙলা দেশের গ্রাম্য মনোভাবের কথা স্মরণে রেখে এক অপরিচিত লোকের জামায় বোতাম লাগিয়ে দেওয়া অথবা তাকে খাওয়ানো, টাকা দেওয়া এগুলি অস্বাভাবিক লাগে।

যাই হোক, অগ্রজার এত স্নেহমমতার মাঝখানেও গল্পের নায়কের কাছে এক-দিন বৃহত্তর জীবনের ডাক এল। সে ডাকে সেদিন তার ঘুম এল না। তার চোখে ভাসতে লাগল, 'ঊর্মি-সংগীত-মুখরিত শ্যাম সমুদ্রতট···কত অকূল সাগরের নীল জলরাশি দূরে সবুজবিন্দুর মত ছোট ছোট দ্বীপ, ঐ কর্সিকা, ঐ সিসিলি! নতুন আকাশে, নতুন অনুভূতি ডোভারের সাদা-খড়ির পাহাড়—প্রশস্ত রাজপথে জনতার দ্রুত পাদচারণ, লাড্‌গেট সার্কাস, টটেনহাম কোর্ট রোড—বার্চ উইলো পপলার মেপল গাছের সে কত পত্রসম্ভার, কল্পলোকের সঙ্গিনী কনক-বেশিনী কত ক্লারা, কত মেরী কত ইউজিনী। বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাসের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্রেরা যে দূরের ডাক শুনতে পেয়েছে, সে ডাক 'উপেক্ষিতা'তেই প্রথম ধ্বনিত।

এরপর দূরের ডাকে গল্পের নায়কের নীরব বিদায়। আসার আগে বিমল অবশ্য শেষবারের মত তাঁর দেখা পাবার প্রত্যাশায় গিয়েছিল। কিন্তু দেখা মেলেনি। এই অদেখায় বিভূতিভূষণ যে কী আশ্চর্য সংযমের পরিচয় দিয়েছেন! এবং আরও বিশেষ করে প্রথম লেখার পরিপ্রেক্ষিতে। প্রথম লেখায় কারুণ্যের ঘটা বেশি থাকে, তাও আবার সত্যিই এরকম একটা বেদনাদায়ক জায়গায়। তবু 'উপেক্ষিতা'র লেখক এদের দেখা করাননি বা গল্পের নায়কের মুখে বিদায়ের কোন দীর্ঘোচ্ছ্বাস প্রকাশ করেননি। চলে আসার সময় গল্পের নায়ক বলেছে, 'সেখানকার মাটি একটু কাগজে মুড়ে পকেটে নিলুম, যেখানে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবার দিন তিনি দাঁড়িয়েছিলেন।'

'উপেক্ষিতা'র যথার্থ শেষ। শেষেও আবার সেই 'তাঁর'। আরম্ভেও ছিল। এঁরই জন্যে এত বিস্তার।

শুরু থেকে সমে এসে 'তাঁর' কথায় লেখকের পূর্ণ একটি আত্মনিবেদন।

দুই বিভূতিভূষণ[১]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর মুখোপাধ্যায় নন। বিশ শতকের প্রথমার্ধে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরই নামে গৃহহারা বলে একখানি উপন্যাস পাওয়া যাচ্ছে। বইটি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় থেকে প্রকাশিত আট আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার ৫৩তম বই। প্রকাশকাল, আষাঢ় ১৩২৭। অর্থাৎ ইংরেজির ১৯২০-র জুন-জুলাই। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৵০ + ১৪৪। মুদ্রক অবিনাশচন্দ্র মণ্ডল। 'সিদ্ধেশ্বর প্রেস', ১১ নং যদুনাথ সেনের লেন, কলকাতা।

গৃহহারার মুখবন্ধে বিভূতিভূষণ বলেছেন, ক্রমবিকাশের ফলে মানুষের চরিত্র জটিল হচ্ছে। তার মনের সূক্ষ্মতা বাড়ছে। বাইরের কাজ দিয়ে তাকে অনেক সময় ধরা যায় না। কিন্তু আধুনিক নাটক উপন্যাস মানুষের এই ভেতরটাকে পাঠকের কাছে উদ্ঘাটিত করছে। এই আধুনিকতার আরও এক বিশেষত্ব—পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষকে কত অভিভূত, পরিবর্তিত করছে তারই অভিব্যক্তিতে। এ রচনা আধুনিক মানুষের এত প্রিয় হয়েছে তার আপন জটিলতার, রহস্যের প্রতিচ্ছবিতে। স্টিভেনসন তাঁর গল্পে যেমন একই মানুষের মধ্যে তার পরস্পর বিরোধী সত্তার জটিলতাকে দেখিয়েছেন, তেমনি টমাস হার্ডি দেখিয়েছেন, অতি সামান্য ঘটনা মানুষের নিগূঢ় ব্যক্তিত্বে কী নিবিড় বৈষম্য আনছে। আবার রোমা রোঁলার, এইচ জি ওয়েলসের মত সাহিত্যের আচার্যরা এই সত্তার জটিলতা এবং পারিপার্শ্বিকের প্রভাব এই দুইয়ের সঙ্গে মানব জাতির বৃহত্তর সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশাকে গ্রথিত করে আর এক বিশিষ্টতাকে রচনা করেছেন।

বলেছেন, বাঙলা সাহিত্যেও আধুনিকতার এই আবহাওয়া দেখা দিতে শুরু করেছে। এবং আরও করবে। বর্তমান গ্রন্থ এই আবহাওয়াকে কতখানি রাখতে পেরেছে পাঠকরা তার বিচার করবেন।

বিভূতিভূষণের কথায়, 'ক্রমবিকাশের ফলে মানুষের চরিত্র যেমন জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে, সেইরূপ আবার চরিত্রের উপকরণ মনোবৃত্তিগুলিও ক্রমে সূক্ষ্মতর হইতে চলিয়াছে। ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য এখন আর বাহিরের সহজ কার্যে ধরা দেয় না, কার্যপ্রণালী হইতে স্বভাবের স্বরূপ নির্ণয় অসাধ্য সাধন হইয়াছে।

উদ্দেশ্যের জটিলতার ব্যূহ ভেদ করিয়া অন্তরের মানুষকে আবিষ্কার ও পাঠকের সহানুভূতিকে সংস্কারের সংকীর্ণগণ্ডী হইতে এইরূপে অনভ্যস্ত-ক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া

১ বিষয়টি আমার নজরে প্রথম আনেন অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন।

আধুনিক নাটক উপন্যাস সাহিত্যের প্রধান বিশেষত্ব। আর একটি বিশেষত্ব, পারিপার্শ্বিক অবস্থা চরিত্রের উপকরণ মনোবৃত্তি সমূদয়কে কতটা অভিভূত করিতে পারে এবং নির্লিপ্ত ব্যক্তিত্ব ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে কতটা পরিবর্তিত হইতে পারে—তাহারই অভিব্যক্তিতে। নাটক ও উপন্যাস যে বর্তমান সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার হইয়াছে, তাহার কারণ এই দুই বিশিষ্ট ধারা অবলম্বনে তাহারা বর্তমান যুগের জটিল ও প্রসারিত জীবন এবং মনোবৃত্তির রহস্যময় পরিবর্তন পর্যায়কে নিত্য নবভাবে প্রকাশ ও তৃপ্ত করিতে সমর্থ।

একদিকে যেমন স্টিভেন্সন তাঁহার ডাঃ 'জেকীল ও হাইড' নামক গল্পে একই দেহের মধ্যে দুই বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া এই জটিলতা ও রহস্যের প্রতিপাদনে উদ্যোগী, সেইরূপ অন্যদিকে থমাস হার্ডি সামান্য সামান্য ঘটনা, মানব-চরিত্রের ও এমন কি নিগূঢ় ব্যক্তিত্বে পর্যন্ত, কত বৈষম্য আনিয়া দেয় তাহাই প্রমাণ করিতে ব্যস্ত। বর্তমান সাহিত্যগুরুগণ, রোমান রোঁলা, এইচ জি ওয়েলস্ প্রভৃতি, এই দুই সূত্রের সহিত মানব-জাতির বৃহত্তর 'দুঃখ-সুখ আশা ও নিরাশা' যোজন করিয়া গল্প সাহিত্যে নিজেদের প্রতিভার মর্যাদা রক্ষা করিতেছেন।

বঙ্গদেশেরও জীবন এবং কয়েক বৎসর হইল যেন সাহিত্যেও এই আবহাওয়া আসিয়াছে। এই নূতন উপাদানে এখনও বাংলার উপন্যাস গঠিত হইতে চলিবে। বর্তমান গ্রন্থে তাহার কতটা সদ্ব্যবহার হইয়াছে, পাঠক তাহার বিচার করিবেন'।

গৃহহারার গল্প হচ্ছে, কলকাতার অদূরে এক গ্রাম থেকে প্রতিদিন ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে নরেশ কলকাতার একটা কলেজে অধ্যাপনা করত। তার চেহারার মধ্যে এমন একটা সংযমের ভাব ছিল যে বন্ধুরা তাকে ঠাট্টা করে বলত 'কাঠখোট্টা'। কিন্তু এই নরেশ যখন ক্লাসে কবিতা পড়ত তখন ছেলেরা বুঝত মাস্টারমশাই নতুন বিয়ে করেছেন।

নরেশের স্ত্রী মাধুরীর সমস্ত দুপুরটা একলা একলা কাটত। বাড়ি ফিরেও সে নরেশের একান্ত সাহচর্য পেত না। কারণ নরেশ সব সময় বই নিয়ে থাকত। সময় সময় উপভোগ্য কোন কবিতা অনুবাদ করে স্ত্রীকে ডেকে শোনাত। জিজ্ঞেস করত, কেমন লেগেছে? মাধুরী সামান্য একটা কথায় 'বেশ' বলে থেমে যেত।

নরেশ মাধুরীর অপছন্দ বুঝতে পেরে প্রেমের কবিতা বেছে বেছে তাকে শোনাবে বলে একদিন ডাকল। রোমিও-জুলিয়েটের সেই অংশ যেখানে জুলিয়েটের সংজ্ঞাহীন দেহের পাশে বসে রোমিও কথা বলছে সেই জায়গা শোনাবে বলে প্রস্তুত। পড়ার আগে মাধুরী প্রশ্ন করে বসল, আচ্ছা সেক্সপীয়রের বিয়ে হয়েছিল? তার স্ত্রী

কেমন ছিল ? নরেশের সাহিত্যের ইতিহাসে এর কোন সদুত্তর নেই। একটু বিরক্ত হয়েই সে বললে, সে শুনে তোমার কী হবে ? তারপর পড়তে শুরু করল। খানিক বাদে সে চোখ তুলে দেখলে, মাধুরী অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সামনের কয়েক গাছি চুল ঘামে কপালে আটকে রয়েছে। নরেশ সেগুলি সরিয়ে মাধুরীকে চুম্বন করল। তার পর মনে মনে বলে উঠল, একেবারে পাষাণ, কবিতাতেও গলে না। তবু আমি তাকেই ভালবাসি।

অনেকদিন বাইরে থাকার পর নরেশের এক মামাত-ভাই জ্যোতির্ময় গ্রামে ফিরে এল। এবং একদিন নরেশের বাড়ি এল। জ্যোতির্ময়কে দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি সুন্দর সে অভিনয় করে। জ্যোতির্ময় যখন উপস্থিত তখন নরেশ কলেজ যাবে বলে বেরচ্ছে। মাধুরী জ্যোতির্ময়কে জলখাবার দিয়ে গেল। নরেশ হাসলে। কিন্তু মাধুরীর কিরকম বিরক্তি লাগল। মনে হল, ইস, তার স্বামীর দাঁতগুলো কী বড় বড ! নরেশ খেতে বসলে মনে হল, ছিঃ আঙুলগুলো কী মোটা মোটা, নখগুলো কী বড় !

নরেশ কলেজে চলে যেতে মাধুরীর আজ নিজেকে কিরকম হালকা লাগতে লাগল। ইচ্ছে করছিল, সে যেন গান গায় বা যা হয় কিছু করে। অকারণে সে বালিশগুলোকে একবার মেঝেয় ফেললে। তারপর আবার বিছানায় তুললে। এঘর ওঘর ঘুরে দীর্ঘ দুপুরটা কোনরকমে কাটল। কিন্তু বিকেলটা বড় দুঃসহ লাগে। এমন সময় পথের দিকে তাকাতে সে দেখলে, জ্যোতির্ময় আসছে। দরজা খুলে দিতে জ্যোতির্ময় জিজ্ঞাসা করলে, নরেশদা কলেজ থেকে ফেরেনি ? তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই চেয়ার টেনে বসে পড়ল। খানিকবাদে নিজেই বললে, তাহলে বউদি, তোমাকে খুব মুশকিলে পডতে হয়, তাই না ? সারাটা দুপুর একলাটি কী কর ? জ্যোতির্ময়ের সহজ কথাবার্তা মাধুরীর খুব ভাল লাগছিল। মাধুরীর ইচ্ছে হল, আয়নায় একবার নিজেকে দেখে নেয়। এক ফাঁকে সে দেখেও নিল। সেই সঙ্গে আয়নায় সে দেখল আরও এক জোড়া চোখ তাকে দেখছে। প্রথমটা একটু বিমূঢ় হলেও মাধুরীর মনে হল তার এই নতুন ঠাকুরপোটির কথাবার্তা, চাউনি বেশ সহজ। এরপর নানা বিষয় নিয়ে দুজনে গল্প হতে লাগল। গ্রামের নীরস জীবন, কলকাতার সিনেমা-থিয়েটার। জ্যোতির্ময় জানালে, কোন কোন থিয়েটারে সে অভিনয় করেছে। নরেশ ফিরে আসতে নরেশ-জ্যোতির্ময় গল্প হতে লাগল। নরেশেরই জোরাজুরিতে যাবার সময় জ্যোতির্ময় একটা গান শুনিয়ে গেল।

এরপর নরেশের উপস্থিতি অনুপস্থিতিতে জ্যোতির্ময়ের আগমন ঘটতে লাগল। মাধুরীর মনের সেই বিরক্তিময় ভাবটাও নেই। এখন সে নরেশের কবিতার অনুবাদ

শোনে। শুনতে শুনতে কী ভাবে। নরেশও খুব খুশি। সে ভেবে ঠিক করতে পারে না, এই উন্নতির বাহাদুরি কার? সেক্সপীয়রের, শেলির, কীটসের, টেনিসনের না ব্রাউনিংয়ের? এমনি করে একমাস কেটে গেল।

একদিন গ্রামের প্রৌঢ় চক্রবর্তী মশাই নরেশকে ডেকে বললেন, নরেশ যদি দিনরাত বই নিয়েই থাকবে তাহলে ঘরে বউ আনবার কী দরকার ছিল? বউমা ছেলেমানুষ একলাটি থাকে। জ্যোতে পাজিটা রোজ রোজ অত যায় কেন? নরেশ জ্যোতির্ময়কে কোনদিনই সন্দেহ করেনি। কিন্তু চক্রবর্তীমশায়ের কথাটা আজ তার মনে লাগল। সেদিন যখন সে বাড়ি ঢুকছে তখন দেখল, জ্যোতির্ময় বেরুচ্ছে। খুব গম্ভীর ভাবেই নরেশ ঘরে ঢুকল। মাধুরী কিন্তু খুব হাসি খুশি। নরেশ আজ দান্তের ইনফারনো থেকে রিমিনির ফ্রানসেসকো যেখানে কবির কাছে তার অবৈধ প্রেমের কাহিনী বলছে সেই অংশ অনুবাদ করে শোনাল। শুনতে শুনতে মাধুরী অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

পরদিন নরেশ কলেজে যাবার নাম করে জ্যোতির্ময়-মাধুরীর ব্যাপারটা পরখ করবার জন্তে লুকিয়ে রইল। মাধুরীর মনে আজ একটা বিমর্ষের ছায়া। জ্যোতির্ময় এসে উপস্থিত হল। মাধুরীর কিরকম ভয়-ভয় লাগছে, সেই সঙ্গে একটা উত্তেজনাও। কথায় কথায় জ্যোতির্ময় বললে, বিয়ে সে করবে না কারণ কোন মেয়েকেই তার পছন্দ হয় না। মাধুরী কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করলে, তার মানে আমার বিয়ে যদি না হত তাহলে তুমি আমাকেই বিয়ে করতে? জ্যোতির্ময় বলে উঠল, আমি এখনও তোমাকে বিয়ে করতে রাজি। মুহূর্তের মধ্যে মাধুরীর মনে হল, ছি-ছি, এ-কি বিষাক্ত সাপ নিয়ে সে খেলা করছিল? অনুশোচনায় তার অন্তরটা জ্বলে যেতে লাগল। নরেশ পেছন থেকে সব কথা শুনলে।

সেদিন রাত্রে খাবার সময় সে মাধুরীকে বললে, গ্রামে বড় অসুখ-বিসুখ হচ্ছে। চল দিন কয়েকের জন্তে কলকাতা ঘুরে আসি। মাধুরী মনে মনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

নরেশ মাধুরীকে এনে তুললে কলকাতার এক বারবনিতালয়ে। 'এই একটু ঘুরে আসি' বলে সে বেরিয়ে গেল।

মাধুরীর কাছে গোলাপী বলে একটি মেয়ে উপস্থিত হল। তার মারফৎ মাধুরী জানলে, এটা বাড়ি নয়, বেশ্যালয়। শুনেই সে অজ্ঞান হয়ে গেল এবং গোলাপী ইত্যবসরে মাধুরীর নেকলেসটা সরিয়ে ফেললে।

এমনি করে দুদিন কাটল। নেকলেস চুরি করে গোলাপীর মনে শান্তি নেই। এই নিষ্পাপ মেয়েটাকে দেখে তার কিরকম কষ্ট হয়। গোলাপী নেকলেসটা ফেরৎ দিয়ে দিলে এবং বললে, কাল সমস্ত দিন সে খায়নি। গোলাপীর সঙ্গে মাধুরীর ভাব

হল। মাধুরী জানতে চাইলে, কেন তুমি এ হলে? গোলাপী বললে, কেন হয়েছিলাম তা বলতে পারি না, তবে কেন হয়ে রয়েছি তা বলতে পারি। তারপর বললে, জগতে নারীর দুই শত্রু। এক সমাজ, অপর নারী নিজে। আমি দুইকেই নষ্ট করছি।

মাধুরী নরেশকে কাতরভাবে চিঠি লিখলে, আমায় ক্ষমা কর। আমি আর পারছি না। চিঠি পেয়ে নরেশের চোখে জল এল। তবু সে ভাবলে, আরও দিন-কয়েক তার প্রায়শ্চিত্ত হওয়া প্রয়োজন। তারপর সে এসে নিয়ে যাবে।

মাধুরী নরেশের চিঠির জবাব না পেয়ে আরও ভেঙে পড়তে লাগল। শেষে সে লিখলে, দাসী বোধ হয় আর বাঁচবে না। একবার দেখা দিও। নরেশ যখন সেখানে উপস্থিত তখন সব শেষ। মাধুরীর প্রাণহীন গালের ওপর জলের ধারা রয়েছে। তার সঙ্গে নরেশের চোখের জল মিশ্রিত হল।

বন্ধু প্রফুল্লের সাহায্যে শেষকৃত্য সম্পন্ন করে সে গ্রামের বাড়িতে ফিরে এল। শূন্যচিত্ত, হতভম্ব।

নরেশ মাধুরীকে শেষ উপহার দিয়েছিল রজনীকান্তর একখানা বই। 'বাণী'। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে দেখলে তাতে মাধুরীর হাতের লেখা। 'বাণী ভাল বই। সেক্সপীয়র খুব ভাল বই। সব ভাল বই।' নরেশ অনুভব করলে এই সামান্য সামান্য লেখাগুলিতে মাধুরীর অন্তরের কতখানি অনুতাপ, অনুরাগ সঞ্চিত। নরেশ আজ অনুভব করলে, জীবনকে এতদিন সে কবিতার সংসারে দেখেছিল। সত্যি জীবন কত স্বতন্ত্র।

কলকাতা থেকে চলে আসার সময় সে বন্ধু প্রফুল্লকে বলে আসেনি। সেজন্যে প্রফুল্ল তার বাড়িতে উপস্থিত হল। বুঝলে এই শ্বাসরোধী পরিবেশ থেকে বন্ধুকে নিয়ে না গেলে কিছু হবে না। নরেশকে সে কলকাতা নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করলে। ট্রেনে যেতে যেতে নরেশের মাধুরীকে নিয়ে যাবার স্মৃতি মনে পড়তে লাগল। জীবনের অনর্থের মূল বইগুলোর ওপর আজ তার রাগ হতে লাগল।

নরেশ প্রফুল্লকে জানালে, কলেজে সে আর কাজ করবে না। কী করবে তা সে জানে না। প্রফুল্ল পারে তো বলে দিক। রাত্রে দুজনে একসঙ্গে খেতে বসল। কিন্তু কেউই কোন কথা বলতে পারছে না। শেষে দুজনে শোবার নাম করে উঠে গেল। নরেশের চোখে ঘুম নেই। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলে। তারপর উপস্থিত হল সেই বাড়িতে যেখানে মাধুরীর শেষ নিঃশ্বাস পড়ে। গোলাপী সেখানে দাঁড়িয়ে। এই মেয়েটিই মাধুরীকে শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় শিয়রে একটা সিঁদুরকৌটো দিয়েছিল। নরেশ এত রাত্রে তাকে দেখে দয়াপরবশ

হয়ে টাকা নিয়ে ঘরে যেতে বললে। গোলাপী টাকা নিতে নারাজ। শীতের রাতে নরেশ তার গায়ের শালখানা গোলাপীর দিকে ছুঁড়ে দিলে।

তারপর অন্ধকারে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। তার চোখে তখনও মাধুরীর মুখ, সেই কুঞ্চিত কেশদাম ভাসছে।

বৃষ্টি নামল। নরেশ বুঝতে পারছিল, তার স্বাভাবিক বুদ্ধি লোপ পাচ্ছে। সে আত্মসম্বরণের খুব চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সবটাই তার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। এমন সময় তার হঠাৎ নজরে পড়ল একটা কুকুরের বাচ্চা জলে ভিজছে। সেটাকে সে কোলের ভেতরে তুলে নিলে। নরেশের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। নিজেকে তার স্বাভাবিক বোধ হল। তখন ভোর হয়ে এসেছে।

মনের এমন অবস্থায় দেশভ্রমণই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এই স্থির করে নরেশ বেড়াতে বেরল। প্রফুল্ল তাকে হাওড়া স্টেশনে তুলে দিয়ে এল।

যে জীবন গোলাপী যাপন করছিল সে জীবনে গোলাপীর ঘৃণা এল। সে স্থির করল, না খেয়ে মরা এর চেয়ে ভাল। মাধুরীর প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্যে নরেশের অনুশোচনাকে সে ভুলতে পারল না। মনে মনে তাকে সে প্রণাম করলে। মৃত্যু-কালে এক বারবনিতাও তাকে এই পথ ত্যাগ করার কথা বললে। কী করবে জানতে চাইলে মুমূর্ষু মহিলাটি বললে, থিয়েটারে চাকরি নিতে।

কিন্তু থিয়েটারে তাকে কে চাকরি দেবে? সে অভিনয়, নাচ, গান কিছুই জানে না। গোলাপী তবু সাহস করে থিয়েটারের এক ম্যানেজারের কাছে উপস্থিত হল। কিন্তু ম্যানেজার এই নিগুর্ণ মেয়েকে নিতে রাজি নয়। পরে বললে, ঠিক আছে তুমি কাঞ্চনের অভিনয় দেখ। কাঞ্চন তখন নামকরা অভিনেত্রী। অভিনয় দেখতে দেখতে গোলাপী অভিনয়ের স্বাদ পেলে। অতিরিক্ত মদ খেয়ে কাঞ্চন একদিন মত্ত থাকায় সেদিন সে কাঞ্চনের জায়গায় অভিনয় করলে। দর্শকরা মহাখুশি। তাকেই তারা চায়। দুশো টাকা মাইনেতে গোলাপীর থিয়েটারে চাকরি হয়ে গেল। বাড়িতে একটি ঝি রেখে সে এখন অতি ভদ্র জীবন যাপন করে। কিন্তু তবু তার মন ভরে না। শেষে বৃদ্ধা দাসী একদিন একটি গোপাল-মূর্তি নিয়ে এল। মনে হল, গোলাপী যেন এতে খুশি হয়েছে।

মিস্টার বি. সি. রায় নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন এক স্টেটের ভূতপূর্ব ইঞ্জি-নিয়ার, তবে এখন বেকার। ভদ্রলোক বিলেত থেকে দুটি জিনিশ সংগ্রহ করে এনে-ছিলেন। একটি, ভাল চাকরি; অপরটি, পানদোষ। মিস্টার রায়ের মেয়ে কনক গোড়াতে বোর্ডিংয়ে থেকে পড়ত। কিন্তু বাবা সেখানকার খরচ না দিতে পারায় সে লজ্জায় হস্টেল ছেড়ে বাড়ি চলে আসে। এতে মিস্টার রায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং

কনককে তিরস্কারও করেন। মাতৃহারা কনক বোঝে এ সংসারে তার জায়গা নেই।

মিস্টার রায়ের বাড়িতেই জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে কনকের পরিচয় হয়। জ্যোতির্ময় এখন এম. এ. বি এল.। কিন্তু কিছুই করে না। কনকরা ব্রাহ্ম। এ নিয়ে জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে তার মতের আদান প্রদান হত, তাকে সে ব্রাহ্ম ধর্মের বই পড়তে দিত। এই প্রকাশ্য মেলামেশার মধ্যে দিয়ে কনক জ্যোতির্ময়কে ভালবাসতে শুরু করে।

মিস্টার রায় একদিন চাকরকে প্রহার করায় জ্যোতির্ময় প্রতিবাদ করে। এবং তার ফলে কনকের বাড়িতে তার আসা বন্ধ। এসব জানিয়ে সে কনককে চিঠি দেয়। কনক সব শুনে অত্যন্ত ব্যথিত। নিজের কৃতকর্মের জন্যে মিস্টার রায়ের মনেও ভাল মন্দের দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। পরাভূত হয়ে তিনি আরও নেশা করতে শুরু করেন।

এমনিভাবে যখন দিন কাটছিল তখন বিলেত থেকে এক বন্ধু একদিন সস্ত্রীক এসে উপস্থিত হল। তারপর বললে, চল থিয়েটার দেখে আসি। তিনজনে থিয়েটারে গেলেন। গোলাপী অভিনয় করছে। মিস্টার রায়ের তাকে খুব চেনা চেনা লাগল। তারপর বাড়ি ফিরে মনে পড়ল, এ তো তার স্ত্রী গোলাপী। বিলেত থেকে ফিরে তিনি একদিন রাত্রে তাকে প্রহার করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তখন কনক দেড় বছরের শিশু।

মিস্টার রায় গোলাপীকে সব কথা জানিয়ে একটি চিঠি দিলেন। ভদ্রলোক তখন মৃত্যুশয্যায়। গোলাপী এল। কনকের জন্যে তখন সে অস্থির। কিন্তু কী বলে সে মেয়ের কাছে পরিচয় দেবে? মিস্টার রায়ই গোলাপীকে এই বিমূঢ়-অবস্থা থেকে উদ্ধার করলেন। বললেন, কনক, ইনি তোমার মাসিমা।

মিস্টার রায়ের মৃত্যুর পর কনক মাসিমার কাছে চলে এল। সে ব্রাহ্ম। মাসিমার হিঁদুয়ানী তার ভাল লাগে না। কিন্তু মেয়ের জন্যে এসব বিসর্জন দিতে গোলাপীর আর কী কষ্ট? কনকের জন্যে সে কী না করতে পারে?

গোলাপীর বাড়িতে জ্যোতির্ময় যথারীতি আসতে লাগল। গোলাপীর কিন্তু জ্যোতির্ময়কে পছন্দ হয় না। অথচ কনকের মুখ তাকিয়ে কিছু বলতেও পারে না। শেষে একদিন পুরী যাবার নাম করে সে কনককে জ্যোতির্ময়ের কাছ থেকে আলাদা করতে চাইলে।

গোলাপী কনককে নিয়ে এল পুরীতে। পুরীর সমুদ্র কনকের ভাল লাগে। ভাল লাগে না শুধু মাসিমার খবরদারি। জ্যোতির্ময়কে চিঠিতে লিখলে, ওল্ড মেডদের একটা দোষই হচ্ছে, কম বয়সীদের সুখ তাঁরা সহ্য করতে পারে না।

গোলাপী বুঝতে পারলে, কনক তার ব্যবহার পছন্দ করছে না। তাই নিজে থেকেই সে কলকাতা ফেরার প্রস্তাব করলে। কলকাতায় কনকের সঙ্গে জ্যোতির্ময়ের দেখা সাক্ষাৎ হয়। গোলাপী মনকে বোঝালে, মেয়ে যাতে খুশি হয় তাতে সে কেন খুশি হবে না? জ্যোতির্ময়কে আলাদা করে ডেকে সেই নিজে একদিন বিয়ের কথা বললে। জ্যোতির্ময় 'আমার চাকরি নেই' বললে গোলাপী বলল, সে তার সমস্ত সম্পত্তি তাদের নামে লিখে দেবে। এবার আর জ্যোতির্ময়ের কী আপত্তি থাকতে পারে? কনকও একথা শুনে খুব আনন্দিত হল।

কনক জ্যোতির্ময়কে নিয়ে সমাজে গেল। সমাজে কনকের শিক্ষয়িত্রী মিস্ পাকড়াশীর সঙ্গে দেখা। তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে গাড়ি করে শুধু কনককে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে কনকের সঙ্গে নরেশের পরিচয় হল। মিস পাকড়াশীর কাছে শুনল, ভদ্রলোক বিদ্বান, কিন্তু ভীষণ ভবঘুরে। জীবনের এক গভীর ব্যথাকে ভোলবার জন্যে তিনি এমন করে ঘুরে বেড়ান।

বাড়ি ফিরে সে রাত্রে কনকের ভাল ঘুম হল না। সকাল হতে জ্যোতির্ময়ের কথা, নরেশবাবুর কথা তার মনে পড়তে লাগল।

বিকেলবেলা থিয়েটারের ম্যানেজার এল গোলাপীকে তার পাওনা টাকা বুঝিয়ে দিতে। কারণ কনকের বিয়ের জন্যে টাকার দরকার। ম্যানেজার যখন বেরচ্ছে জ্যোতির্ময় তখন ঢুকছে। ঢোকার মুখে গাড়ির কোচয়ানের কাছে সে জানতে পারলে ম্যানেজার সাহেব যার বাড়িতে এসেছে সে-ই আগেকার নামজাদা অভিনেত্রী গোলাপী। জ্যোতির্ময় জানল, গোলাপী কনকের মাসিমা। কনককে কথাটা বলতে সে তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাইল না। তারপর সম্বিৎ ফিরে আসতে জানালে, সে এইমাত্র এই ঘৃণ্য বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।

গোলাপী যখন বললে, আমি তোমার মাসিমা নই। তোমার মায়ের ঝি ছিলাম। ছেলেবেলায় আমি তোমায় মানুষ করি। তোমার মা মৃত্যুর সময় তোমাকে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর একদিন তোমার বাবা আমায় মেরে তাড়িয়ে দেন। সেই থেকে আমার অভিনেত্রী জীবন শুরু।

ঝিয়ের এই মায়ের মত মমতায় কনকের বুক ভরে গেল। সে বললে, আমি যেখানেই থাকি না কেন তুমি আমার কাছে থাকবে। কিন্তু একটা কথা। তোমার টাকা আমরা কিন্তু নিতে পারব না।

গোলাপী এইবার শেষ অভিনয় করল। বললে, তোমার বাবা যখন আমায় তাড়িয়ে দেন তখন যাবার সময় আমি রাগ করে তোমার মায়ের গয়না চুরি করে

নিয়ে গিয়েছিলাম। কনক সত্যিই দেখলে, বিদেশে গড়া সোনায় বলয়ে বাবার আর মায়ের নাম লেখা। ঝিয়ের মহত্বে সে মুগ্ধ হল।

কনক জ্যোতির্ময়ের মধ্যে তাদের ভাবী সাংসারিক জীবনের কথা হয়। জ্যোতির্ময়ের ইচ্ছে, ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা এবং বিবাহ এটা নিয়ে এত তাড়াতাড়ির কী দরকার? কারণ, সে এখনও চাকরি পায়নি। পরে ও দুটো কাজ একসঙ্গে করলেই চলবে। তার দ্বিতীয় ইচ্ছে, বিয়ের পরে তারা আর কলকাতায় নয়, বাইরে থাকবে। কিন্তু কনকের তাতে আপত্তি। কারণ এই বাড়িটার ওপর তার মায়া পড়ে গিয়েছে।

এমন সময় গোলাপী তাদের ঘরে ঢুকল। তারপর বললে, কি গো মা, ঘরকন্নার কথা হচ্ছিল বুঝি? যাই হোক, আমায় কিন্তু তোমরা ফেলতে পারবে না। কনক আদর করে তার পিঠে একটা কিল মারলে।

জ্যোতির্ময় গোলাপীর এতটা ভালবাসা পছন্দ করে না। সে কর্তৃত্বের সুরে বললে, তোমার থাকার ব্যাপারে কী হবে সেটা পরে ভেবে দেখা যাবে। গোলাপী কাজের অছিলায় সেখান থেকে উঠে গেল। কনক একেবারে স্তম্ভিত। সে জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে আর কোন কথা বলতে পারলে না।

গোলাপী কনককে ডেকে বললে, মা আমাকে আর মাসিমা বলে ডেকো না। গোলাপীই বলো।

জ্যোতির্ময় ভেতরে ভেতরে ক্ষিপ্ত। কী? সামান্য একটা ঝি, সে তাদের ভালবাসার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে? পরদিন জ্যোতির্ময় এল। গোলাপীকে সে কী বলবে ঠিক করেই এসেছিল। আলাদা করে সে তাকে ডেকে বললে, দেখ, আমাদের সংসারে তোমার থাকা চলবে না। সেদিন সে কনকেরও সঙ্গে দেখা না করে চলে গেল।

কনক ভেতরে ভেতরে খুব অস্থির বোধ করছিল। এমন অবস্থায় সে পড়েছে যার জটিলতা থেকে তার পক্ষে বেরিয়ে আসা খুবই কঠিন। সে স্থির করলে, মিস পাকড়াশীর কাছে গিয়ে পরামর্শ নেবে। সঙ্গে মাসিমাও থাকবে। কিন্তু মাসিমার খোঁজ করতে গিয়ে বাড়িতে তাকে কোথাও পাওয়া গেল না। সামান্য জিনিশপত্র যা ছিল, তাও নেই। মাসিমার সহসা অন্তর্ধানে ব্যথিত হয়ে সে জ্যোতির্ময়কে বললে, দেখেছেন, যাবার সময় একবারও জানিয়ে গেল না। জ্যোতির্ময় জানাল, গোলাপীকে সে-ই এই সংসার থেকে চলে যেতে বলেছে।

জ্যোতির্ময়ের এই ঔদ্ধত্যে কনক কিছুক্ষণের জন্যে নির্বাক হয়ে রইল। তারপর সরাসরি জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কোন অধিকারে তাকে এই বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেছেন? জ্যোতির্ময় যখন নিজেকে তার ভাবী স্বামীর অধিকারের কথা জানালে

তখন কনক বললে, আমি আপনাকে কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।

জ্যোতির্ময় চলে গেলে বাড়ির ঝিয়ের কাছে মাসিমার ঠিকানা সংগ্রহ করে কনক তাকে খুঁজতে বেরল।

কনককে দেখে গোলাপী প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারলে না। সত্যি সে স্বপ্ন দেখছে নাকি?

এবার কনকের অনুযোগের পালা। বললে, মাসিমা, তুমি যে আমার মায়ের মতন। তুমি না থাকলে আমি তো বাঁচতুম না।

গোলাপী এবার তার যথার্থ আত্মপরিচয় দিলে। কনক তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, দুঃখিনী মা আমার।

মাকে এবার সে নিজের বাড়িতে নিয়ে এল। মা বললে, কনক আমি যাঁর কাছে সবচেয়ে ঋণী তাঁকে যদি আমার মুখ দেখাতে পারতুম তাহলে আনন্দের অন্ত থাকত না। পুরনো বাক্স থেকে তাঁর দেওয়া শালখানি সে বার করে দেখালে।

নরেশ বহু দেশ ঘুরে গ্রামে ফিরেছে। তার বর্তমান ইচ্ছে, এই গ্রামেই সে জীবন কাটাবে। এদিকে লেখক হিশেবেও নরেশের নাম হয়েছে।

একদিন বাড়ি ফিরে নরেশ গোলাপীর চিঠি পেলে। বন্ধু প্রফুল্লকে নিয়ে সে কলকাতায় এল গোলাপীর সঙ্গে দেখা করতে। গোলাপীর বাড়িতে তাকে দেখে মিস্ পাকড়াশী এবং কনক দুজনেই বিস্মিত। নরেশ বুঝতে পারলে, কনক গোলাপীর মেয়ে। বললে, গোলাপীর সঙ্গে সে দেখা করতে এসেছে। কথায় কথায় নানান তর্ক-বিতর্ক আলোচনা হল। নরেশ জানালে, প্রচলিত ধর্মাধর্মে পাপপুণ্যে সে বিশ্বাস করে না। সমাজের মঙ্গল তার কাছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার। কথা শুনে কনকের খুব ভাল লাগল। মনে মনে বললে, লোকটা পেডাণ্ট হলেও ভক্তি করতে ইচ্ছে করে।

মাসখানেক কেটে গিয়েছে। কনকের মা দিনরাত কী সব লেখে। কনক একদিন জিজ্ঞাসা করলে, মা তুমি কী লেখ? গোলাপী বললে, শেষ হয়ে এসেছে। দেখবি লেখাটা?

কনক পড়ে দেখল, এ যে তাদেরই জীবনকাহিনী।

তারপর হাসতে হাসতে বললে, এরপর আর কিন্তু এক লাইনও তোমায় লিখতে দেব না।

গল্পের শেষ, গোলাপী কনককে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলে।

গৃহহারার গল্প শেষ হয়ে যাবার পর স্বভাবতঃই মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে, কে এই গ্রন্থকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়? ইনি কি পথের পাঁচালী-অপরাজিত-

আরণ্যক-এর চিরপরিচিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ? না আর কেউ ? কিন্তু কই, পরিচিত বিভূতিভূষণের গ্রন্থপঞ্জীতে, কী তাঁর কোন দিনলিপিতেও গৃহহারা নামে কোন উপন্যাসের তো সন্ধান পাওয়া যায় না।

বাইরের, কী ভেতরের কোন প্রমাণ দিয়ে কি সমস্যাটার সমাধান করা যায় না ?

আমাদের পরিচিত বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প লেখার গল্প নিয়ে একাধিক গল্প চালু আছে। একটা গল্প তো প্রায় সবারই জানা। উনি যখন ১৯২০ সনের ২১শে জুন সোনারপুর-হরিনাভিতে শিক্ষকতা করতে যান তখন পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী (আসল নাম যতীন্দ্রমোহন রায়) নামে এক বালক কবির পাল্লায় পড়ে তিনি প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' লেখেন। গল্পটি ১৩২৮ সালের মাঘ মাসে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।

এ ব্যাপারে আরও একটি গল্প প্রচলিত আছে। বিভূতিভূষণের কলেজ জীবনের অন্তরঙ্গ সতীর্থ নীরদচন্দ্র চৌধুরী গল্পটি বলেন। গোপাল হালদার ১৩৫৭ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার শনিবারের চিঠিতে পথের পাঁচালী প্রসঙ্গে গল্পটির উল্লেখও করেন। সে গল্প হচ্ছে অনেকেরই মতে বিভূতিভূষণ ছেলেবয়সে লিখতেন, পরে অনেকদিন লেখেননি। সেই সময়ে ঐ নামে আরও এক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখতেন। আমাদের পরিচিত বিভূতিভূষণ তাঁর এক অতি নিকট আত্মীয়ের কাছে বলেন, ও লেখা তাঁরই। তারপর তাঁর সঙ্গে তর্ক করে লিখলেন তাঁর প্রথম গল্প।

এ গল্প যদি সত্য হয় তাহলে পরিচিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই হয়ত গৃহহারার লেখক।

কিন্তু সে তো যদির কথা।

গৃহহারার মুখবন্ধ থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের পরিচিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বইটিতে কতখানি খুঁজে পাওয়া যায় ?

গৃহহারার মুখবন্ধে প্রতিপাদ্যের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কিন্তু আমাদের পরিচিতি বিভূতিভূষণের কোন গল্প উপন্যাসেই তো এ ধরনের প্রতিশ্রুতিমূলক প্রতিপাদ্য পাওয়া যায় না। যা আছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বইয়ের সঙ্গে মিশে রয়েছে। যেমন ইছামতী।

'ইছামতী একটা ছোট নদী। অন্ততঃ যশোর জেলার মধ্য দিয়ে এর যে অংশ প্রবাহিত, সেটুকু। দক্ষিণে ইছামতী কুমীর-কামট-হাঙর-সংকুল বিরাট লোনা গাঙে পরিণত হয়ে কোথায় কোন্ সুন্দরবনে সুঁদরি গরান গাছের জঙ্গলের আড়ালে বঙ্গোপসাগরে মিশে গিয়েছে, সে খবর যশোর জেলার গ্রাম্য অঞ্চলের কোন লোকই রাখে না।

ইছামতীর যে অংশ নদীয়া ও যশোর জেলার মধ্যে অবস্থিত, অংশটুকুর রূপ সত্যিই এত চমৎকার, যাঁরা দেখবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা জানেন। কিন্তু তাঁরাই সবচেয়ে ভালো করে উপলব্ধি করবেন, যাঁরা অনেকদিন ধরে বাস করচেন এ অঞ্চলে। ভগবানের একটি অপূর্ব শিল্প এর দুই তীর, বনবনানীতে সবুজ, পক্ষী-কাকলীতে মুখর।

মডিঘাটা কি বাজিতপুরের ঘাট থেকে নৌকো করে চলে যেও চাঁদুড়িয়ার ঘাট পর্যন্ত—দেখতে পাবে দুধারে পলতে মাদার গাছের লাল ফুল, জলজ বন্যেবুড়োর ঝোপ, টোপাপানার দাম, বুনো তিৎপল্লী লতার হল্‌দে ফুলের শোভা, কোথাও উঁচু পাড়ে প্রাচীন বট-অশ্বত্থের ছায়াভরা উলুটি বাচ্‌ড়া-বৈচি ঝোপ, বাঁশঝাড়, গাঙ-শালিখের গর্ত, সুকুমার লতাবিতান। গাঙের পাড়ে লোকের বসতি কম। শুধুই দূর্বাঘাসের সবুজ চরভূমি, শুধুই চখা বালির ঘাট, বনকুসুমে ভর্তি ঝোপ, বিহঙ্গ-কাকলী মুখর বনান্তস্থলীর গ্রামের ঘাটে কোথাও দুদশখানা ডিঙি নৌকো বাঁধা রয়েচে। ক্বচিৎ উঁচু শিমূল গাছের আঁকা বাঁকা শুকনো ডালে শকুনি বসে আছে সমাধিস্থ অবস্থায়—ঠিক যেন চীনা চিত্রকরের অঙ্কিত ছবি। কোনো ঘাটে মেয়েরা নাইচে, কাঁখে কলসী ভরে জল নিয়ে ডাঙায় উঠে, স্নানরতা সঙ্গিনীর সঙ্গে কথা-বার্তা কইচে। এক-আধ জায়গায় গাঙের উঁচু পাড়ের কিনারায় মাঠের মধ্যে কোনো গ্রামের প্রাইমারী ইস্কুল, লম্বা ধরনের চালাঘর, দরমার কিংবা কঞ্চির বেড়ার ঝাঁপ দিয়ে ঘেরা, আসবাবপত্রের মধ্যে দেখা যাবে ভাঙা নড়বড়ে একখানা চেয়ার দড়ি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা, আর খানকতক বেঞ্চি।

সবুজ চরভূমির তৃণক্ষেত্রে যখন সমুখ জ্যোৎস্না রাত্রির জ্যোৎস্না পড়বে, গ্রীষ্ম-দিনে সাদা থোকা থোকা আকন্দফুল ফুটে থাকবে, সোঁদালি ফুলের ঝাড় দুলবে নিকটবর্তী বনঝোপ থেকে নদীর মৃদু বাতাসে, তখন নদীপথ-যাত্রীরা দেখতে পাবে নদীর ধারে পুরোনো পড়ো ভিটের ঈষদুচ্চ পোতা, বর্তমানে হয়তো আকন্দ-ঝোপে ঢেকে ফেলেচে তাদের বেশি অংশটা, হয়তো দু একটা উইয়ের ঢিপি গজিয়েছে কোনো কোনো ভিটের পোতায়। এই সব ভিটে দেখে তুমি স্বপ্ন দেখবে অতীত দিনগুলির, স্বপ্ন দেখবে সেই সব মা ও ছেলের, ভাই ও বোনের, যাদের জীবন ছিল একদিন এই সব বাস্তুভিটের সঙ্গে জড়িয়ে। কত সুখ দুঃখের অলিখিত ইতিহাস বর্ষাকালে জলধারাঙ্কিত ক্ষীণ রেখার মত আঁকা হয় শতাব্দীতে শতাব্দীতে এদের বুকে। সূর্য আলো দেয়, হেমন্তের আকাশ শিশির বর্ষণ করে। জ্যোৎস্না পক্ষের চাঁদ জ্যোৎস্না ঢালে এদের বুকে।

সেই সব বাণী, সেই সব ইতিহাস আমাদের আসল জাতীয় ইতিহাস। মূক-

জনগণের ইতিহাস, রাজা-বাজড়াদের বিজয়কাহিনী নয়।'

কোথাও বা ভূমিকায় একটু আলাদা করে লেখা, এটি ভ্রাম্যমাণের রোজনামচা বা দিনলিপি নয়, উপন্যাস। যেমন আরণ্যক-এ।

'মানুষের বসতির পাশে কোথাও নিবিড় অরণ্য নাই। অরণ্য আছে দূর দেশে, যেখানে পতিত পক্ব জম্বুফলের গন্ধে গোদাবরী তীরের বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। 'আরণ্যক' সেই কল্পলোকের বিবরণ। ইহা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে— উপন্যাস। অভিধানে লেখে 'উপন্যাস' মানে বানানো গল্প। অভিধানকার পণ্ডিতদের কথা আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য। তবে 'আরণ্যক'-এর পটভূমি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। কুশী নদীর অপর পারে এরূপ দিগন্ত বিস্তীর্ণ অরণ্য প্রান্তর পূর্বে ছিল, এখনও আছে। দক্ষিণ ভাগলপুর গয়া জেলার বন পাহাড় তো বিখ্যাত।'

নয় তো চাঁদের পাহাড়-এর মত লেখায় কোথাও রচনার মৌলিকতার বা ঋণ-স্বীকারের উল্লেখ।

গৃহহারা বইয়ে নরেশের গৃহহারা হওয়াই বইয়ের মূল বিষয়বস্তু। গ্রন্থকার তাঁর প্রতিপাদ্যের প্রতিশ্রুতিমতই দেখিয়েছেন, নরেশের একান্ত সারস্বত প্রকৃতি জ্যোতির্ময়ের উপস্থিতিতে তার স্ত্রী মাধুরীকে কীভাবে গৃহসুখ থেকে উৎক্ষিপ্ত, অনুশোচনাহত করে মৃত্যু পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছে। সেই বেদনার মূল্যেই নরেশ জীবনকে চিনেছে। 'এতদিন সে জীবনকে কবিতার সংসারে দেখেছে, কিন্তু সত্যি জীবন কত স্বতন্ত্র!'

স্বতন্ত্র বলেই লেখক গ্রন্থের শেষে গৃহহারা নরেশের কনকের সঙ্গে নতুন গৃহ-প্রবেশের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

সবাই জানেন, আমাদের পরিচিত বিভূতিভূষণের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসই আত্মকাহিনীমূলক। হয় নিজের, নয় নিজের দেখা। অবশ্য সৎ সাহিত্যের সব লেখকের লেখাই একপ্রকার তাই। শ্রেয় চরিত্রে আপন শ্রেয়ত্বের ছায়া পড়ে। নইলে লেখকরা লিখতে যাবেন কেন? যদি না নিজের ভাবনা-চিন্তাকে তাতে মেলে দিতে পারেন? সাহিত্য তো ঘটনার ইতিহাস নয়। তা ঘটনার নিথর জলে শায়িত অন্তরেরই প্রতিচ্ছবি। বিভূতিভূষণ তো দিনলিপির এক জায়গায় লিখেছেন, আন্তরিকতা মানুষকে অমরত্বের কিনারায় নিয়ে যায়। যে কিনারা সাহিত্যেরও। 'জীবনে যদি বড় দুঃখ পাও, দুঃখ লিখে রেখে যেও উত্তরকালের জন্য। Sincere দুঃখের কাহিনী চিরদিন অমর থাকবে, কিন্তু তা চিরদিন লোকের মনে বল দেবে।'

তবু লেখকদের লেখায় নিজের বা নিজের দেখার কমবেশি থাকে। যেমন আছে বিভূতিভূষণে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে, প্রেমেন্দ্র মিত্রে। এমনকি বিভূতিভূষণের

নিজের লেখার মধ্যেও। পথের পাঁচালী-অপরাজিত-আরণ্যক নয় তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতির আধারে লেখা। তাই বলে নীলকরদের আমলের গল্প ইছামতী, কী বৌদ্ধ-যুগের কাহিনী 'মেঘমল্লার' অথবা মধ্য আফ্রিকার সেই রিখটারস্‌ভেল্ড পর্বতমালায় হীরের খনির সন্ধানে শঙ্করের অভিযান—এ তো আর তাঁর নিজের নয়।

লেখকরা সাধারণতঃ তাঁদের আত্মকাহিনী নিয়েই সাহিত্যে প্রবেশ করেন। কারণ প্রথম লেখার বিষয়টা মনকে অনেকখানি ভাবিয়ে রাখে। কী নিয়ে লিখব ? তারপর লিখতে লিখতে লেখা আর লেখার রীতি 'বাগার্থবিব সম্পৃক্তৌ'—শব্দময় অর্থের মত নিত্য সম্বন্ধ হয়ে ওঠে। যখন লেখার ওপর দখল আসে তখন আর বিষয়-বস্তু নিয়ে ভাবতে হয় না। যেমন করে ওস্তাদ গাইয়েকে ভাবতে হয় না রাগের তান তৈরি নিয়ে, চিত্রকরকে ভাবতে হয় না রেখা রঙ নিয়ে। তৃতীয় নেত্রে তখন ছায়া-ছায়া ভাবনা গল্পের কায়া ধরে, তান ফুলের গোছা হয়—সঙ্গীতের ভাষায় 'বল' বাঁধে, যেমন হয়েছে কেশরী বাঈয়ের গানে। রেখায়, রঙে, ছবিতে রূপ ধরে।

সন্ধ্যাসঙ্গীত-এর আগে রবীন্দ্রনাথ একাধিক কাহিনী কবিতা লিখেছেন। কিন্তু সন্ধ্যাসঙ্গীত-এর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, সেগুলি ছিল আমার কপিবুকের কবিতা। সেই কপিবুকের চৌকাট পেরিয়ে প্রথম দেখা দিল সন্ধ্যাসঙ্গীত্। 'তাকে আমের বোলের সঙ্গে তুলনা করব না, করব কচি আমের গুটির সঙ্গে, অর্থাৎ তাতে তার আপন চেহারাটা সবে দেখা দিয়েছে শ্যামল রঙে, রস ধরেনি, তাই তার দাম কম। কিন্তু সেই কবিতাই প্রথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। অতএব সন্ধ্যাসঙ্গীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়।'

সন্ধ্যাসঙ্গীত নিহিতার্থ সন্ধ্যার অর্থাৎ বিষণ্ণতার, চলে যাবারই গান।

চলে গেল, আর কিছু নাই কহিবার।
চলে গেল, আর কিছু নাই গাহিবার।
শুধু গাহিতেছে আর শুধু কাঁদিতেছে
দীনহীন হৃদয় আমার, শুধু বলিতেছে,
'চলে গেল সকলেই চলে গেল গো,
বুক শুধু ভেঙে গেল, দলে দলে গো।'
পুরানো মলিন ছিন্ন বসনের মতো
মোরে ফেলে গেল
কাতর নয়নে চেয়ে রহিলাম কত—
সাথে না লইল। ('পরিত্যক্ত')

জীবনস্মৃতিতে সন্ধ্যাসঙ্গীত-এর প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'একসময়ে

(১৮৮১) জ্যোতিদাদারা দূরদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন—তেতালার ছাদের ঘরগুলি শূন্য ছিল। এই সময় আমি সেই ছাদ ও ঘর অধিকার করিয়া নির্জন দিন-গুলি যাপন করিতাম।'

দেবেন্দ্রনাথ তখন বাইরে। বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ আপনার সারস্বত জগৎ নিয়ে মশগুল। সত্যেন্দ্রনাথ রয়েছেন তাঁর কর্মস্থল বোম্বাইয়ে। হেমেন্দ্রনাথ বাড়িতে থাকলেও তাঁর সঙ্গে তেমন যোগাযোগ নেই। বাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে স্নেহ করবার মত, প্রশ্রয় দেবার মত আর মানুষ কোথায়? ছিলেন জ্যোতিদাদা আর বউ-ঠাকুরাণী কাদম্বরী দেবী। শুধু দেওর বলে নয়। এই অদ্ভুত স্বভাব দেওরটির ওপর বউঠাকুরাণীর আশার, মমতার, ভালবাসার অন্ত নেই। এই নির্বান্ধব পুরী থেকে তাদের হঠাৎ চলে যাওয়া! যাওয়া তো নয়। এ যে একেবারে 'বুক শুধু ভেঙে গেল দলে গেল গো।' সেই চলে যাওয়ার দুঃসহ বেদনার কথা ভেঙে ফুটে উঠল বিষণ্ণতার গান—সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২)।

তারাশঙ্করের সাহিত্যে আবির্ভাবও তো একেবারে নিজের চোখে দেখা গল্প নিয়ে। কবিতার বই ত্রিপত্র-এর সলজ্জ স্মৃতি, সাপ্তাহিক শিশির-এ প্রকাশিত (এখনও পর্যন্ত গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত) প্রথম উপন্যাস দীনার দান-এর আত্ম-বিস্মৃতি, প্রথম নাটক মারহাটা তর্পণ-এর আহুতি—সব চুকিয়ে-বুকিয়ে তারাশঙ্কর কংগ্রেসের কাজে সিউড়ি গিয়েছেন। জ্যৈষ্ঠের মধ্যরাত্রে ঘুম-না-আসা চোখে পড়ছিলেন, কালি-কলম…শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়…'জোহানের বিয়ে'…। একেবারে নিজের দেশ…তারই কাহিনী অন্তরঙ্গ ভাষায় লেখা! উঠে বসলেন তিনি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'খুঁজে পেল সে মাটিকে, মলিন অথচ মহত্ত্বময় মাটি; খুঁজে পেল সে মাটির মানুষকে, উৎপীড়িত অথচ অপরাজিত মানুষ—এ যে তার অন্তরঙ্গ কাহিনী—একেবারে অন্তরের ভাষায় লেখা।'

আবার সেই দুর্মর ইচ্ছে হল। গল্প লিখব। জীবদেহে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বাসনার ধারা চলেছে। তারই সঙ্গে সঙ্গে চলেছে জীবনের ধারা। কোথাও সে হারছে, কোথাও সে জিতেছে।

কিন্তু গল্প কোথায়?

দিন কয়েক বাদে তারাশঙ্কর তাঁরই মহালের এক গ্রামে এসেছেন। এসে যে বাড়িতে উঠেছেন তার সামনে এক ছায়ানিবিড় আখড়া—বৈষ্ণবের কুঞ্জ। গ্রামের লোকে বলে কমলিনীর আখড়া, রসিকজনে বলে কমলিনীর কুঞ্জ। আখড়ায় বৈষ্ণব নেই, আছে শুধু কমলিনী বৈষ্ণবী। তারাশঙ্করের পৌঁছনর কিছুক্ষণ পরে ক্ষারে ধোয়া কাপড়খানি পরিপাটি করে পরে শ্যামবর্ণা একটি মেয়ে হাসি মুখে সামনে এসে

দাঁড়াল। হাতে ঝকঝকে করে মাজা রেকাবিতে দু-খিলি পান, পাশে দুটি লবঙ্গ, টুকরো দুয়েক দারুচিনি, একটি ছোট এলাচ। রেকাবি নামিয়ে মেয়েটি হেঁট হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে, বললে—প্রভুর জয় হোক। ওঠবার সময় তার মাথার কাপড় একটু সরে যেতে তারাশঙ্করের চোখে পড়ল, রাখাল-চুড়া-বাঁধা কেশ-প্রসাধন। ঘোমটাটি তুলে কমলিনী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁর বাড়ির কুশলবার্তা নিলে। যেন কত দিনের আত্মীয়। তারাশঙ্কর কী একটা কাজে উঠে ঘরের মধ্যে গিয়েছেন। শুনলেন তাঁর গোমস্তা বলছে—পানের চেয়ে বৈষ্ণবীর হাসিটি মিষ্টি। ভাবলেন, বৈষ্ণবী খুব লজ্জা পেয়েছে। উঁকি দিয়ে দেখলেন, কই, না তো। সবিনয়ে বৈষ্ণবী আরও একটু হেসে বললে—বৈষ্ণবের ওই তো সম্বল প্রভু। তারাশঙ্করের মনে হল, এই তো যা তিনি খুঁজছিলেন—'এই তো সেই জীবনের জয়। কথার হাওয়ায় জৈব রসের দীঘিতে ঢেউ উঠল, তাতে ওর জীবন ডুবল না, ডুব দিলে না, সে ঢেউয়ের উপরে নাচতে লাগল পদ্মফুলের মত। এর পরই এল পাগলা বৈরাগী পুলিন দাস। লোকে বলে—ক্ষ্যাপা। সঙ্গে তার বলাই মোড়ল। ক্ষ্যাপা ফাঁক পাবামাত্র গিয়ে উঠল কমলিনীর আখড়ায়। পুলিন ওখানেই প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা থাকে। সেদিন রাত্রে শুয়েই শুনলাম—কমলিনী বলছে পুলিনকে—যাও, বাড়ি যাও।—কেন?—রাগ করবে সে।—কে?—কে আবার? তোমার বষ্টুমী। বলেই সে হেসে ছড়া কেটে উঠল—পাঁচসিকের বষ্টুমী তোমার গোসা করেছে—হে গোসা করেছে। আমার ঘুম ছুটে গেল। দোয়াত কলম খাতা নিয়ে বসে গেলাম। পেয়েছি। 'রসকলি'র পত্তন করলাম।'

১৩৩৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় কল্লোল-এ 'রসকলি' ছাপা হল। সঙ্গে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের একখানি পত্র, "এতদিন আপনি চুপ করিয়া ছিলেন কেন?'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও তাই। ১৩৩৫ সাল। প্রেসিডেন্সি কলেজে অঙ্কে অনার্স নিয়ে বি. এস-সি. পড়ছেন। লেখক হবার ইচ্ছে যে একেবারে ছিল না তা নয়। তবে তাঁর ধারণা তিরিশ বছরের আগে কারও লিখতে যাওয়া উচিত নয়। তিনিও ঐ বয়সে লিখবেন। তার আগে নিজেকে সব দিক থেকে প্রস্তুত করে নেবেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স তখন কুড়ি।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন এক কাণ্ড ঘটল। কলেজে যেমন হয়, বন্ধুদের সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হতে হতে আলোচনা সম্পাদকদের ব্যাপারে এসে পৌঁছল। তাদের পক্ষপাতিত্ব, দলাদলি ইত্যাদি। নামী লেখক ছাড়া তারা আর কারও লেখা ছাপায় না। আলোচনা যারা করছিল তাদের মধ্যে একজনের আবার তিন তিনটে লেখা সম্পাদকের দপ্তর থেকে ফেরৎ এসেছে।

প্রচণ্ড দাহ। বন্ধুটি সম্পাদকদের সম্বন্ধে একটা কুৎসিত গাল দিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বরাবরই বিতর্কে অনিচ্ছা। কিন্তু বন্ধুর অবিবেচনা তিনি সহ্য করতে পারলেন না। বললেন, 'কেন বাজে কথা বকছো? ভালো লেখা কি এত সস্তা যে, হাতে পেয়েও সম্পাদকরা ফিরিয়ে দেবেন? মাসিকগুলো তো পড়ো, মাসে কটা ভালো গল্প বেরোয় দেখেছো? সম্পাদকরা কি পাগল যে ভালো গল্প ফিরিয়ে দিয়ে বাজে গল্প ছাপবে? ভালো দূরে থাক চলনসই একটা গল্প পেলে সম্পাদকরা নিশ্চয়ই সাগ্রহে সেটা ছেপে দেয়।' বন্ধু বললে, তুমি কী করে এসব জানলে? উনি বলে ফেললেন, আমি জানি। তর্কাতর্কির পর বাজি হল। উনি বললেন, 'আমি গল্প লিখে তিন মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ প্রবাসী বা বিচিত্রায় ছাপিয়ে দেব।'

কিন্তু কী নিয়ে গল্প লিখবেন?

প্রেম? বাঙলা মাসিকে তো প্রেমের গল্প হামেশাই বেরয়। মন সায় দিল না। মন বললে, হ্যাঁ, প্রেমের গল্পই লেখ। কিন্তু ঐ চটুল জলো গল্প নয়। কেন, তুমি কি সত্যি প্রেম সংসারে কখনও দেখনি? যাকে বাস্তবে দেখছ তাকেই নিয়ে যাও না কেন স্বপ্নে! 'মনে পড়লো পূর্ববঙ্গের এক স্বামী-স্ত্রীর কথা। বাস্তব জীবনে নাটকীয় প্রেমের চরম অভিজ্ঞতা ওদের দেখেই আমি পেয়েছিলাম। স্বামী বাঁশি বাজাতেন। বাঁশের বাঁশি নয়, ক্ল্যারিওনেট। প্রায় পায়ে ধরে তাঁকে আসরে বাজাতে নিয়ে যেতে হতো—গিয়েও খুশি হলে বাজাতেন, নইলে বাজাতেন না। বাড়িতে বাজাতেন—শুধু স্ত্রীকে শ্রোতা রেখে। বছরখানেক আমি শুনেছিলাম। বেশিক্ষণ বাজালে তাঁর গলা দিয়ে রক্ত পড়তো।

এদের অবলম্বন করে এক ঘোরালো ট্র্যাজিক প্লট গড়ে তুলে গল্প লিখলাম। নাম দিলাম অতসী মামী।'

১৩৩৫ সালের পৌষ সংখ্যার বিচিত্রায় 'অতসী মামী' বেরল। সেই সঙ্গে অবিশ্বাস্য এক ঘটনা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে এক ভদ্রলোক এসেছেন। 'অতসী মামী'র পারিশ্রমিক দিতে। সেই সঙ্গে দাবি, আর একটি গল্প চাই। ভদ্রলোক বিচিত্রার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

গৃহহারা বেরিয়েছে ১৩২৭ সালের আষাঢ়ে—অর্থাৎ ১৯২০ সনের জুন-জুলাইয়ে। লেখা হয়েছে নিশ্চয়ই তার অন্তত কিছু আগে।

আমাদের পরিচিত বিভূতিভূষণের তখন অবস্থাই বা কী এবং কোথায়ই বা তিনি?

কলেজে বি. এ. পড়তে পড়তে ১৩২৪ সালের ৩১শে শ্রাবণ গৌরী দেবীর সঙ্গে বিভূতিভূষণের বিয়ে হয়। আর ১৩২৫ সালের ৬ই অগ্রহায়ণ গৌরী দেবী মারা

যান। বিভূতিভূষণ তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সঙ্গে দর্শনে এম. এ. আর ল পড়ছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় বিয়ে হওয়ায় পাছে লেখাপড়া বিঘ্নিত হয় সে-জন্যে বিভূতিভূষণের শ্বশুরমশায় বি. এ. পরীক্ষার আগে পর্যন্ত মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাননি। পরীক্ষা হয়ে গেলে ১৩২৫ সালের ২০শে আষাঢ় বিভূতিভূষণ গৌরীকে নিয়ে বারাকপুর আসেন। এই প্রথম পরস্পরকে এত কাছে পাওয়া। ট্রেনে সারাদিন একসঙ্গে থাকা। গৌরী গাড়িতে গ্রামাফোন শুনে খুব খুশি। বলেছিলেন, গাড়িতে কেমন কলের গান হচ্ছিল! উত্তর জীবনে বিভূতিভূষণের মনে পড়েছে, বারাকপুরে আসার পথে সেই বেলেঘাটা ব্রিজ স্টেশনে তাঁদের প্রথম ঘর বাঁধার কথা, গৌরীর 'সেই আয়না বের করে দেওয়া, সেই চিঠি বুকে করে মাথায় কপালে ঠেকানোর কথা।'

তখন দিনের বেলায় স্বামী স্ত্রীর দেখা সাক্ষাতের বড় একটা রেওয়াজ ছিল না। তবু তার মধ্যে ঘরের ভেতরে তক্তাপোশে বসে বিভূতিভূষণ হয়ত বই পড়ছেন, সদ্যস্নাতা গৌরী ভিজে চুল পিঠে ছড়িয়ে কিছু একটা নিতে এসে লাজুক চোখে একটু হেসে চলে যেতেন। কোন কোন দিন গ্রামের রজনীকাকার সঙ্গে তাস খেলতে খেলতে বিভূতিভূষণ অধীরভাবে সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় থাকতেন। বর্ষা সন্ধ্যা। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ত বাঁশবনে। ঘরে মাটির প্রদীপের আলোয় গৌরী আর বিভূতিভূষণ। পড়তে পড়তে মনে হয় এই সব ছবির সঙ্গে অপরাজিত-এর কী নিবিড় মিল!

গৌরীকে বারাকপুরে রেখে বিভূতিভূষণ কলকাতায় আসেন। মিলনের আগ্রহে, পুনর্দর্শনের উৎকণ্ঠায় কলকাতা প্রবাসের দিন কাটে। ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমীর ছুটিতে বারাকপুর আসার অবকাশ মিলল। ১২ই ভাদ্র, ১৩২৫ সাল। জন্মাষ্টমীর মেঘান্ধকার সন্ধ্যা। বাড়িতে 'মণি' মানে বিভূতিভূষণের ছোট বোন সরস্বতী প্রদীপ দেখাচ্ছিলেন। গৌরী বিভূতিভূষণকে দেখতে পেয়ে কী আগ্রহেই না বলেছিলেন, এসো, এসো।

বিভূতিভূষণ এই পঞ্চদশীটিকে জীবনে কখনও ভুলতে পারেননি। আরণ্যক এঁকেই উৎসর্গ করা। ঘাটশিলার বাড়িও এঁরই নামে—'গৌরীকুঞ্জ'। বাইশ বছর বাদে দ্বিতীয়বার বিবাহের পর স্ত্রীকে ঘনিষ্ঠ সম্বোধনে ডাকতে গিয়ে মনে পড়েছে এই মেয়েটির কথা। লিখেছেন, 'প্রিয়তমাসু, এই সম্বোধনটি কোনো মেয়েকে লিখিনি গৌরী ছাড়া।'

প্রথম প্রেমের সুখও যত অসহ্য, বিরহও তত বেদনাদায়ক। গৌরীর শোককে ভোলবার জন্যে বিভূতিভূষণের মত মানুষও দাবা খেলে, গল্পগুজব করে সময়

কাটাতেন। শেষে কলকাতা ছেড়ে, লেখাপড়া ছেড়ে চলে এলেন হুগলি জেলার এক অখ্যাত গ্রামে জাঙ্গিপাড়ায় স্কুল মাস্টারি নিয়ে। ১৯১৯ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারি। কিন্তু সেখানেও থাকলেন না। ১৯২০ সনের ৩রা মে স্কুল থেকে পদত্যাগ করে চলে গেলেন সোনারপুর-হরিনাভি স্কুলে—এই বছরেরই জুন মাসে। এখানে তিনি ছিলেন ১৯২২ সনের ১৭ই জুলাই পর্যন্ত।

গৃহহারা যদি আমাদের পরিচিত বিভূতিভূষণের লেখা হয় তাহলে লেখার সময় এই ছিল তাঁর মানসিক অবস্থা। আর থাকার কথা বলতে গেলে থাকা আর কোথায়? এ তো লোকচক্ষুর কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান। একপ্রকার অজ্ঞাতবাসই।

লেখা যদি আরও আগের মানে, ১৯১৯-এরও আগে হয়, অর্থাৎ ১৯১৭-১৮য় হয় তাহলে বিভূতিভূষণ তো আছেন কলকাতায়। আর মন তো মিলনের আনন্দে টইটম্বুর। তারও আগের যদি হয় তাহলে তো বিভূতিভূষণের বিয়েই হয়নি।

বিভূতিভূষণের প্রথম বিবাহিত জীবন স্বল্প হলেও গৌরী তাঁর জীবনে কী নিবিড় হয়েই যে ছিল এবং থেকে গিয়েছিল! সেখানে গৃহহারার সদ্য বিবাহিত অধ্যাপক নরেশের অধ্যয়নের সংসারে তরুণী স্ত্রী মাধুরী তার উদ্ভিন্ন যৌবনের আকাঙ্ক্ষা নিয়েও উপেক্ষিত। নেহাৎ খেয়াল হলে নরেশ মাধুরীকে খুশি করার জন্যে রোমিও জুলিয়েটের কাছ থেকে ভালবাসা ধার করে। কিন্তু ভালবাসা কি ঋণ করে পাওয়া যায়? সে যে নিজেই বড় বড়লোক। তাই পড়ার আগেই মাধুরী প্রশ্ন করে বসে, আচ্ছা সেক্সপীয়রের বিয়ে হয়েছিল? তার স্ত্রী কেমন ছিল?

মাধুরীর ব্যর্থ যৌবন বিকশিত হল জ্যোতির্ময়ের স্তুতিতে, নিঃসঙ্গ দুপুরের বেদনা তারই সাহচর্যে কাটল। কিন্তু সে স্তুতি ভক্তের নয়, ভোগীর। সাহচর্য সাথীর নয়, কপট বন্ধুর। মাধুরী তখন যৌবনের তাপে ফুটতে শুরু করেছে। নরেশকে তার মনে হয় কী কুৎসিত! আবার কী এক অকারণ পুলকে মেঝেতে সে বালিশগুলো ছুঁড়ে ফেলে, আবার তুলে রাখে। নিজেকে তার অত্যন্ত লঘু লাগে। কিন্তু এই দুপুরে সে যে বড় একা। এমনই এক নিঃসঙ্গ অতিক্রান্ত দুপুরে জ্যোতির্ময়ের আবির্ভাব ঘটে। জ্যোতির্ময় বলে, কাউকে তার পছন্দ হয় না। তাই সে বিয়ে করবে না। মাধুরী কথাচ্ছলে বলে, তার মানে আমার যদি বিয়ে না হত তাহলে আমাকে তুমি বিয়ে করতে? জ্যোতির্ময় সঙ্গে সঙ্গে বলে, এখনও করতে পারি।

মুহূর্তের মধ্যে অশিব পুষ্পের ঘ্রাণে মাধুরীর নাক ঝাঁঝিয়ে যায়। ছি, ছি, এ কী সে বলল? কিন্তু ঘটনার জল তখন অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে। নরেশ আড়াল থেকে সব শুনেছে; এর পর মাধুরীর শাস্তির পালা। নরেশ তাকে কলকাতার এক

বেশ্যালয়ে নিয়ে তুলল। উদ্বেগ অনুশোচনায় তাকে শুষ্ক করা। মাধুরী যখন বুঝতে পারলে এ বেশ্যালয়, তখন প্রথমে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে। তারপর জ্ঞান ফিরে এলে নরেশকে অনুনয়-বিনয় করে একাধিক চিঠি লিখলে তাকে নিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু নরেশ যখন এল তখন সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

নরেশের নব-বিবাহিতা স্ত্রীকে উপেক্ষা, মাধুরীর নিষিদ্ধ উত্তেজনার আস্বাদ, তাকে বেশ্যালয়ে তোলা—বিভূতিভূষণের জীবনের সঙ্গে একটুও মেলে? ভাবতে পারা যায়? আর এ যদি বিভূতিভূষণের নিজের না হয়ে, নিজের দেখা বা জানা কোন ঘটনা হয় তাহলে তারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত দিনলিপিতে অধিকাংশ লেখারই নোট আছে। কিন্তু এরকম কোন ঘটনার উল্লেখ কোনটাতেই পাওয়া যায় না।

আমাদের পরিচিত বিভূতিভূষণের সাহিত্যের এক বড় অংশ জুড়ে প্রকৃতি। কিন্তু গৃহহারায় প্রকৃতি বর্ণনা আশ্চর্যরকমের কম। বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রীতির একটা বড় অংশ গ্রামকে ঘিরে। কিন্তু গৃহহারায় গ্রামের প্রকৃতি-প্রীতির পরিচয় তো নেই-ই, বরং যে বর্ণনা আছে তা সুখকর নয়।

'জানলা দিয়া খানিকটা উঁচুনীচু মাঠ, দেখা যায়, তার পরেই রাস্তা এবং রাস্তার ধারে কতকগুলি গৃহস্থের বাড়ী; চারিদিকে একটা মলিন এবং নিরুৎসাহ ভাব জীবন্ত রহিয়াছে। মাঠে এক জায়গায় খানিকটা স্তূপীকৃত আবর্জনা, তার পাহারা-ওয়ালা এক অস্থিচর্মসার ঘেয়ো কুকুর। জড়ের পক্ষ হইতে জড় ও প্রাণীর মধ্যের ব্যবধানটা লোপ করিবার একটা চেষ্টা চতুর্দিকে প্রকাশিত হইতেছিল।'

গৃহহারায় প্রকৃতির একমাত্র কিছুটা বর্ণনা আছে যেখানে কনক পুরীতে বেড়াতে গিয়েছে। 'অতি প্রত্যুষে কনকের ঘুম ভাঙিল, আগের দিনের ট্রেনের ক্লান্তি, আজ অন্তর্হিত, তাহার ঘরের জানলা দিয়া সমুদ্র দেখা যায়, অস্ফুট আলোকে বড় বড় ধূসরবর্ণের ঢেউগুলি ঠেলাঠেলি করিতে করিতে তীরের দিকে অগ্রসর হইতেছে, দুই একটি নুলিয়া বালক শামুক খুঁটিতেছিল। বাহিরের বাতাস একটি স্নিগ্ধ আর্দ্র পরশ দিয়া মন কাড়িয়া লইতেছে, যেন স্নেহের মায়ায় চারিদিকে বাঁধা পড়িয়াছে……তরঙ্গমালা যখন প্রথম ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তখন তাহাদের উদ্ধত আস্ফালন কেমন ভীষণ গর্জন, কিন্তু তীরের নিকট আসিতে আসিতে তাহারা শান্তমূর্তি ধারণ করিতেছে, তখন যেন কত নম্রভাব, আর তাহাদের কুলকুল মৃদু সঙ্গীত কেমন মধুর; দূরে আকাশ সাগরের সঙ্গমরেখা তখনও উপযুক্ত আলোকের অভাবে অস্পষ্ট, আকাশের পূর্ব দিকের অংশটায় একটা কোনও আয়োজনের আভাস, সেইখানে সূর্যোদয় হইবে।'

আমাদের পরিচিত বিভূতিভূষণের প্রকৃতিবর্ণনার বিষয়ে একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ করা যায়। তাঁর প্রকৃতিবর্ণনায় বন-পাহাড়-নদীর যতখানি স্থান আছে, সমুদ্রের স্থান কিন্তু তার চেয়ে যথেষ্ট কম। এই কম বেশি বিভূতিভূষণের স্বভাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বিভূতিভূষণ প্রকৃতির দিক থেকে শান্ত রসের রসিক। সমুদ্রের অক্লান্ত, অশ্রান্ত ঢেউয়ের মাঝখানে তিনি তাঁর মনের প্রশান্তি বোধ হয় খুব বেশি খুঁজে পাননি। যা পেয়েছেন বনে-পাহাড়ে-নদীতে।

বিভূতিভূষণের প্রকৃতিবর্ণনার একটা বড় পরিচয়, তা প্রকৃতির নিছক বর্ণনা নয়। (একেবারেই যে নেই তা নয়, যেমন বনে পাহাড়ে।) তাতে একটা সুর, বাণী, একটা message থাকে। গৃহহারার সমুদ্র বর্ণনার পাশে বিভূতিভূষণের সমুদ্র-বর্ণনা পড়লে বুঝতে পারা যায় একটি সমুদ্রের ছবি, আর একটিতে সমুদ্রের উদাত্ত সুর। তা বিশ্বরূপের, বিরাটত্বের আভাস আনে।

'ডাইনে দূরপ্রসারী ঝাউবন, পাশেই টোটা গোপীনাথের বাগানে অজস্র কাঁঠাল-গাছ, সামনে বিস্তৃত বালুচরের পাশে অপার নীলাম্বুরাশি সফেন ঊর্মিমালা বুকে নিয়ে তটভূমিতে আবার আছড়ে পড়চে। সে দৃশ্য দেখে আর চোখ ফেরাতে পারিনে, উঠতে ইচ্ছে হয় না। এই তো বিশ্বরূপের মন্দির, এই আকাশ, এই ঝাউবন, এই অপার নীল সমুদ্র।'……

'আজ সমুদ্রের উত্তাল রূপ। ঝড়বৃষ্টি কেটে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়েচে, সুনীল সমুদ্র যেন নিজের আনন্দে নিজে মত্ত হয়ে বড বড় ঢেউ তুলে কূলে আছড়ে আছড়ে পড়চে। দীর্ঘ টানা ঢেউয়ের রাশি মাথায় সাদা ফেনার পুঞ্জ নিয়ে বহুদূর ব্যাপী একটি রেখার সৃষ্টি করচে।……কি বিরাটত্বের আভাস ওই দূর বিসর্পী নীল রূপের মধ্যে ঊর্মিমালার সফেন আকৃতিতে, তটরেখার বিলীয়মান শ্যামলিমায়। স্থলভূমি শেষ হয়ে গেল এখানে। দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত এই নীলাম্বুরাশির ওপার নেই, আবার এপারে এই এসিয়া মহাদেশের উত্তর প্রান্ত, ইনিসে ও লেনা নদীর মুখ।'

পড়তে পড়তে বিভূতিভূষণের কথায় বলতে ইচ্ছে করে, এ তাঁর সেই দিশেহারা দেশের কথা—'vastness of space'।

গৃহহারার সমুদ্রবর্ণনা এবং বিভূতিভূষণের সমুদ্রবর্ণনা শুধু বক্তব্যের দিক থেকেই যে আলাদা তা নয়। বলার রীতির দিক থেকেও কত স্বতন্ত্র! গৃহহারার রীতি বর্ণনাত্মক। অবজেকটিভ। আর বিভূতিভূষণের রীতি অনুভাবাত্মক। সাব-জেকটিভ; একেবারে রোমান্টিক।

সহজ কথায় গৃহহারার প্রকৃতিবর্ণনা আমাদের পরিচিত বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-

বর্ণনার সঙ্গে কোথাও মেলে? একবারও মনে হয়, এ তাঁর হাত দিয়ে বেরিয়েছে? কী সেই ছেলেবয়সের কাদম্বরীর ভঙ্গিতে বর্ণনা, 'ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। মুনিগণ যে রক্তচন্দন সংযুক্ত অর্ঘ্যদান করিয়াছেন তদ্দ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া যেন সূর্যদেব রক্তিম বর্ণ ধারণ করিলেন।' কী তাঁর সেই যৌবনে প্রথম প্রকাশিত লেখা 'উপেক্ষিতা'র বর্ণনা, 'আজ সন্ধ্যার সময় সমুদ্রের ধারে বসে আমার সবুজ শাড়ি-পরা বাংলা মায়ের কথাই ভাবছিলুম।......ভাবতে ভাবতে প্রথম যৌবনের একটা বিস্মৃতপ্রায় ঝাপ্‌সা ছবি বড় স্পষ্ট হয়ে মনে এল। পঁচিশ বছর পূর্বের এমনি এক সন্ধ্যায় দূর বাংলা দেশের এক নিভৃত পল্লীগ্রামের জীর্ণ শান-বাঁধানো পুকুরের ঘাট বেয়ে উঠছে, আর্দ্র বসনা তরুণী এক পল্লীবধূ।......মাটির পথের বুকে বুকে লক্ষ্মীর চরণচিহ্নের মত তার জলসিক্ত পা-দুখানির রেখা আঁকা।...আঁধার সন্ধ্যায় তার পথের ধারের বেণু কুঞ্জে লক্ষ্মীপেঁচা ডাকছে। তার স্নেহভরা পবিত্র বুকখানি বাইরের জগৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তায় ভরা। আম কাঁঠালের বনের মাথার ওপরকার নীলাকাশে দু' একটা নক্ষত্র উঠে সরলা স্নেহ-দুর্বলা বধূটির ওপর সস্নেহে কৃপাদৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

তারপর এক শান্ত আঙ্গিনায় তুলসী মঞ্চমূলে স্নেহাস্পদের মঙ্গলপ্রার্থিনী সে কোন্ প্রণাম নিরতা মাতৃমূর্তি, করুণামাখা অশ্রু ছলছল।......মনে আসছে অনেক দূরের যেন কোন খড়ের ঘর......মিটমিটে মাটির প্রদীপের আলো......মৌন সন্ধ্যা —নীরব ব্যথার অশ্রু...শান্ত সৌন্দর্য...স্নেহ-মাখা রাঙ্গা শাড়ির আঁচল...আরব সমুদ্রের জলে এমন করুণ সূর্যাস্ত কখনও হয়নি!'

গৃহহারার বর্ণনা কি এর কোনটারই কাছাকাছি?

গৃহহারার শুধু প্রকৃতিবর্ণনা নয়, প্রতিপাদ্যকে উপস্থাপিত করার রচনা-রীতিও অন্যরকম। সে রীতি বিশ্লেষণাত্ম; analytical। বক্তব্যকে যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে গ্রাহ্য করে তোলার চেষ্টা। বোঝানর চেষ্টা। কিন্তু বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাসের রচনারীতি সম্পূর্ণ আলাদা। সে রীতি সংশ্লেষণাত্মক; synthetical। প্রতি-পাদ্যকে আমাদের অনুভবে নিয়ে যাবার চেষ্টা। নেহাৎই বোঝান নয়, বাজানর চেষ্টা। পথের পাঁচালী-অপরাজিত-আরণ্যক কি শুধুই আমাদের কিছু বোঝায়? তা কি আমাদের হৃদয়কে বিস্ফারিত করে না, সত্তার উত্তরণ ঘটায় না? সহজ কথায়, মন কি সেই রসানুভবের জগতে পৌঁছয় না?

মাধুরীর মৃত্যুর পর শূন্যচিত্ত নরেশ তার পড়ার ঘরে বসে আছে। সে এই ঘটনায় স্তম্ভিত, হতভম্ব।

'নরেশ তাহার পড়িবার ঘরে বসিয়া আছে; ম্লান মুখ, স্তিমিত নয়ন, পারি-পার্শ্বিক জগতে তাহার আগ্রহশূন্যতার পরিচয় দিতেছে।' গতকল্য সমস্তদিন

নানারূপ গোলমালে কাটিয়া গিয়াছে, মাধুরীর প্রতি শেষকর্তব্য বন্ধু প্রফুল্লর সাহায্যে যথাসাধ্য সমাধান করিয়া আজ সে শূন্যমনে—আবার এই কয়দিনেই তাহার উপর দিয়া কত বড় এক পরিবর্তনের স্রোত বহিয়া গিয়াছে, সেইটাকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টাই তাহার মুখের ভাবে প্রকটিত হইতেছিল ; জীবনে এতদিন তাহার এক শান্তশ্রী কবিতারাজ্য গঠনের সাধনায় কাটিয়াছে ; ক্ষুদ্র তরণীতে মন্দস্রোতা নদীর বক্ষে সে ভাসিতেছিল, নদীর কল-সঙ্গীতে তাহার শ্রবণ পরিপূরিত, তাহার দৃষ্টি সম্মুখে চঞ্চল উর্মিশিখার আলোকরশ্মির ক্রীড়ার প্রতি স্থিরবদ্ধ, দুই তীরের জীবনে জলন্ত বিষাদ দৃশ্য ও শোক সন্তাপের ক্রন্দন তাহার নিকট পৌঁছাইতে পারে নাই ; সে সাহিত্য, বিশেষতঃ কাব্যদ্বারা নিজের চতুর্দিকে এক দুর্ভেদ্য বর্ম রচনা করিয়াছিল, তাহারই কঠিন স্পর্শে মাধুরী ক্ষতবিক্ষত হইয়া শেষে গভীর নৈরাশ্য ভগ্ন-হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছে ; আজ কিন্তু তাহারই ক্ষুদ্র নিরানন্দ নৌকার উপর পৃথিবীর সমস্ত জ্বালা মূর্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; সে স্তব্ধ ও হতভম্ব।'

এর পাশে অপর্ণার মৃত্যুতে অপুর শূন্যতাবোধ কী করুণভাবে পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত!

'পূর্ণিমা তিথিটা···অপর্ণা ছাদের আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া, এই তো গত কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রিতে লক্ষ্মীর মত মহিমময়ী, কি সুন্দর ডাগর চোখ দু'টি কি সুন্দর মুখশ্রী। অপুর মনে হইয়াছিল, ওর ঘাড় ফেরাবার ভঙ্গিটা। যেন রাণীর মত···এক এক সময় সম্ভ্রম আসে মনে। অপর্ণা হাসিয়া বলে—আমার যে লজ্জা করে, নইলে সকালে তোমার খাবার করে দিতে ইচ্ছে করে, আমার ছোট বোন লুচি ভাজতে জানে না—মেজখুড়ীমা ছেলে সামলে সময় পান না—মা থাকেন ভাঁড়ারে, তোমার খাবার কষ্ট হয়—না? হঠাৎ অপুর মনে হয়—দূর ছাই—কি লিখে যাচ্ছি মিছে—কি হবে আর এসবে?

কি বিরাট শূন্যতা···কি যেন এক বিরাট ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, জীবনে আর কখনও তাহা পূর্ণ হইবার নহে···কখনও না, কাহার দ্বারা না···সম্মুখে বৃক্ষ নাই, লতা নাই ফুলফল নাই—শুধু এক রুক্ষ ধূসর বালুকাময় বহুবিস্তীর্ণ মরুভূমি।

···ও-বেলা একখানা পুরানো জ্যোতি-বিজ্ঞানের বই লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল—এখানা খুব ভাল বই এ-সম্বন্ধে।···এখানা হইতে অপর্ণাকে কতদিন নীহারিকা ও নক্ষত্রপুঞ্জের ফটোগ্রাফ দেখাইয়া বুঝাইয়া দিত—ও-বেলা যখন সেখানা লইয়া পড়িতেছিল, তখন তাহার চোখে পড়িল, অতি ক্ষুদ্র, সাদা রংয়ের—খালি চোখের খুব তেজ না থাকিলে দেখা প্রায় অসম্ভব—এরূপ একটা পোকা বইয়ের পাতায় চলিয়া বেড়াইতেছে। ওর সম্বন্ধে ভাবিয়াছিল—এই বিশাল জগৎ;

নক্ষত্রপুঞ্জ, উল্কা, নীহারিকা, কোটি কোটি দৃশ্য-অদৃশ্য জগৎ লইয়া এই অনন্ত বিশ্ব—ও-ও-ত এরই একজন অধিবাসী—এই যে চলিয়া বেড়াইতেছে পাতাটার উপরে, ও-ই তার জীবনানন্দ…কতটুকু ওর জীবন, আনন্দ কতটুকু?

কিন্তু মানুষেরই বা কতটুকু? ঐ নক্ষত্র জগতের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধই বা কি? আজকাল তাহার মনে একটা নৈরাশ্য ও সন্দেহবাদের ছায়া মাঝে মাঝে যেন উঁকি মারে। এই বর্ষাকালে সে দেখিয়াছে ভিজা জুতার উপর এক রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাতা গজায়—কতদিন মনে হইয়াছে মানুষও তেমনি পৃথিবীর পৃষ্ঠে এই রকম ছাতার মত জন্মিয়াছে—এখানকার উষ্ণ বায়ুমণ্ডল ও তাহার বিভিন্ন গ্যাসগুলি প্রাণ-পোষণের অনুকূল একটা অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া। এরা নিতান্তই এই পৃথিবীর, এরই সঙ্গে এদের বন্ধন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো, ব্যাঙের ছাতার মতই হঠাৎ গজাইয়া উঠে, লাখে লাখে, পালে পালে জন্মায়, আবার পৃথিবীর বুকেই যায় মিলাইয়া। এরই মধ্য হইতে সহস্র ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনার আনন্দ, হাসি-খুশিতে দৈন্য ক্ষুদ্রতাকে ঢাকিয়া রাখে—গড়ে চল্লিশটা বছর পরে সব শেষ। যেমন ঐ পোকার সব শেষ হইয়া গেল তেমনি।

এই অবোধ জীবগণের সঙ্গে ঐ বিশাল নক্ষত্র-জগতের ঐ গ্রহ, উল্কা, ধূমকেতু ঐ নিঃসীম নাক্ষত্রিক বিরাট শূন্যের কি সম্পর্ক? সুদূরের পিপাসাও যেমন মিথ্যা, অনন্ত জীবনের স্বপ্নও তেমনি মিথ্যা—ভিজা জুতার বা পচা বিচালী গাদার ব্যাঙের ছাতার মত যাহাদের উৎপত্তি—এই মহনীয় অনন্তের সঙ্গে তাহাদের কিসের সম্পর্ক?

মৃত্যুপারে কিছু নাই, সব শেষ। মা গিয়াছেন—অপর্ণা গিয়াছে—অনিল গিয়াছে—সব দাঁড়ি পড়িয়া গিয়াছে—পূর্ণচ্ছেদ।'

ভেতরকার সব জায়গা ক্রমশঃ তন্ন তন্ন করে খুঁজে এখন কি একথা মনে হয় না, গৃহহারার বিভূতিভূষণ আর আমাদের পরিচিত বিভূতিভূষণ আলাদা দুই বিভূতি-ভূষণই!

তবু আমাদের মনে কৌতূহল থেকে যায়, কে এই দ্বিতীয় বিভূতিভূষণ? কী তাঁর পরিচয়? গৃহহারাই কি তাঁর একমাত্র লেখা?

বিভূতিভূষণের বই পড়া ও প্রসঙ্গতঃ

Camerado, this is no book
Who touches this touches a man.

এতই বই ভালবাসতেন তিনি।

পথের পাঁচালী লিখে প্রচণ্ড নাম হয়েছে। অপরাজিত সেই সময়কার প্রবাসীর মত কাগজে বেরচ্ছে। বিভূতিভূষণ তাঁর একটি ডায়েরিতে লিখছেন, 'সাধনার কথা বলছিলাম কৃষ্ণধনবাবুর সঙ্গে। সাধনা চাই। আমি টিউশানি ছেড়ে দেব। অপরাজিত তো শেষ হয়েছে—এইবার ছাপা আরম্ভ হবে—কিন্তু এই সময় সাধনা চাই।

(১) ভাল ভাল উপন্যাসকার ও ছোটগল্প লেখকদের পুস্তক পাঠ।

(২) ইতিহাস, Biology ও Astronomy সম্বন্ধে আরও বই পড়া।

(৩) Philosophy সম্বন্ধে আধুনিক চিন্তাবিদ্‌দের বই পড়া।

(৪) Sir Thomas Browne ও Anatole France-এর বই আরও ভাল করে পড়া।

(৫) চিন্তা, ভ্রমণ, গল্প ও আড্ডা—ভাল সম্প্রদায়ে।

(৬) পল্লীতে যাওয়া ও Quaint ধরনের লোকের সঙ্গে আলাপ।'

বিভূতিভূষণও বোধ হয় বলতে পারতেন, 'And a few friend and many books, both true! Both wise and both delightful too!'

ছেলেবয়েস থেকেই বিভূতিভূষণের বই পড়ার নেশা ছিল অত্যন্ত বেশি। কত যে, তার সাক্ষী তাঁর ডায়েরিগুলো। বাবা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল যজমানী কাজ। সঙ্গে করে ছেলেকে নিয়ে যেতেন। তখন কত আর তাঁর বয়েস হবে? বড়জোর বারো-তেরো। বাবার সঙ্গে আড়ংঘাটা ঠাকুরবাড়ি গিয়েছেন। সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণ আর লা মিজারেবল।

'জীবনটা কি অপূর্ব, শুধু তাই আমার মনে পড়ে। সেই কতদিন আগে—মনে পড়ল এমন দিনটিতে বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম আড়ংঘাটার ঠাকুরবাড়িতে। সেই ছোট্ট ঘরটাতে থাকতাম, মোহন্ত ভোরবেলা উঠে কি স্তোত্র পাঠ করত, আর পিতলের লোটায় ঝোল রেঁধে আমাদের খেতে দিত। সেই তেঁতুলতলার দিকে বেড়াতে যাওয়া—সেই ওপরের ছাদে বসে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভিক্টর

'হিউগোর লা মিজারেবল পড়া—স্বপ্নের মত মনে আসে।'

শৈশবে এমন আরও কত বইই তিনি পড়েছেন। রাজকৃষ্ণ রায়ের পদ্য-মহাভারত, দাশরথি রায়ের পাঁচালি, মাধবীকঙ্কণ, মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত, রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা, মডেল ভগিনী, আমার অপূর্ব ভ্রমণ—এমন আরও কত কত বই।

ডায়েরিতে লিখেছেন, 'বাল্যকালে মডেল ভগিনী বইয়ে এই নন্দন পাহাড়ের হাওয়ার কথা পড়েছিলাম।'

'মনে পড়ে বহুকাল পূর্বে এই সময়েই শৈশবের সেই 'মাধবীকঙ্কণ' ও "জীবনপ্রভাত"।'

'সেই সময়টা সেই "আমার অপূর্ব ভ্রমণ", "রাজপুত জীবনসন্ধ্যা"—সে কি অপূর্ব শৈশবের আনন্দ-উৎসাহ কি অপূর্ব বিচিত্র জীবনটা তাই ভাবি।'

অনেকটাই যেন অপু!

স্কুলে ভর্তি হয়ে বিভূতিভূষণ সমুদ্রভ্রমণের বই খুব পড়তেন। এবং বাড়ি ফিরে তাঁর অদ্ভুত খেয়াল ছিল, ইছামতীতে নৌকায় ঘুরতে ঘুরতে এক একটা জায়গার এক একটা নাম-রাখা।

চটকাতলার খালকে বলতেন Oyster Brook।

'বাল্যে ওই সব বাদলার দিনে কেমন নৌকা বেয়ে একা বেড়াতুম, ওদিকে চালতেপোতার বাঁক, চটকাতলার খালের নাম রেখেছিলুম Oyster brook (ওস্টার ব্রুক)—তখন সমুদ্রভ্রমণের নানা বই পড়তাম, সর্বদা সেই স্বপ্ন দেখতুম!'

কখনও লিখেছেন, 'বোর্ডিং-এ থাকতে Traveller's Return গল্পটা কি অপূর্ব emotion নিয়েই পড়তুম।'

এমন মানুষ—প্রথম কবে রবীন্দ্রনাথ পড়েন?

বিভূতিভূষণ বলেছিলেন, ঠিক প্রথম কবে মনে নেই। তবে খুব শিশুকাল থেকেই। তখন তিনি আপার প্রাইমারি পাঠশালায় পড়েন। আট ন বছর বয়েস হবে। একদিন হেডমাস্টার মশাই একটি বই থেকে কবিতা পড়ে শোনালেন।

এতদিন 'দাশুরায়ের পাঁচালি শুনেছি, কবি-জারি গান শুনেছি, কাশীরাম দাসের মহাভারত নিজেও পড়েছি, গুরুজনদের মুখেও শুনেছি, কিন্তু এমন সুললিত কবিতা কখনও শুনি নি। যেন একটি অপূর্ব সঙ্গীত—অশ্রুতপূর্ব বাণী। হেডমাস্টারের মুখে শুনলাম কবিতার নাম 'বঙ্গে শরৎ' [প্রকৃত নাম 'শরৎ'] —লেখকের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

রবীন্দ্রনাথের কী বই বিভূতিভূষণ সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন? নিজেই

বলেছেন, ক্ষণিকা। 'আমি ক্ষণিকার বড় ভক্ত। 'ক্ষণিকা'র কথা একবার উঠলে আমি স্থির থাকতে পারি না।'

নিজের সাহিত্যের ওপরেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন গল্পগুচ্ছের কথা। কবিতায় তাই তো ক্ষণিকা। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে অপু থেকে কুশল পাহাড়ী। ক্ষণিকার 'সহজ'ই তো বিভূতিভূষণের অস্তিত্ব; তাঁর সাহিত্যের সবচেয়ে বড় আবেদন।

পথের পাঁচালী অপরাজিত লেখার সময়ে বা আগে-পরে বিভূতিভূষণ কী বই পড়তেন বা কী বইয়ের কথা ভাবতেন?

স্মৃতির রেখা তৃণাঙ্কুর এই সময়কার ডায়েরি। এগুলোর পাতা উল্টোলেই চোখে পড়ে, কী অজস্র বই তিনি এই সময়ে পড়েছেন, উল্লেখ করেছেন, কখনও কখনও তার উদ্ধৃতিও দিয়েছেন।

মার্টিন লুথারের জীবনী, মোঁপাসা, চৈতন্য চরিতামৃত, তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, **Bergson, Gibbon, Emerson, James Jeans, Camille Flammarion, William Prescott, Hugh Walpole, William Ralph Inge, Lief Ericsson, Oliver Lodge,** রবীন্দ্রনাথ, **Baudelaire, Balzac, Dante, Eckhart, Goethe,** মাধবীকঙ্কণ, **Scott,** উত্তররামচরিত এবং এমন আরও কত বই।

তাঁকে খুব নাড়া দিয়েছিলেন **Gibbon** আর **Emerson**।

দেবারই কথা। কারণ দুজনেই বিভূতিভূষণের মনের মত মানুষ। মন তৈরি করার মানুষ। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, মনে করিয়ে দেওয়ারই মানুষ। আসলে ভাল বই তো লেখককে প্রভাবিত করে না—আমরা প্রভাব বলতে যেরকম হুবহু আক্ষরিক প্রভাব বুঝি। ভাল বই লেখককে নিজেকেই মনে করিয়ে দেয়, কাছে এনে দেয়। বিভূতিভূষণের সাহিত্য তাঁরই 'ব্যথাহত আত্মা'র, তাঁরই চোখে 'মহাকালের মিছিল' দেখার সাহিত্য। বিভূতিভূষণের জীবনে-মেজাজে এইটেই স্বাভাবিক ছিল। ভবভূতি, **Emerson, Gibbon** তাঁকেই মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।

কখনও লিখেছেন, 'পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিন মধুনা তত্র সরিতাং'—পূর্বে যেখানে ছিল বহতা নদী, আজ সেখানে চড়া।

কখনও লিখেছেন ঐতরেয় আরণ্যকের সেই বিখ্যাত শ্লোক, 'চরণ্ বৈ মধু বিন্দতি চরণ্ স্বাদুমুদুম্বরম্। সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরণ্॥'—চলার দ্বারাই মানুষ অমৃতকে লাভ করে। সূর্যের শ্রেষ্ঠত্ব দেখ; তিনি সর্বদাই গতিশীল।

পথের পাঁচালীর শেষ পাতার সেই প্রসন্ন পথের দেবতারই যেন প্রবোধ!

কখনও লিখেছেন, Emerson-এর কথা। 'Every literary man should embrace solitude as a bride'।

কখনও Gibbon।

'গভীর রাত্রে নির্জন কাশবনের মধ্যে কাছারী ঘরে শুয়ে গিবন পড়ছিলাম। কত রাজা রানী সম্রাট মন্ত্রী খোজা সেনাপতি, কত সুন্দরী তরুণী বালক যুবার আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের কাহিনী। কত যুদ্ধ-বিগ্রহ, উত্থান-পতন, কত অত্যাচার উৎপীড়ন, হত্যা পরের জন্য কত প্রাণ দেওয়া—অতীতের ছায়া মূর্তিরা আবার গিবনের পাতায় ফিরে এল। হাজার যুগ আগের কত অশ্রুনয়ন নিষ্কলঙ্কা তরুণী, কত আশাভরা বুক নিয়ে কত মা বাপ কোথায় সব চলে গিয়েছে—কবে—কোথায়! এই গভীর রাত্রে তারা ফিরে এল।

পড়ছিলাম গিলডো, রুফাইনাস, খোজা ইউট্রোপিয়াসের অর্থলিপ্সার কথা—অর্থের জন্য তারা কি না করেছিল? বিশ্বস্ত বন্ধুর গুপ্তকথা প্রকাশ করে তাকে ঘাতকের কুঠারের মুখে দিতে দ্বিধা করে নি—নানা ষড়যন্ত্র, নানা বিশ্বাসঘাতকতা—কোথায় তাদের অর্থের সার্থকতা—কোথায় তাদের সে বৃথা শ্রমের পুরস্কার? এই দেড় হাজার বছর পরে দাঁড়িয়ে এদের মূর্খতা দেখে আমি ইতিহাসের পাঠক—আমাকে করুণা প্রকাশ করবার জন্যেই কি রুফাইনাস কাউন্ট জনকে কত নির্দয়ভাবে উৎপীড়ন করেছিল! সে করুণা কাউণ্ট জনের জন্য নয়, উৎপীড়ক রুফাইনাস ও তার ধনলিপ্সার জন্যে। কারণ আমি জানি তার পরিণাম।

বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাস গিবন ভ্রমশূন্য লিখেছিলেন কি বিউরি ঠিক লিখেছিলেন—সে বিষয়ে আমি তত কৌতূহল দেখাচ্ছি না—আমি শুধু কৌতূহলাক্রান্ত এই মহাকালের মিছিলে। এই সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, খোজা, ভৃত্য সেনাপতি,—তৃণের মত স্রোতের মুখে ভেসে যাওয়ার দিকটা আমায় মুগ্ধ করে।'

পড়তে পড়তে মনে হয় Gibbon না অপরাজিত?

এমনিই ছিল বিভূতিভূষণের বই পড়া।

এত বইয়ের মধ্যে কী বই তিনি প্রথম পড়েছিলেন জানতে ইচ্ছে করে।

—বছর পাঁচেক বয়সে মুগ্ধবোধ।

শেষ বই?

—Survival of the Soul। আগেও পড়েছিলেন।

২৯শে অক্টোবর বিভূতিভূষণ ধলভূম রাজবাড়ির এক বৈকালিক চায়ের আসরে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরে মারা যান।

ঠিক একমাস আগে এই বইখানি তিনি পড়ার জন্যে নামিয়েছিলেন।—দিনের ডায়েরিতে লেখা, 'Survival of Soul বইখানা বের করি ও পড়ি।'

এরই মাঝখানে James Jeans-এর Universe Around থেকে Maeterlinck-এর Life of the White Ants; ফুল্লরার বারমাস্যা থেকে বৃহদারণ্যক।

তবে দিনলিপিতে লেখা তো! নিজেরই জন্যে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, কোথাও তার চেয়ে একটু বেশি।

কখনও লিখেছেন, 'সাইমন মুচির গল্প করলুম।' কখনও সকালের মত এক টুকরো শ্লোক—'পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসা পরস্তাৎ'। কখনও Aeschylus থেকে খানিকটা ভাল লাগা। কখনও লেখা, 'বিশ্বভারতী এনে নীরদ চৌধুরীর প্রবন্ধ পড়চি'।

আমাদের জানতে ইচ্ছে করে, সাইমন মুচির কী গল্প? Aeschylus-এর কী তাঁর ভাল লেগেছিল? নীরদ চৌধুরীর কোন প্রবন্ধ তিনি পড়ছিলেন?

বর্তমান প্রবন্ধে প্রকাশিত-অপ্রকাশিত ডায়েরি ঘেঁটে বিভূতিভূষণের সেই বই পড়াকেই পরিচয়ে-প্রসঙ্গে সম্পাদিত করে প্রকাশ করা হল।

এই প্রকাশের ব্যাপারে ডায়েরিগুলি প্রকাশকাল নয়, গ্রন্থমধ্যস্থ কালানুযায়ী সাজান হল।

অভিযাত্রিক। প্রকাশকাল, ২২শে মার্চ, ১৯৪১। গ্রন্থমধ্যস্থ কাল ১৯২২-৩৩। পৃষ্ঠাসংখ্যা মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত সংস্করণের চতুর্থ মুদ্রণের।

'রামচরিত মানস' আমার পড়া ছিল। (পৃঃ ৩১)

'রোমিও জুলিয়েট' অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে লাগলেন।···কখনও 'হ্যামলেট' কখনও 'টেম্পেষ্ট'। (পৃঃ ৩৬)

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র কুয়াশার বর্ণনা[১] মনে পড়ল। (পৃঃ ৫০)

কান্টের মত দার্শনিক একটা ছোট্ট শহরে ছিলেন জার্মানির[২], এবং বড় চিন্তা করবার খোরাক পেয়েছিলেন সেখান থেকেই। (পৃঃ ১২৭)

---

১ প্রথম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, 'সাগর সঙ্গমে'।

২ ক্যোনিসবার্গে ছিলেন। আশি বছরের জীবনে কাণ্ট তাঁর এই জন্মস্থান ছেড়ে আশি মাইলও গিয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁর যা কিছু মহৎ সৃষ্টি সবই এখান থেকে।

রবীন্দ্রনাথ 'বাতায়নিকের পত্রে' লিখেছিলেন 'মাথার ওপর যে আকাশ নীল তাই দেখতে ছুটে যাই এটোয়া কাটোয়া' ওই ধরণের কিছু।[১] (পৃঃ ১৩১)

সে সময় আমি নিজে ছিলাম ঘোর agnostic। লেসলি স্টিফেনের দার্শনিক মতে অনুপ্রাণিত।[২] (পৃঃ ১৫৩)

উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ হুকার তাঁর প্রসিদ্ধ 'হিমালয় জার্নাল' নামক গ্রন্থে গোলগোলি ফুলের সৌন্দর্য্যের যথেষ্ট সুখ্যাতি করেছেন।[৩] (পৃঃ ১৯০)

বাঙলায় গোলগোলির অপর নাম গাবড়ি। উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম Cochlespermum religiosum (Linn.) Aeston।

স্মৃতির রেখা। প্রকাশকাল, ১লা শ্রাবণ, ১৩৪৮, ইং ১৯৪১। গ্রন্থমধ্যস্থ কাল ১৯২৪-২৮।

আজ যে মার্টিন লুথারের জীবনী[৪] পড়ছিলাম, তাতে মনে হোল এক এক সময় এক এক জন ব্রাত্যমন নিয়ে পৃথিবীতে এসে শুধু যে নিজেই স্বাধীন মত ব্যক্ত করে চলে যায় তা নয়, জড় মনকেও বন্ধন মুক্ত করে দেবার সাহায্য করে। (২৭.১০.১৯২৪)

'পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিন মধুনা তত্র সরিতম্'।[৫] (২৯.৭.১৯২৫)

---

১ কালান্তর, 'বাতায়নিকের পত্র'। যথার্থ পাঠ, 'কিন্তু নিকটের সব দরজাগুলোর তালায় মরচে পড়ে গেছে, চাবি আর খোলে না। রেলভাড়া করে দূরে যেতে হয়। আপিসের ছাদটার ওপরেই এবং তার আশেপাশেই যে-আকাশ নীল, যে-ধরণী শ্যামল, যে-জলের ধারা মুখরিত, তাকেই দেখবার জন্যে ছুটে যেতে হয় এটোয়া কাটোয়া ছোটনাগপুরে।'

২ বিভূতিভূষণের এ মনোভাবের ছাপ তাঁর তৎকালীন একটি গল্পেও আছে। গল্পটির নাম 'নাস্তিক' (মেঘমল্লার)।

৩ Sir Joseph Dalton Hooker তাঁর Himalayan Journals-এ এই ফুলের কথা লিখেছেন। 'Cochlespermum......cluster of golden yellow-flowers, as large as palm of the hand, and very beautiful'।

৪ মার্টিন লুথারের আত্মজীবনী। The Life of Luther/Written by himself/collected by M. Michelet/Translated by W. Hazlitt।

৫ ভবভূতি, উত্তররামচরিতম্, ২/২৭। যথার্থ পাঠ, 'পুরা যত্র স্রোতঃ, পুলিনমধুনা তত্র সরিতাং'। পূর্বে যেখানে ছিল নদীর স্রোত, আজ সেখানে চড়া।

যুগযুগের জনসেবা। সে দিকে মনে রেখে কাজ করতে হবে। সাময়িক হাততালির দিকে নয়। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় চৈতন্ত-চরিতামৃতে কি করেছেন ? (২০.১১.১৯২৫)

আনন্দেন খলু ইমানি সর্বানি ভূতানি জীবন্তি।[১] (২৮.৮.১৯২৭)

মনকে সেভাবে যে তৈরী করেছে, জগৎ তার প্রিয় সাথী—চিরদিনের বন্ধু।

"জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন"[২]। (২৮.৮.১৯২৭)

মোঁপাসার সেই পলাতক লক্ষ্মীছাড়া খুড়োর গল্পটা মনে এল। (১৬.৯.১৯২৭)

পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসা পরস্তাৎ— তিনি বুঝেছিলেন স্বামেব বিদিত্বাদি-মৃত্যুমেতি—নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।[৩] (২২.৯.১৯২৭)

সেই রঘুনাথজী হাবিলদারের কালো তরুণ চোখদুটি ও শিবাজীর হাতের কম্পায়মান উন্নত বর্শা মনে পড়ে।[৪] (৪.১০.১৯২৭)

Hugh Walpole-এর কথাটা বড় মনে লেগেছিল সেদিনকার Englishman এ : "The establishment of a contemplative order. Anyone above so, should retire to a quite valley, free from motors and radios and spend sometime in silence and comtemplation— midst green woods and quietness of chirping of wild birds

---

১ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ৩/৬। যথার্থ পাঠ, 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দেন প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি'। আনন্দ থেকেই ভূত সকলের জন্ম, আনন্দেই তারা জীবিত এবং আনন্দেই তারা প্রয়াত।

২ রবীন্দ্রনাথ, 'বন্দী বীর' (কথা)। যথার্থ পাঠ, 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন'।

৩ যজুর্বেদ, বাজসনেয়ী সংহিতা, মাধ্যন্দিনী শাখা, ৩১/১৮ ; শ্বেতাশ্বতরো-পনিষৎ, ৩/৮। যথার্থ পাঠ, 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্/আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ/তমেব বিদিত্বাদি মৃত্যুমেতি,/নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'। আমি সেই তিমিরাতীত আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষকে জেনেছি। তাঁকে জেনেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় ; তদ্ভিন্ন অন্য পথ নেই।

৪ রমেশচন্দ্র দত্ত, মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত।

beneath a blue sky—if possible by the side of a running brook.[১]" (১৬.১১.১৯২৭)

'ষোড়শী'[২] বইখানা শুনেছিলাম খুব ভালো। (১৮.১১.১৯২৭)

গভীর রাত্রে নির্জন কাশবনের মধ্যের কাছারী ঘরে শুয়ে শুয়ে গিবন[৩] পড়ছিলাম। (২.১২.১৯২৭)

---

১ The Englishman, Monday, Nov. 7, 1927.

The Best of Being Forty/Hugh Walpole Rejoices of Release from Youth's Schackles.

Hugh Walpole writing in T. P.'s weekly on the advantages of middle age, tells us that New Order wanted...

The···force opposed to honest thinking for the young is noise and restlessness that goes with it. There is not a young man or woman of any acquaintance, and I have very many, who ever thinks for twelve hours consecutively about anything. Is it here that the middle-aged can play their part? I look to the founding shortly of a new contemplative order that will have nothing whatever to do ostensibly with religion; it will simply provide an opportunity for people tired of noise and hurry and amusing themselves, of certain days every month, or every half year if you like, of silence and decent periods of connected thought. In a valley not two miles from here you go for a day and remain surrounded by as lovely scenery as there is in the world, uninterrupted by even a sheep.

Let the wise brethren of the middle aged betake themselves to such a valley (but not to my valley) and do their some nice, helpful thinking undisturbed by motor bicycles, electric hammers, jazz bands electric hares or radios.

Here is a splendid opportunity for some middle aged genius, a new contemplative order for any one above thirty. Meanwhile in my special valley I have started my own with a membership of one.

২ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প-সংকলন।

৩ Edward Gibbon। এঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম The History of the Decline and Fall of the Roman Empire।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাস গিবন ভ্রমশূন্য লিখেছিলেন কি বিউরি[১] ঠিক লিখেছিলেন—সে বিষয়ে আমি তত কৌতুহল দেখাচ্ছি না—আমি শুধু কৌতুহলাক্রান্ত এই মহাকালের মিছিলে। (৬.১২.১৯২৭)

সেই 'সাজাহান'[২] থিয়েটার হবে তার বিজ্ঞাপন। (৭.১২.১৯২৭)

চরণ বৈ মধু বিন্দতি। চরণ স্বাদুমুদুম্বরম্[৩]। (৬.১.১৯২৮)

সেই ওপরের ছাদে বসে ভিক্টর হিউগোর লা মিজারেবল পড়া। (৭.১.১৯২৮)

ক্লাবে মডার্ন রিভিউ পড়ছিলাম। (৭.১.১৯২৮)

সিসিলিয়া মরলের[৪] লেখা বড় ভাল লাগল। (১২.১.১৯২৮)

আজ এমার্সনের Immortality[৫] প্রবন্ধটা পড়ে মনে হোল আমার মনের কথা অবিকল লেখা আছে। (৩১.১.১৯২৮)

Goethe-এর কথাটা ভাল লাগে—Those who cannot hope about a future life are already dead in this life. (.৪.৩.১৯২৮)

কাল Imperial Library থেকে Conrad-এর[৬] বইখানা পাঠিয়ে দিয়েছে—আজ সেটা পড়ছিলাম। (২০.৩.১৯২৮)

এমন একটা জিনিষ আছে যা মনোজগতে আলোর রথের কাজ করে। মনোজগতের সুদূরের বাহন এই জিনিষটা Logic সঙ্গত। সে জিনিষটা কি

---

১ John Bagneel Bury। এঁর বইয়ের নাম A History of Greece to the Death of Alexander the Great।

২ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক।

৩ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, অধ্যায় ৩৩, খণ্ড ৩। যথার্থ পাঠ, 'চরণ্ বৈ মধু বিন্দতি চরণ্ স্বাদুমুদুম্বরম্। সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্॥' অর্থ, গতিশীল মানুষ জীবনে মাধুর্যকে পায়, সুস্বাদু ফলকে লাভ করে। সূর্যের শ্রেষ্ঠত্ব দেখ—কারণ তিনি নিরলস, গতিশীল।

৪ Modern Review, January, 1928। Cecilia Meirelles—A Brazilian Poetess and her interest in India (Illustrated), A. A. Pints।

৫ 'Immortality,' Letters and Social Aims, The works of R. W. Emerson (Vol. 8)।

৬ বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক Joseph Conrad। Lord Jim এর নামকরা বই।

তা বোঝানো মুস্কিল, শুধু অনুভব করে আস্বাদ করবার জিনিষ সেটা। Bergson তাকেই Intuition বলেছেন বোধ হয়।[১] (১.১.১৩৩৫)

দেশে ফিরে Scott-এর বই পড়তাম শুয়ে শুয়ে। (২৪.৪.১৯২৮)

আজকের দিনে কথাসরিৎ সাগর[২] কে পড়ে, গোটা অখণ্ড আরব্য উপন্যাস কে পড়ে, ডন কুইকজোট কে পড়ে? চসার, দান্তে, মিলটন এদের কথা বাদ দিই⋯অতবড় নামজাদা যে ঔপন্যাসিক বালজাক তাঁর উপন্যাসরাশির মধ্যে কখানা আজকাল লোকে সখ করে পড়ে? স্কট, হেনরি জেমস, থ্যাকারে, ডিকেন্স সম্বন্ধেও অবিকল এই কথা খাটে। ('সাহিত্যের কথা')

ফ্লবেয়ার বলেছেন, মানুষে যা করে, যা কিছু ভাবে, সবই সাহিত্যের উপাদান, তাই তাঁকে লিখতে হবে, শোভনতার খাতিরে তিনি যদি জীবনের কোন ঘটনাকে বাদ দেন, চরিত্রের কোন দিক ঢেকে রেখে অভিজ্ঞ চরিত্রকে মাধুর্যমণ্ডিত বা শ্রেষ্ঠ করবার চেষ্টা করেন—ছবি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 'এমা বোভারি'র[৩] স্রষ্টার উপযুক্ত কথা বটে! ('সাহিত্যের কথা')

তৃণাঙ্কুর, প্রকাশকাল, ? মার্চ ১৯৪৩। গ্রন্থমধ্যস্থকাল ১৯২৯-৩৪। পৃষ্ঠাসংখ্যা মিত্রালয় প্রকাশিত সংস্করণের চতুর্থ মুদ্রণের।

Dean Inge যাকে Joy of Life বলেছেন, তা আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেচি। (পৃঃ ১)

কে ভাবচে এই অপূর্ব অবাচ্য, অভাবনীয় অদ্ভুত সৃষ্টির কথা!⋯মানুষের অভিধানে যাকে বর্ণনা করবার শব্দ নেই। এক-আধজন এখানে ওখানে। Sir Oliver Lodge,[৪] Flammarion,[৫] Jeans,[৬] Swinburne. এঁদের নাম করা যায়। (পৃঃ ৬)

---

১ Henry Bergson। ইনি এঁর Introduction of Metaphysics বইয়ে Intuition-এর ব্যাখ্যা করেছেন।

২ রচয়িতা সোমদেব ভট্ট।

৩ Madame Bovary উপন্যাসের নায়িকা।

৪ ইংরেজ লেখক William Ralph Inge। ইনি St. Paul's Cathedral-এর Dean ছিলেন।

৫ ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী।

৬ ফরাশি জ্যোতির্বিজ্ঞানী Camille Flammarion।

৭ ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী Sir James Hoparod Jeans। ইনি ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে আসেন। সেই সময়ে এঁর সঙ্গে বিভূতিভূষণের পরিচয় হয়।

বাল্যকালে মণ্ডেল ভগিনী[১]... পড়েছিলুম। (পৃঃ ১০)

'মাধবীকঙ্কণ'[২] বইখানা এনেছি। (পৃঃ ১১)

সেই সময়টা সেই "আমার অপূর্ব ভ্রমণ", "রাজপুত জীবন সন্ধ্যা"[৩]—সে কি অপূর্ব শৈশবের আনন্দ উৎসাহ, কি অপূর্ব বিচিত্র জীবনটা তাই শুধু ভাবি। (পৃঃ ১৫)

Traveller's Return গল্পটা কি অপূর্ব emotion নিয়েই পড়তুম। (পৃঃ ১৬)

সেই শুভঙ্করী পাঠশালার সামনে আমার সহপাঠীর বাড়ি মনে পড়ে। কি সুন্দর! এসবের জন্যে কাকে ধন্যবাদ দেবো?—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।[৪] (পৃঃ ১৬)

Lief Ericsson[৫] was space-hungry। (পৃঃ ১৮)

শিশিরবাবুর চন্দ্রগুপ্তের[৬] অভিনয় দেখে এইমাত্র ফিরচি। (পৃঃ ২০)

ফরাসী কবি বোদলেয়ার সম্বন্ধে খানিকটা কথাবার্তা হল। (পৃঃ ৩৭)

মেটারলিঙ্কের 'Life of Ants'[৭] সম্বন্ধে একটি ..প্রবন্ধ পড়ছিলাম। (পৃঃ৪৫)

'গৈরিক পতাকা'[৮]· দেখতে মনোমোহনে। (পৃঃ ৫০)

Sir Thomas Browne[৯]· ও Anatole France এর বই আরও ভাল করে পড়া। (পৃঃ ৬২)

Prescott's Peru,[১০] Schackleton's[১১] Voyages ও Historiography-র বই পড়তে হবে। (পৃঃ ৭৬)

---

১ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর উপন্যাস।

২ রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস।

৩ রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস।

৪ ঋগ্বেদ, ১০।১২১।১-৯। এই নটি মন্ত্রের প্রত্যেকটির শেষ চরণ এটি। অর্থ, কোন দেবতাকে আমি হবিঃ নিবেদন করব?

৫ নরওয়েবাসী বিখ্যাত অভিযাত্রী।

৬ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক।

৭ পুরো নাম, The Life of the white Ant।

৮ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটক।

৯ ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী।

১০ W. H. Prescott, History of the Conquest of Peru with a Preliminary view of the Civilization of Incas।

১১ ইংরেজ অভিযাত্রী।

Pure logical thinking can give in no knowledge whatever of the world of experience, the knowledge of Reality begins with experience and terminates with it. Reasons give the structure to the system and the data on experience and their menta l relations are to correspond exactly with the consequences in theory.—Einstein, Herbert Spencer Lecture, Oxford, 1933। (পৃঃ ৮৬)

Lucian's Satires, Celsus (178 A. D.) writes : Christians are like a ' ouncil of frogs in a marsh. Their teachers are mainly weavers and cobblers, who have no power over men of education and taste. The qualifications for conversion are ignorance and childish timidity. Like all quacks they gather a crowd of slaves, children, women and idlers. (পৃঃ ৮৬)

Seneca—Economy, 'He is born to serve but few, who think, only the people of his own age. Many thousands of years, many generations of man are yet to come : look to these, though from some cause silence has been imposed on all of your own day ; then will come those who may judge without offence and without favour.' (পৃঃ ৮৬)

এমার্সন বলেছেন, "Every Literary man should embrace solitude as a bride !" এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হিউ ওয়ালপোল গত জুলাই মাসের Adelphi কাগজে বড় চমৎকার একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। নির্বাসিত দান্তে বলেছিলেন, 'কি গ্রাহ্য করি আমি, যতক্ষণ আমার মাথার ওপর আছে নীল আকাশ আর অগণ্য তারকালোক।' জার্মান মিষ্টিক একহার্ট[১] কখনো লোকের ভিড়ে বা শহরের মধ্যে থাকতে ভালবাসতেন না—তাঁর "Our heart's brotherhood" গাথাগুলির মধ্যে অনেকবার উল্লেখ আছে এ কথার। (পৃঃ ১১৮-৯)

ব্যালজাকের গল্পটা (Atheists Mass)[২] তখনই পড়ে সবে বেড়াতে গিয়েছি। (পৃঃ ১১০)

---

১ **Meister Eckhart।**

২ **'Atheists Mass', Atheists Mass & other Stories.।**

অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৯৩৩।

সকালে উঠে দেখি আমার বাবার হাতের লেখা পুঁথির অংশ ও মহানাটকের বইয়ের পাতা—প্রতাপাদিত্য[১] ও আমার I. A. সময়কার পড়া ? এর স্মৃতিজড়িত বইখাতার পাতাগুলো ছিঁড়ে পড়ে আছে। (২৯.১.)

মহাবিভূতি উপনিষদে[২] শ্লোক আছে—'অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ এতাদৃশিনী অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডানি আবরণানি জ্বলন্তি।' (৫-২.)।

এদের নিয়ন্তা যে অক্ষর পুরুষ, তাঁর সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক[৩] যাজ্ঞবল্ক্য বলেচেন 'এতস্য অক্ষর পুরুষস্য প্রশাসনে গার্গী সূর্যচন্দ্রমসৌ (নভসি) বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।' (৫.২.)

Imperial Library গেলুম—Secret Doctrine[৪] আনতে। (১৩.২.) হেঁটে বাড়ী আসতে আসতে Ghost land[৫] বই আনলুম। (২২.২.)

Prehistory[৬] বইখানাই নিয়ে এলুম অনেক কাল পরে। (৪.৪.)

মানময়ী গার্লস্ স্কুল[৭] হোল। (২১.৪.)

সেখানে গিয়ে শুনি রবীন্দ্রনাথ আমার সন্ধান করচেন—পশুপতিবাবু আমার মেসে মোটর নিয়ে এসেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ নতুন নাটক[৮] পড়বেন—বলেচেন বিভূতিকে আনা চাই। (১.৫.)

---

[১] ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাটক; যথার্থ নাম, বঙ্গের প্রতাপ-আদিত্য।

[২] ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণ উপনিষৎ, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৩৬৯, ঈশাদি বিংশোত্তর শতোপনিষদঃ, নির্ণয়সাগর সংস্করণ। যথার্থ পাঠ, 'অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতান্যেতাদৃশানান্যনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি।' অর্থ, এই রকম অনন্তকোটি আবরণযুক্ত ব্রহ্মাণ্ড এই ব্রহ্মাণ্ডের চারদিকে দীপ্যমান।

[৩] বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৩।৮.৯। যথার্থ পাঠ, 'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ'। হে গার্গি, এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) শাসনে সূর্য ও চন্দ্র বিধৃত রয়েছে।

[৪] লেখিকা Helena Petrovna Blavatsky।

[৫] লেখক O' Donnell Elliot।

[৬] World prehistory, John Grahams Douglas Clark; Book of Prehistory, Dina portway Dobson।

[৭] রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের নাটক।

[৮] সম্ভবতঃ বাঁশরি।

সেখানে Imperial Library তে Nabil's Narrative[1] পড়লুম। (৩.৫.)

আবার থিয়েটারে বসে রিজিয়া[2] দেখলুম। (১৭.৫.)

Life in the Stars[3] খানা পড়ছিলুম। (২৮.৫.)

Ghost and Marvel's এর Schalkain the Painter[4] গল্পটা পড়ছিলুম। (১৯.৬.)

Cathedral[5] বইখানা ফেরৎ দিয়ে আসি। (২০.৬.)

Wolfe's Spiritualism[6] পড়লুম। (.৮.৭.)

বাবা, মা, পিসিমা সবাই ওই নীল আকাশের মেঘবর্ত্ম দিয়ে বহু দূরের কোন পথ যাত্রায় বেরিয়ে চলে গিয়েছে—'প্রস্থিতা দূরমাধ্বানং'[7] কথাটা মনে পড়তে লাগল। (২৯ ৭.)

---

১ The Dawn-Breakers/Nabil's Narrative of the Early Days of the Bahai' Revelation ; Shoghi Effendi মূল ফরাশি থেকে ইংরেজিতে গ্রন্থটির অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন।

২ মনোমোহন রায়ের নাটক।

৩ লেখক Sir Francis Younghusband।

৪ সংকলনটি V. H. Collins সম্পাদিত। গল্পটির যথার্থ নাম, 'Schalken, the painter', লেখক Joseph Sheridan।

৫ Hugh Walpole-এর উপন্যাস।

৬ Startling Facts in Modern Spiritualism, Napolean Bonaparte wolfe।

৭ ওঁ সপ্তব্যাধাদশার্ণেষু মৃগাঃ কালাঞ্জরে গিরৌ/চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাসরসি-মানসে/তেভি যাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ/প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যুয়ং-তেভ্যোঽবসীদত ॥ হরিবংশ, ২৪।২০।

এই শ্লোকটির প্রসঙ্গ এই, সাত ভাই প্রথম জন্মে ব্যাধ, দ্বিতীয় জন্মে হরিণ, তৃতীয় জন্মে চক্রবাক, চতুর্থ জন্মে হংসদেহ ধারণ করে। কিন্তু পঞ্চম জন্মে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাম্পিল্য নগরীর রাজা এবং দ্বিতীয় তৃতীয় ভ্রাতা তার মন্ত্রী হয়। অবশিষ্ট চার ভাই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করে। ঘটনাচক্রে পরে সাত ভাইয়েরই মিলন হয়।

শ্রাদ্ধের সময় যে কটি মন্ত্র পাঠ করা হয় তাতে উল্লিখিত ব্রাহ্মণ-তনয়দের পাঁচটি জন্মে ব্যাধাদি দেহধারণের উল্লেখ আছে। বিভূতিভূষণের উল্লিখিত বর্তমান শ্লোকটিও শ্রাদ্ধেরই একটি শ্লোক। অর্থ, যে সাত জন দশার্ণ দেশে ব্যাধ হয়ে কালাঞ্জরের পর্বতে মৃগ হয়ে, শরদ্বীপে চক্রবাক হয়ে, মানস সরোবরে হংস হয়ে জন্মগ্রহণ করে, তাদের মধ্যে চারজন কুরুক্ষেত্রে বেদপারগামী ব্রাহ্মণরূপে দেহধারণ করে দূরপথে (মুক্তিপথে) প্রস্থান করে। তোমরা তিনজন তাদের কাছ থেকে সকল বিবরণ অবগত হও।

The Undiscovered Country[১] পড়ছিলুম। (৯.৮.)

'কণিকা' নিয়ে আলোচনা হল। (১১.৮.)

পড়ছি Wassermann এর World's Illusion[২] নামে নভেলখানা। (৩০.৮.)

'ঊষা দিশাহারা নিবিড় তিমির আঁকা'[৩] এই কবিতাটি আবৃত্তি করলুম। (৪.৯.)

Story of Everest[৪] বইখানা পড়লুম। (৪.১০.)

'দক্ষিণাপথভ্রমণ'[৫] পড়লুম। (৫.১০.)

অনেকক্ষণ ধরে পড়লুম Good Companions।[৬] (১৯.১০.)

Oliver Lodge এর My Philosophy বইখানা পড়লুম। (২৩.১০.)

Homes and Garden[৭] বইখানা তাগাদা করলুম। (২৪.১০.)

Plant Geography[৮] পড়লুম। (১৬.১১.)

'অশোক'[৯] দেখবার নিমন্ত্রণ পত্র পেলাম। (১.১২.)

Film দেখতে—Blue Angel।[১০] (৭.১২.)

বেড়িয়ে পুরনো বই কিনে (Lonely Trails)[১১] রমেশ সেনের আড্ডায়। (১৭.১২.)।

অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৯৩৪।

---

১ এই নামে একাধিক ব্যক্তির বই আছে। যথা D.P. Dothie; Rev. G. H. S. Walpole; William D. Howells'; Harold Bayley (সম্পাদিত)।

২ World's Illusion, Jakob Wassermann।

৩ 'দুঃসময়', কল্পনা।

৪ লেখক W. H. Murray।

৫ লেখক শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী।

৬ J. B. Priestley-র উপন্যাস।

৭ Homes and Gardens of England, H. Batsford & C. Fry।

৮ An Outline of Plant Geography, Douglas H. Campbell।

৯ গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক।

১০ Heinrich Mann-এর উপন্যাস, মূল গ্রন্থের নাম Professor Unrat।

১১ Tales of Lonely Trails, Zane Grey।

পশুপতিবাবু 'পরলোকের কথা'[১] ২য় সংস্করণ একখানা দিয়ে গিয়েছে। (২৪.১.)

bart এর Chotonagpur : a forgotten province of the Empire[২] ...পড়ছিলুম। (১০.৩.)

সারাদিন Louis Golding এর Magnolia Street[৩] পড়ছিলুম। (১৮.৩.)

Stewart Island[৪] বলে একটা বই কিনলুম। (৯.৪.)

Story of San Michele[৫] পড়ছি—অতি চমৎকার বই। (১০.৪.)

Life ot Jesus[৬] পড়লুম Middleton Murry-র। (৯.৫.)

আমি সাইমন মুচির গল্প[৭] করলুম। (৩০.৫.)

John Bull[৮] পড়লুম। (৩১.৫.)

রাত্রে তাস খেলা ও 'খাই-খাই'[৯] গল্প। (৪.৬.)

সন্ধ্যায় খুকুকে Rip Van Winkle[১০]এর গল্প বলি। (৮.৬.)

'কাকাবাবু'[১১]বই আনার জন্যে গেলুম। (১১.৬.)

বাড়ী এলুম—সঙ্গে A Gentleman from San Francisco বলে একখানা Ivan Bunin[১২]এর গল্পের বই। (২৭.৬.)

১ লেখক মৃণালকান্তি ঘোষ।

২ Chota Nagpur : a little known province of the Empire, Francis Bardley-Birt।

৩ Louis Golding-এর উপন্যাস।

৪ Stewart's Handbook of the Pacific Islands, Percy S. Allen (সংকলিত)।

৫ The Story of San Michele, Axel Martin Fredrik Munthe।

৬ The Life of Jesus, John Middleton Murry।

৭ 'What Men Live By', L. N. Tolstoy।

৮ Bernard Shawর নাটক; পুরো নাম John Bull's Other Islands।

৯ সুকুমার রায়ের ছোটদের বই।

১০ Washington Irving-এর গল্প।

১১ লেখক তারকনাথ বিশ্বাস।

১২ A Gentleman from San Francisco and other Stories, Ivan Bunin।

বাড়ী এসে Road Back[১] পড়লুম। (২.৭.)

রঙমহলে এলুম 'পতিব্রতা'[২] দেখতে। (৬.৪.)

'World of Souls'[৩] বইখানা আনলুম। (১.৮.)

Idealist View of Life[৪] বড় ভাল লাগচে। (১৭.৮.)

গেলুম 'মাতৃঋণ'[৫] সম্বন্ধে দু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে। (২৬.৮.)

শুক্ল যজুর শতপথ রুদ্রার স্তোত্র[৬] । (৬ ৯.)

মণীন্দ্রলালের সঙ্গে দেখা—বল্লে 'সোনার কাঠি'[৭] বইখানার রিভিউ করে দিতে। (১০. ৯.)

'গৃহিণী প্রিয় শিষ্যা'[৮] শ্লোকটা ·····একটা অদ্ভুত ভাব জাগালে। (১২. ৯.)

Thomas Mann-এর Mario and the Magician[৯] পড়লুম। (২৫.৯.)

Death in Venice[১০] পড়লুম। (৩০. ৯)

Ivanhoe সংক্রান্ত বই পাঠিয়ে দিয়েছে অনুবাদের জন্যে।[১১] (৪. ১০.)

Richard Dehan-এর 'A Nursery Tea'[১২] গল্প পড়েছি। (৬. ১২.)

১ Erich Maria Remarque-এর উপন্যাস।

২ রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটক।

৩ The World of Souls, Wincentry Lutoslawski।

৪ An Idealist View of Life, Sarvapalli Radhakrishnan।

৫ সীতা দেবীর উপন্যাস।

৬ শতরুদ্রিয় স্তোত্র, শুক্লযজুঃ সংহিতা, ১৬ অধ্যায় (১-৬৬ সংখ্যক মন্ত্র)।

৭ লেখক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

৮ যথার্থ পাঠ, গৃহিণী সচিব সখা মিথঃ প্রিয়-শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্ ।।

(রঘুবংশম্ ৮/৬৭)। অর্থ, তুমি আমার সংসারকর্মে গৃহিণী, মন্ত্রণায় সচিব, রহস্যালাপে প্রিয়সখী এবং ললিত কলাবিদ্যায় প্রিয়শিষ্যা ছিলে। অকরুণ কাল তোমায় হরণ করে, বল, আমার কী না হরণ করল ?

৯ Thomas Mann-এর গল্পগ্রন্থ।

১০ Thomas Mann-এর উপন্যাস।

১১ সম্ভবতঃ ১৯৩৮-এ বিভূতিভূষণের অনূদিত আইভ্যান হো বেরিয়েছিল।

১২ 'Nursery Tea', Earth to Earth (গল্প-সংকলন)।

'Rosanna' গল্পটি[১] পড়লুম। (৯. ১২.)

পড়লুম Procurator of Judea[২]। (৮. ১২.)

Prosper Merimee-এর Mateo Falcone[৩] পড়লুম। (১৩. ১২.)

Mrs. Knollys[৪] গল্পটা। (২১. ১২.)

ঊর্মিমুখর, প্রকাশকাল, অগস্ট ১৯৪৪। গ্রন্থমধ্যস্থ কাল ১৯৩৫-৩৬। পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রথম বিভূতি প্রকাশন সংস্করণের।

"We live too much in books and not enough in nature, and we are very like that simpleton of a Pliny the Younger who went on studying Greek author while before his very eyes Vesuvius was overwhelming fine cities beneath the ashes." (পৃঃ ২৯)।

লেখাপড়া বা সংচর্চার বালাই নেই কারো। Aeschylus এর কথায় :

"They live like silly ants
In hollow caves unsunned ;
To them comes no sun, no moon,
No stars, no music, no spring
Flower-perfumed……"[৫] (পৃঃ ৩২)

Nineteenth Century Review থেকে কটা ভালো ভালো কবিতা তুলেছি :—

'Beyond the East the sun rise, beyond the West the sea,
And East and West the wonder thirst that will
not let me be,
And come I may, but go I must, if men ask you why,
You may put the blame on the stars and the sun
on the white load and the sky.'

---

১ লেখিকা Maria Edgeworth।

২ Anatole France-এর গল্প।

৩ 'Mateo Falcon', Mosaique (গল্প-সংকলন)।

৪ লেখক Frederic Jesup Stimson।

৫ Prometheus Bound নাটকের Prometheus-এর উক্তি : ৪৫৫-৭ চরণ।

'To scorn all strife and to view all life
With the curious eyes of a child.
To travel hopefully is better than to arrive.'
'To love Nature for the sake of what it brings forth, for its beauty, for its harmony will help you a little nearer to perfection.'

'To feel love for humanity in the sweetness of spiritual Communion, in the joy of helping one another, in the happiness of playing a part together in the everlasting work of the farm of worlds and universe, will bring you all the nearer to the goal of evolution.' (পৃ: ৩৭)

সার অলিভার লজের পত্রাবলী পড়লুম… তিনি বলেছেন, 'Universe is the body of God—this is one of his mode of manitestation.'[১] (পৃ: ৩৮-৯)

'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'।[২] (পৃ: ৩৯)

সোয়েন হেডিনের তাকলা-মাকান মরুভূমি পার হওয়ার গল্প করলুম।[৩] (পৃ: ৪৩)

রামায়ণের সেই শ্লোকটা মনে পড়ল—

সন্তি নদ্যো দণ্ডকেষু তথা পঞ্চবটী বনে।
সরযূ বিচ্ছেদ শোকং রাঘবস্থ কথং সহেৎ॥

১ Letters from Oliver Lodge (Compiled and annotated by J. Arthur Hill)। বর্তমান পত্রটি Arthur Hillকেই লেখা; তারিখ ১৪.৬.১৯১৭। যথার্থ পাঠ, 'that the cosmos is in some sense or other the "body" of the God, or may be so regarded seems to be more or less inevitable. That is it is God's mode of manifestations or one of his modes.'

২ ঈশোপনিষৎ, ১।১। ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং॥

অর্থ, জগতের সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আবৃত কর, ত্যাগের দ্বারা আত্মার নির্বিকারত্ব রক্ষা কর। কারও ধনে লোভ কর না।

৩ Sven Hedin, Central Asia & Tibet।

পঞ্চবটী ও দণ্ডকারণ্যে তো কত নদনদী বর্তমান, কিন্তু সরযূ বিরহ দুঃখ কি রামচন্দ্র সহ্য করতে পারেন। (পৃঃ ৪৫)

র‍্যাম্বোর পর ভারলেনের জীবনী পড়ছিলুম। নিচের লাইন কটি বড় চমৎকার।

'Et je m'en vais	And I going
An vent man vais	Born by blowing
Qui us, emporte	Wind and grief
Deca, deta	Flutter here and there
Parcil a la	As on the air
Fevile morte	The dying leaf.'[১]

ওর প্রথম দুটো stanzas

'Le sanglots longs	Long sobbing wind
Des violirs	The violins of a autumn drove
De l'automore	Wounding my heart
D'une Languer	With a langour as smart
Monotone	In monotone.
Font suffo quant	Choking and hale
Et leteme, quand	When on the gale
Sonne l'heune	The hours sound deep
Je me Sous viens	I call to mind

[১] Paul Verlaine, Poems Saturniens, Paysages Tristes, 'Chanson D'automne' (Song of Autumn)।

যথার্থ পাঠ,

'Et je m'en vais	I drift after
An vent manvais	On winds which bear
Qui m'emporte	My soul in grief,
Deca, dela	Their evil force
Pareil a la	Deflects its course
Feville morte.	Like a dead leaf,'

Des jours anciens	Dead year behind
Et je pleune	And I weep."[১] (পৃ: ৪৭)

Verlain-এর বিষয়ে এ কথাটা ঠিকই মনে হয় যে, যে লেখক বর্তমান যুগের লোককে মজাতে না পারলে সে কোন যুগের লোককেই মজাতে পারবে না। Bernard Shaw তাঁর Sanity of Art-এ যে কথা লিখেছেন, তারি সত্যি। 'The writer who aims at producing the platitude which are 'not for this age but for all time' has his reward in being unreadable in all ages. Whilst Plato and Aristophanes peopling Athens with living men and women, Shakespeare peopling with Elizabethan Mechanics and warwickshire hunts, Carapaccio painting the age of St. Ursula exactly as if she were a lady living in the street next to him, and still alive and at home everywhere among the dust and ashes of thousands of academic punctilious, archaeologically correct men of letter and art.'[২] (পৃ: ৪৭-৮)

১

Les sanglots longs	The wailing note
Des violins	That long doth float
De l'automne	From Autumn's bough,
Blessent men cœur	Doth wound my heart
D'une langueur	With no quick smart,
Monotone.	But dull and slow
Tout suffocant	In breathless pain
Et bleme, quand	I hear again
Sonne l'heure,	The hour ring deep.
Je me souviens	I call once more
Des jours anciens	The days of yore
Et je pleure ;	And then I weep.

২ The sanity of Art, Preface। যথার্থ পাঠ, 'The writer who aims at producing the platitudes which are "not for an age, but for all time" has his reward in being unreadable in all ages; whilst Plato and Aristophanes trying to knock some sense into Athens of their day, Shakespeare peopling that same Athens with Elizabethan mechanics and Warwickshire hunts. and Ibsen photographing the local doctors as vestrymen of a Norwegian parish, Capaccio painting the life of St. Ursula exactly as if she were a lady living in the next street to him, and still alive and at home everywhere among the dust and ashes of many thousands of academic, punctilious, most archaeologically correct men of letters and art who spent their lives haughtily avoiding the journalist's vulgar obsession with ephemeral.'

Montaigne সম্বন্ধে একটি কথা বড় ভালো লাগল। 'He was the greatest artist of all—he knew the art of living.' (পৃঃ ৪৮)

রবীন্দ্রনাথের বলাকা থেকে কবিতা মনে মনে আবৃত্তি করতুম 'এবার আমার সিন্ধুপারের কুঞ্জবীথিকায়'।[১] (পৃঃ ৫১)

ডিসরেলী বলেছিলেন জীবন সম্বন্ধে 'Youth is a blunder, maturity is a struggle and old age is regret'।[২] (পৃঃ ৫২)

'By day and by night, year in and year out, century after century, there is going out a colossal broadcast of power which gives real life to all who will enter into it. Normal function of the organism is to act as a receiving set for Life Power. Clear out hatred, malice, lust, fear and all other frictions and you will find that entirely without any other effort on your part, there will pervade your being and your life that hitherto unheard wave of spritual power.' (পৃঃ ৫৩-৪)

আমরা আরও ভুলে যাই যে, পাপ জিনিসটাতে ভগবান রাগ করুন বা না করুন—'Sin should be synonymous with bad radio production. A bad man is known by its poor reproduction of God's life.' (পৃঃ ৫৪)

'When we began to deny ourselves for the good of others it was a highly important step in the soul's development and destined to lead on to increasing concern for others' good. Then we begin to realise God with a personal interest in our life and we decide to consider his wishes.' (পৃঃ ৫৪)

আরও কথা আছে। টাকা রোজগারই তো সংসারের উদ্দেশ্য নয়। জীবনের চরম সার্থকতা আসবে মনের পথ ধরে। কিন্তু সময় আসে যখন মনে হয় ভগবান

---

১ বলাকা, ২৬ সংখ্যক কবিতা। যথার্থ পাঠ, 'এবারে ফাল্গুনের দিনে সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়'।

২ Disraeli, Coningsby, Book III। যথার্থ পাঠ, 'Youth is a blunder, manhood a struggle ; old age a regret'।

জীবনের কেন্দ্র, তাঁর কাছ থেকে সব মঙ্গল আসবে। 'It is well to have a clear cut aim. Unless we are striving to attain our policy is drift, and drift will not bring us the lost things. The lost things have to be thought for, prayed for, worked for, and the supermost thing in earthly life is the development of soul—qualification for a spacious and satisfying activity when entering the Beyond.' (পৃ: ৫৪-৫)

'It is the outermost of highest sphere. Life there is realised more impersonally. One's whole work and activity on that sphere would be solely for the good of others. There would be no personal bias, selfish aims or ambitions would be impossible.' (পৃ: ৫৫)

'To those who have some feeling that the natural world has beauty in it, I would say, cultivate this feeling and encourage it in every way you can. Consider the seasons, the joy of spring, the splendour of summer, the sunset colours of the autumn, the delicate and graceful bareness of winter trees, the beauty of snow, the beauty of light upon water, what the old Greek called the unnumbered smiling of the sea.'

'In the feeling for that beauty, if we have it, we possess a pearl of great price.'—Lord Grey of Falloden. (পৃ: ৬৫)

দুপুরে অনেকক্ষণ বসে Valia গল্পটি পড়ছিলুম। (পৃ: ৭৪)

'নীচৈস্বভিরুচি' এই টুকরোটুকু যেন উদ্ভট শ্লোকে ছেলেবেলায় পড়েছিলুম। (পৃ: ৭৫)

আইভ্যান বুনিনের কথায় বলি, 'Then what is art ? It is the prayer, the music, the song of human soul'। (পৃ: ৯৬)

পেট্রার্ক সম্বন্ধে উক্ত হয়েছে 'It is a noble Florentine profile, the whole aspect suggesting abundance of thought and life.' (পৃ: ১০৪)

পেট্রার্ক সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে, বড় সত্যি সে কথা। 'Know that for

a lofty soul death is but a release from prison, that she frightens only those who work for their whole happiness in this poor earth!' (পৃঃ ১১২)

Earnest Toller-এর ভাষায় বলি : 'In the war there lived a man among millions Karl Liebknecht; his was the voice of truth and of freedom. Even the prison groove could not silence that voice.' (পৃঃ ১১৪)

দার্শনিক [? Ernst Toller] সত্যিই বলেচে—'An easily realizable ideal quickly loses his power of stimulating, nothing lets a man down with such a pump into listless disillusionment as the discovery that he has achieved all his ambitions and realized all his ideals. Once actually seized the peach turns out to be a Dead Lea fruit.' (পৃঃ ১১৫)

উৎকর্ণ, প্রকাশকাল, ? এপ্রিল ১৯৪৬। গ্রন্থ মধ্যস্থ কাল ১৯৩৬-৪২। পৃষ্ঠাসংখ্যা মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণের।

সুপ্রভা এবার ব্রাউনিংয়ের 'Rudel to the Prince of Tripoli'-র[1] অনুবাদ করেছিল 'বিচিত্রা'য়। (পৃঃ ২৫)

Jeans-এর Universe Around[2] পড়লুম। (পৃঃ ২৯)

'Space and time, I am learning are merely modes or appearance / Since a corner with thee darling, seems infinite now'—Goethe। (পৃঃ ২৯)।

Ignominy thirsts for respect—কি কথাই বলেচে ভিক্টর হিউগো! (পৃঃ ১০৭)

The Croxley Master[3] বলে Conan Doyle-এর একটি গল্প পড়তে বেলা গড়িয়ে ফেললাম। (পৃঃ ১২৯)

---

১ 'Rudel to the Lady of Tripoli,' Men and Women, Robert Browning।

২ The Universe Around, Sir James Jeans।

৩ Croxley Master and other Tales of the Ring and the camp।

Conan Doyle ছোট গল্পে ভালো শিল্পী ছিলেন। তাঁর 'A straggler of '15। (পৃঃ ১২৯)

সেই যে কি একটা ফিল্ম দেখেছিলেন—পাহাড় থেকে পড়ে গেল, কি একটা চমৎকার কথা আছে তাতে? আমি তখনই বুঝতে পেরেছি, ও A Tale of Two Cities-এর কথা বলচে। বল্লুম--কথাগুলো কি? 'I am the life and the Resurrection. He who believeth in Me'[১] - এই পর্যন্ত বলে উঠল—হাঁ, হাঁ - ঠিক। (পৃঃ ১৩০)

'কল্পনা সৃষ্টি বীজক'। কল্পনাই সৃষ্টির বীজ। 'যা সৃষ্টি স্রষ্টুরাদ্যা'[২]—কালিদাস কবি হলেও দার্শনিকের দৃষ্টি তাঁর ছিল। (পৃঃ ১৩৭)

Cleopetra[৩] পড়ে......Cleopetra-র ইতিহাস বলি। (পৃঃ ১৪১)

Jules Lemaitre-এর সেই কথা—The end is nothing, the road is all। (পৃ. ১৫২-৩)

'War and Peace' পড়লুম। (পৃঃ ১৭৭)

আমি Keith-এর প্রাচীন দিনের মানুষ সম্বন্ধে বইখানা[৪] পড়তুম। (পৃঃ ১৯৩)

নাগপঞ্চমীর ছুটিতে সেই ব্যারাকপুর যাওয়া......খুকুর কত কথাবার্তা—The apple tree, the singing and the gold[৫]। কোথায় কি চলে গিয়েছে। (পৃঃ ১৯৫)

Jean ও Eddington-এর Astronomy টা খুব পড়া গিয়েচে।' (পৃঃ ২১৪)

রবীন্দ্রনাথের 'শেষ রক্ষা' অভিনয় হল। (পৃঃ ২২৪)

শৈলজার 'নন্দিনী'[৬] বইখানা দেখে এলাম। (পৃঃ ২২৯)

---

১ A Tale of Two Cities, Book III, Chapter XV। যথার্থ পাঠ, 'I am the Resurrection and the Life, Saith the Lord ; he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die'।

২ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ১/১।

৩ লেখক Haggard Rider।

৪ Ancient·Types of Man, Concerning Man's Origin।

৫ Euripides, Hippolytus ; Galsworthy-র 'The Apple Tree' নামে একটি গল্প আছে। এখানে তিনি সেটিরই উল্লেখ করেছেন।

৬ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নাটক।

অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৯৪৩।

'স্বপ্নমায়া'[1] অভিনয় হোল (১.১.)

Spirit Teaching[2] পড়ি। (১৫.১.)

'Leiningen and the ants'[3] গল্পটা পড়তে লাগলুম। (১২.৩.)

শ্রীম-কথিত রামকৃষ্ণচরিত[4] ও মায়াবতী আশ্রম প্রকাশিত 'জীবনচরিত'[5] হাতে এসেছে। (১ ৪)

'ভারতে বিবেকানন্দ'[6] বইখানা পড়ি। (৩.৪.)

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতং [ম্]/তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। কেনোপনিষৎ ১।৫[7]। (৪.৪.)

'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা'।[8] (৪.৪.)

পড়লুম 'মদন ঘোষের বদনে হাসি' ত্রৈলোক্যবাবুর লেখা।[9] (১৮.৪.)

'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'[10] পড়ি। (৪.৫.)

'য দেবা' গ্নৌ য'প্সু যো বিশ্বভুবনমাবিবেশ'।[11] (২৯.৫.)

'ডিটেকটিভ'[12] অভিনয় করলে ওরা। (১৬.৬.)

---

১ নীরদরঞ্জন দাশগুপ্তের নাটক।

২ William stanton Moses, Spirit Teachings।

৩ Carl Stephenson, 'Leiningen versus the ants'।

৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

৫ Romain Rolland, The Life of Ramakrishna।

৬ বিবেকানন্দের বক্তৃতার সংকলন। (উদ্বোধন প্রকাশিত।)

৭ অর্থ, লোকে যাকে মনের দ্বারা চিন্তা করতে পারে না কিন্তু ব্রহ্মবিদ্‌গণ মনকে যার দ্বারা বিষয়ীকৃত (প্রকাশিত) বলে থাকেন তাকেই ব্রহ্ম বলে জানবে। লোকে যাকে 'ইহা' বলে উপাসনা করে তা ব্রহ্ম নয়।

৮ ধ্যানবিন্দু উপনিষৎ।

৯ মুক্তমালা (গল্প সংকলন), ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

১০ লেখিকা মৈত্রেয়ী দেবী।

১১ শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ২।১৭। যথার্থ পাঠ, 'ও যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বভুবনমাবিবেশ'। অর্থ, যে দেব অগ্নিতে, জলেতে এবং সমগ্র জগতে প্রবিষ্ট তাঁকে প্রণাম।

১২ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক।

ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল/নবনদী একাকার স্রোতে বহে জল।[1] (১৫.৭.)

দিলীপের বইয়ে[2] Aldous Huxleyর অধ্যাত্ম তত্ত্বের মোড় ঘুরবার কথায় বেশ উৎসাহ বোধ হোল। (৩১.৮.)

ন মে দ্বেষরাগৌ ন চ [মে] লোভ মোহৌমদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষশ্চিদানন্দরূপঃ [শিবোঽহং শিবোঽহম্] ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং ন মন্ত্রো ন তীর্থো ন বেদা ন যজ্ঞাঃ। /অহং ভোজনং নৈব, ভোজ্যং ন ভোক্তা, চিদানন্দরূপঃ [শিবোঽহং শিবোঽহম্] ন মৃত্যুর্নশঙ্কা, ন মে জাতিভেদাঃ পিতা নৈবমাতা চ জন্মঃ।/ন বন্ধুর্নমিত্রং গুরুনৈব শিষ্যং চিদানন্দরূপ শিবোঽহম্।[3] (৩.১০.)

'বিশ্বভারতী' এনে নীরদ চৌধুরীর প্রবন্ধ[4] পড়চি। (১৫.১০.)

ওরা 'দুই পুরুষ'[5] মহড়া দিচ্চে। (২৩.১০.)

'Set in Diamond'[6] পড়তে পড়তে এলুম। (২৭.১০.)

Anatole France-এর Prologue to well of St. Claire[7] পড়ে শোনাই। (১৫.১২.)

May Sinclair এর Uncanny Stories পড়ি। (১৭.১২.)

অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৯৪৫। গ্রন্থমধ্যস্থ কাল জানুয়ারী-মে।

Death of Noble Godavary[8] পড়ি। (৩০ ১)

Hinduism at a Glance[9] পড়ি। (৭.২.)

Twenty Years After[10] পড়ি। (১৬.২.)

---

১ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, চণ্ডীমঙ্গল, 'ফুল্লরার বারমাস্যা'।

২ দিলীপকুমার রায়, তীর্থঙ্কর।

৩ শঙ্করাচার্য, নির্বাণষট্‌ক।

৪ 'গগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাবলী', বিশ্বভারতী, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫০।

৫ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক।

৬ লেখিকা Charlotte M. Braume।

৭ গল্পটির ফরাশি নাম 'Le puits de Sainte Claire'।

৮ লেখিকা Victoria Mary Sackville-West।

৯ লেখক Swami Nirvedananda।

১০ Alexandre Dumas-র উপন্যাস।

অন্তরঙ্গ দিনলিপি, প্রকাশকাল, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬। গ্রন্থমধ্যস্থ কাল যে ১৯৪৫-ডিসেম্বর ১৯৪৫।

আপটন সিনক্লেয়ারের দি জাঙ্গেল[১] পড়ি। (১৫.৫.)

ত্রৈলঙ্গ স্বামীর জীবনী[২] পড়ি। (২০.৫.)

স পর্যগাৎ[৩]—তিনি বাইরে চলে গিয়ে বিশ্ব হয়ে রয়েছেন। (৫.৭.)

সনস্ অফ হেভেন সম্পর্কে বই পড়ি ট্রেনে। (৯.৭.)

Who never in weeping ate his bread / Who never through the night's sad hours / Hath sat in tears upon his head / He knows you not ye Heavenly powers. (১৩.৭.)

সন্ধ্যায় 'চিত্রাঙ্গদা' পড়তে প্রবোধ সজনীর বাড়ি। (১.৯.)

'রাতুল চরণে সে মালা দলিও'।[৪] (৮.৯.)

গাণিতিক জিনস্ বলেছেন, তিনি (গড) বড় গাণিতিক। (১১ ৯.)

কবির বড় কাজ হচ্ছে বহুধাবিচিত্র জগৎ রূপায়িত করা। কাহিনীটি মাত্র একটি। সূত্র তাতে গাঁথেন যা খুশী। গ্যেটে বলেছিলেন—এরূপ রচনায় বেশী দৃষ্টি রাখতে হবে, যেন বিভিন্ন অংশ হয় সুস্পষ্ট আর সমগ্র ব্যাপারটি রয়ে যায় দুর্জ্ঞেয় এক কূট সমস্যার মত। এটি মানুষকে বার বার প্রলুব্ধ করবে এর অর্থ উদ্ধারের দিকে। (১৭.৯.)

অথ প্লেটো: 'The Soul, if pure departs to the invisible world but if lamented by the communion with the body she lingers

---

১ Upton Sinclair-এর উপন্যাস।

২ বিভূতিভূষণের জীবৎকালে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর তিনটি জীবনচরিত সমধিক পরিচিত ছিল। প্রথমটি কৃষ্ণানন্দ সরস্বতীর, দ্বিতীয়টি উমাচরণ মুখোপাধ্যায়ের, তৃতীয়টি সুরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের।

৩ স পর্যগাৎ শুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। / কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ ঈশোপনিষৎ ৮। অর্থ, তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত, তিনি তেজস্বী, শরীররহিত, স্নায়ুরহিত, শুদ্ধ, পাপক্লেশশূন্য, কবি, মনীষী, সর্ব্বত্র বর্তমান, স্বয়ম্ভু। তিনি শাশ্বতকালের জন্য যথোচিতরূপে সম্পদকে ভাগ করে দিয়েছেন।

৪ গানটির প্রথম চরণ, 'যদি মনে পড়ে সেদিনের কথা।' লেখা অজয় ভট্টাচার্যের, গাওয়া ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের।

hovering near the earth and is afterwards born into the likeness or some lower form that which true philosophy refines, along rises to the Gods.'…Phaedo (২৬.৯.)

কতকাল পরে স্লিম্যানের ঠগীকাহিনী[১] খুঁজলুম। (৭.১০.)

অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৯৫০।

বসে পড়ি অমিয় নিমাই চরিত।[২] (৭.৬.)

স্বামী অভেদানন্দের Life Beyond Death পড়ছিলুম। (৬ ৯.)

Survival of Soul[৩] পড়ি। (২৯.৯.)

আমার লেখা, প্রকাশকাল, সেপ্টেম্বর ১৯৬১, ২৮শে ভাদ্র ১৩৬৮। পৃষ্ঠা-সংখ্যা প্রথম বিভূতি প্রকাশন সংস্করণের।

বিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক লর্ড এ্যাক্টন একবার বলেছিলেন যে উনবিংশ শতাব্দীর মানুষের পক্ষে নবম বা দশম শতাব্দীর মানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝা বড়ই কঠিন। ('রবীন্দ্রনাথ', পৃঃ ১৯)

দেশবাসীরা বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলার স্কট, মধুসূদনকে বাংলার মিলটন, কালীপ্রসন্ন ঘোষকে বাংলার এমার্সন নামে অভিহিত করে সাহিত্যে তাঁদের স্থান সুনিপুণভাবে নির্দিষ্ট করা গিয়েচে ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন।…তাঁরা মুরুব্বিয়ানার সুরে তাঁকে [রবীন্দ্রনাথকে] বাংলার শেলী কি বাংলার মেটারলিঙ্ক বলতে পারলে না। ('রবীন্দ্রনাথ', পৃঃ ২০)

আমার হাতের কাছে একখানা বাংলা উপন্যাস রয়েচে, নাম 'বিজয়বল্লভ',[৪] ১৮৮০ সালে সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।…উপাখ্যানভাগ কাদম্বরীর অনুকরণে রচিত। ('রবীন্দ্রনাথ', পৃঃ ২০)

---

১ William Henry Sleeman, Report on the depradations committed, by Thug gangs of Upper and Central India from the cold season of 1836-37 down to their gradual suppression under the operation of the measures adopted against them by the Supreme Government in the year 1839, Calcutta, G. H. Huttmann, 1840।

২ লেখক শিশিরকুমার ঘোষ।

৩ Pierre Corniller, The Survival of the Soul and its Evolution after Death।

৪ লেখক গোপীমোহন ঘোষ।

Leonardo-র Gioconda অথবা বেঠোফেনের পরিকল্পিত Symphony-র সৌন্দর্য, ইহাদের প্রথমটির মূলে আছে রেখা ও বর্ণের অপূর্ব সমাবেশ ও দ্বিতীয়টির মূলে সুকৌশল ধ্বনি-সমন্বয়। ('রবি-প্রশস্তি', পৃঃ ২৩)

দার্শনিক সপেনহর বলিয়াছিলেন—উপনিষদ তাঁহার জীবনে সান্ত্বনার কারণ হইয়াছে ··শকুন্তলা পাঠ করিলে কবিবর গ্যেটে বলিয়াছেন যদি কেহ একস্থানে শরতের বসন্তের সম্পদ—স্বর্গ ও মর্ত্যের মিলন প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে শকুন্তলা পাঠ করিলে তাঁহার সেই বাসনা পূর্ণ হইবে।[১] ('রবি-প্রশস্তি,' পৃঃ ২৪)

ছোটগল্পে একটি বিশেষ প্রকাশভঙ্গি 'কথা'র। আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে 'কথা' ছিল। যেমন কথাসরিৎসাগর ও পঞ্চতন্ত্র। দণ্ডীর দশকুমার-চরিত। গোড়লকৃত উদয়সুন্দরীকথা—ইত্যাদি। ('রবি-প্রশস্তি,' পৃঃ ২৫)

ফরাসি শ্রেণীর সাহিত্যে Conte বলিয়া এক শ্রেণীর কথা বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, মোপাসাঁ, ব্যালজাক, আলফাঁস দোদে প্রভৃতি ক্ষমতাশালী লেখকদের হাতে Conte অপূর্ব সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ('রবি-প্রশস্তি,' পৃঃ ২৫)

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যে conte আমদানী করিলেন, যাহার ফলস্বরূপ আমরা পাইলাম গল্পগুচ্ছের অপূর্ব গল্পগুলি। ১২৮৪ সালে ভারতী পত্রিকায় তাঁহার প্রথম ছোটগল্প 'ভিখারিনী' বাহির হয়![২] ('রবি-প্রশস্তি', পৃঃ ২৫-৬)

ফরাসী সাহিত্যের গল্পের নিয়মগুলি···তাহার সহিত ইউরোপীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন ক্রমগুলির তুলনা করা চলে। প্রথম অংশটি ভূমিকা, দ্বিতীয় অংশ 'সম্প্রসারণ', তৃতীয় অংশ 'পুনরাবৃত্তি', চতুর্থ অংশ 'বিরতি' ও সর্বশেষ অংশ koda বা 'ক্লাইম্যাক্স'। ছোটগল্পের বিভিন্ন অংশেও এইরূপ ক্রম বজায় রাখিতেই হইত,

১ 'Willst du die Blute des Fruhen die Fruchte des spatern Jahres, / Willst du, was reizt und entzuckt, willst du was Sattig und nahrt,/Willst du den Himmel, die Erde, mit einem, Namen begriefen, / Nennich, Sakontala, Dich, und so ist alles gesagt.'

২ ভারতী, শ্রাবণ-ভাদ্র ১২৮৪। বিভূতিভূষণ যখন এই গল্প পড়েন তখন এটি রবীন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থে সংকলিত হয়নি। তিনি সম্ভবতঃ পত্রিকার পাতা থেকেই পড়েছিলেন। পরে এটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর ২৭ খণ্ডে সংকলিত হয়।

এবং এই স্বর্ণনিগড়ের মধ্যে বন্দিনী কথা সরস্বতী···যে অমর বর দান করিতেন শিল্পীকে তাহার প্রমাণ স্বরূপ পাই জুল ক্লারিৎ, ফ্রাঁসোয়া কোপ্প, মোপাঁসা, ব্যালজাক, আনাতোল ফ্রাঁসের অনবদ্য ছোটগল্পগুলি। আনাতোল ফ্রাঁসের 'জুডিয়ার শাসনকর্তা' ছোটগল্পশিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ('রবি-প্রশস্তি', পৃঃ ২৬)

রবীন্দ্রনাথ এইরূপ অমর মুহূর্ত সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার 'পোস্টমাস্টার' 'কাবুলিওয়ালা', 'দৃষ্টিদান', 'ব্যবধান' প্রভৃতি বিখ্যাত গল্পগুলিতে। ('রবি-প্রশস্তি', পৃঃ ২৬-৭)

এ যুগে প্রতীচ্য শিল্পীদের মধ্যে ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ডের গল্পগুলি এ দিক দিয়া অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। ('রবি-প্রশস্তি', পৃঃ ২৭)

রবীন্দ্রনাথের ঘটনাপ্রধান গল্পের মধ্যে 'গুপ্তধন'-এর কথা মনে পড়িল।··· পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মধ্যে ফরাসী conte আর ধ্বনিত হয় নাই, যেমন 'বৈষ্ণবী' প্রভৃতি গল্প। ফরাসী শিল্পের মায়াশৃঙ্খল সবলে ছিন্ন করিয়া তাঁহার শক্তিশালী মন যখন গল্প লিখিবার নিজস্ব একটি অপূর্ব ধারা আবিষ্কার করিয়াছে যাহার চরম পরিণতি আমরা দেখিতে পাই 'চতুরঙ্গ' এবং 'দামিনী', 'শ্রীবিলাস', জ্যাঠামশাই প্রভৃতির মধ্যে। ('রবি প্রশস্তি', পৃঃ ২৭)

ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নাই, এই অদ্ভুত বালক ও কিশোর সম্বন্ধে। এ সম্বন্ধে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চের 'সাধারণী' হইতে নিম্নোধৃত অংশই বিশিষ্ট প্রমাণ।

'আমরা নিরাশ মনে নবগোপাল বাবুকে অভিসম্পাত করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি এমন সময়ে দেবেন্দ্রবাবুর পুত্র, জ্যোতিরিন্দ্র ও রবীন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রবাবু দিল্লীর দরবার সম্পর্কে একটি কবিতা ও একটি গল্প রচনা করিয়াছিলেন। আমরা একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষচ্ছায়ে দূর্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার কবিতা ও গল্প শ্রবণ করি। রবীন্দ্রনাথ তখনো বালক, তাঁহার বয়স ষোল কি সতেরো বৎসরের অধিক হয় নাই। তথাপি তাঁহার কবিত্বে আমরা বিস্মিত ও আদ্রিত হইয়াছিলাম। একজন সুপরিচিত কবি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দ্রবিত হৃদয়ে বলিলেন, যখন এই কবি প্রস্ফুটিত কুসুমে পরিণত হইবেন, তখন দুঃখিনী বঙ্গের একটি 'অমূল্য রত্নলাভ হইবে।' ('রবি-প্রশস্তি', পৃঃ ২৮)

এই কবি নবীনচন্দ্র সেন। নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' গ্রন্থের চতুর্থ-ভাগে এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন। ' স্মরণ হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে [বস্তুতঃ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ] আমি কলিকাতায় ছুটিতে থাকিবার সময়ে কলিকাতার উপনগরস্থ কোনও

উদ্যানে 'নেশানাল মেলা' দেখিতে গিয়াছিলাম।... একজন সদ্য-পরিচিত বন্ধু মেলার ভিড়ে আমাকে 'পাকড়াও' করিয়া বলিলেন যে একটি লোক আমার সঙ্গে পরিচিত হইতে চাহিতেছেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া উদ্যানের এক কোণার এক প্রকাণ্ড বৃক্ষতলায় লইয়া গেলেন। দেখিলাম সেখানে সাদা ঢিলা ইজার চাপকান পরিহিত একটি সুন্দর নবযুবক দাঁড়াইয়া আছেন। বয়স ১৮।১৯, শান্ত স্থির। বৃক্ষতলায় যেন একটি স্বর্ণমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। বন্ধু বলিলেন— 'ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। দেখিলাম সেই রূপ, সেই পোশাক। হাসিমুখে করমর্দন কার্যটি শেষ হইলে তিনি পকেট হইতে একটি 'নোটবুক' বাহির করিয়া কয়েকটি গীত গাহিলেন, ও কয়েকটি কবিতা গীতকণ্ঠে পাঠ করিলেন। মধুর কামিনী লাঞ্ছিত কণ্ঠে, এবং কবিতার মাধুর্যে ও স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম।' (রবি-প্রশস্তি', পৃঃ ২৯)

'পশ্য দেবস্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি অহো' বিশ্বদেবতার এই অমর কাব্য প্রত্যক্ষ কর, যা কখনো জীর্ণ হয় না, কখনো ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না[1]। ('রবি-প্রশস্তি', পৃঃ ৩০)

দাশু রায়ের পাঁচালি শুনেছি, কবি-জারি-গান শুনেছি। ('প্রথম দর্শন', পৃঃ ৩২)

হেড-মাস্টারের মুখে শুনলাম কবিতার নাম 'বঙ্গে শরৎ'[2]—লেখকের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।' ('প্রথম দর্শন', পৃঃ ৩২)

'রেইন বো'র মত বড় উপন্যাসও তৈরী হয়েছে যুদ্ধের আবহাওয়ায়। প্যারিসে জার্মান অধিকারের দুঃস্বপ্ন লুই ব্রমফিল্ডকে প্রলুব্ধ করেছে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসখানি লিখতে। ('সাহিত্যে বাস্তবতা', পৃঃ ৩৭)

স্বীকার করতে হবে তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর', প্রবোধ সান্যালের 'অঙ্গার', মনোজ বসুর 'দ্বীপের মানুষ' প্রভৃতি এ সময়ের শ্রেষ্ঠ রচনা। ('সাহিত্যে বাস্তবতা', পৃঃ ৩৭)

---

১ অন্তিসন্তং ন জহাতন্তি সন্তং ন পশ্যতি। দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি॥ (অথর্ববেদ ১০।৮।৩২) অর্থ, নিকটেই বর্তমান দেবকে মনুষ্য পরিত্যাগ করে না ও দেখেও না। দেবতার কাব্যকে দেখ। ঐ কাব্য কখনও জীর্ণ হয় না, বিনষ্ট হয় না।

২ যথার্থ নাম, 'শরৎ' (কল্পনা)।

রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুন্তী সংবাদ যখন রচিত হয়েছিল…সমালোচক বলেছিলেন, 'মহাভারতের কথা নিয়ে এ আবার কি রকমের কাব্যি?' ('সাহিত্যে বাস্তবতা', পৃঃ ৩৮)

বাংলার প্রাণশক্তির উৎস আজও তেমনি সজীব, যেমন ছিল মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের যুগে, যেমন ছিল ভারতচন্দ্রের যুগে, যেমন ছিল 'নববাবু বিলাসে'র ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগে, যেমন সেদিনও দেখেছি বঙ্কিম-শরৎ-রবীন্দ্রনাথের যুগে। ('সাহিত্যে বাস্তবতা', পৃঃ ৪০)

'তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।'[১] ('সাহিত্যে বাস্তবতা' পৃঃ ৪১)

'গল্প-গুচ্ছের' 'গল্পভারতী'র যুগে নাম করা হচ্ছে 'কথামালা', 'মণিমঞ্জুষা'র। ('সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প', পৃঃ ৪৪)

'কাদম্বরী' প্রমুখ ক-টা বিখ্যাত নাটক কাব্যের রূপে প্রকটিত। ('সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প', পৃঃ ৪৪)

সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা দেখি তিন রকম রূপ-এর। এক রকম হচ্ছে জাতীয় গৌরবময় কাহিনী অবলম্বনে বীরত্বের কাহিনী যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'লিজেণ্ড' (Legend), আর এক রকম হচ্ছে নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যে উপমা ও তুলনামূলক সহজ গল্প যার ইংরেজি পরিচয় 'ফেবল' (Fable)। তৃতীয়টা হল সহজ ও সাধারণ উদ্দেশ্যহীন আমোদদায়ক গল্প যাকে ইংরেজিতে বলে 'টেল' (Tale)। ('সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প', পৃঃ ৪৪)

প্রথম রকমের গল্পগুলো…'বৃহৎ কথামঞ্জরী' ও 'কথাসরিৎসাগর'। বৃহৎ কথামঞ্জরী প্রকাশিত হয়েছিল ১০৬৬ থেকে ১০৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। রচনা করেছিলেন তখনকার কাশ্মীরের বিখ্যাত পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র। কাশ্মীরের প্রাচীন জনশ্রুত কাহিনীগুলোকে সুন্দরভাবে গল্পের আকারে সাজিয়ে গ্রন্থরূপ দেওয়ায় ক্ষেমেন্দ্রের যথেষ্ট কৃতিত্ব। ('সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প', পৃঃ ৪৫)

---

১ পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজঃ। যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥ ঈশোপনিষৎ, ১৬।

অর্থ, হে প্রজাগণের পোষক, একমাত্র দ্রষ্টা, লোকের নিয়ন্তা সূর্যদেব! তুমি রশ্মি ও তেজকে সম্যক প্রসারিত কর। তোমার যে কল্যাণতম রূপ, তা আমি দেখেছি। তোমার মাঝখানে অধিষ্ঠিত যে পুরুষ তা আমিই।

'কথাসরিৎ-সাগরে'র রচয়িতা সোমদেব। রচিত হয়েছিল 'বৃহৎ-কথামঞ্জরী' রচনার প্রায় পঁচিশ বছর পরে। পর পর আঠারোটি লম্বকে একশ চব্বিশটি ভাগে ভাগ করে একটা মনোরম গল্পধারা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই এর নাম কথার স্রোতসাগর। গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে রাজা উদয়নের পদ্মাবতী হরণের কাহিনী খুবই সুখপাঠ্য। পঞ্চম ভাগ চতুর্দারিকায় সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে রাজপুত্র শক্তিভোগের বিজয়াভিযান ও রাজা বিদ্যাধরের রাজ্যে প্রবেশ করে চারজন সুন্দরী যুবতীকে হরণ। এখানে বিন্ধ্য পর্বতের প্রাকৃতিক বর্ণনা সত্যি উপভোগ্য। ষষ্ঠ ভাগে আছে বীর নরবাহন দত্তের সিংহাসন লাভের আগের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী। 'কথাসরিৎ-সাগরে'র বৈশিষ্ট্য রয়েছে মূল গল্পের সঙ্গে বহু সংখ্যক অন্য বিভিন্ন রকম ছোট গল্পের সুচতুর সংযোজন। গল্পগুলোর দাম শুধু সরল বর্ণনাভঙ্গী ও দুরূহ ভাব প্রবণতা অর্জনের চেষ্টায় যার জন্যে সেগুলো এতটা প্রিয় ও হৃদয়গ্রাহী। তবে এর দোষ হচ্ছে বিভিন্ন প্রকৃতির কাহিনীর প্রাচুর্যে অনেক সময় মূল কাহিনীকে হারিয়ে ফেলতে হয়। ('সংস্কৃতি সাহিত্যে গল্প', পৃঃ ৪৫-৬)

বুদ্ধ স্বামী রচিত 'শ্লোকসংগ্রহ'ও একই শ্রেণীভুক্ত একটি উঁচুদরের গল্প-গ্রন্থ। রচনা হয়েছিল নবম শতাব্দীতে নেপালে। এতে আছে আঠাশটি অধ্যায়ে চার হাজার পাঁচশ চব্বিশটি শ্লোক। প্রাচীন জাতীয় বীর গাথা লেখা হয়েছিল এতে সরল সংস্কৃত ভাষায়। বুদ্ধ স্বামীর রচনার বিশেষত্ব হচ্ছে অলঙ্কার-বর্জিত সরল শ্লোক প্রয়োগে সম্পূর্ণ কাব্যভাব ফুটিয়ে তোলা। সংক্ষিপ্ত কটি উপমার সাহায্যে একটা বিরাট ভাব ব্যক্ত করার অদ্ভুত ক্ষমতা আমরা পাই তাঁর গ্রন্থে। ('সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প', পৃঃ ৫৬)

শিক্ষামূলক নীতিযুক্ত গল্পগুলো অর্জন করেছে আরও বেশী লোকপ্রিয়তা। ...এরকম গল্পের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাধারণ জীবজন্তুর চরিত্রাঙ্কনে তাদের কথোপ-কথনের ভিতর দিয়ে গল্পাংশ সৃষ্টি করা।...যেটা ইংরেজি সাহিত্যে একটু পাওয়া গেছে ঈশপের 'ফেবলস'-এর মত গল্পগুলোতে।...জীবজন্তুর চরিত্র সৃষ্টি করে নীতিগত গল্প রচনার একটা কারণ আমরা পাই সমালোচকদের কাছে। গল্প-গুলোর রচনার যুগে ভারতবাসী প্রধানতঃ বাস করত মুক্ত গ্রাম্য আবহাওয়ায়। ...একই প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় পুষ্ট নানা শ্রেণীর জীব ও মানুষের প্রিয় হয়ে উঠেছিল...তাদের সহচর হয়ে পড়েছিল। মানুষের এইরকম জীবন যাত্রা প্রতিফলিত হয়েছিল তখনকার সাহিত্যে ও কাব্যে। ঋকবেদেও আমরা পেয়েছি

বর্ষারম্ভে ভেকের ডাক ঘোষণা করত ব্রাহ্মণদের পূজা উপাসনার সময়। উপনিষদেও আছে কুকুরের 'উদ্গীত' যা নির্দেশ দিত নাকি ঋষিদের তপ-জপের। তাছাড়া রাজনীতি ক্ষেত্রেও জীবজন্তুর চরিত্রের উপমার সাহায্য নেওয়া হত কূটনীতি সহজভাবে বুঝতে। সোনার বিষ্ঠাত্যাগী পাখীর গল্পের সাহায্যে বিদুরকে দেখা যায় ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিতে পাণ্ডবদের বিষয়। বৌদ্ধ জাতকেও পাওয়া যায় পশুপাখীদের গল্পের ভিতর দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের সহজ আলোচনা করতে। এইরকম যে সব নীতিগল্প অমরতা পেয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যে তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে 'পঞ্চতন্ত্রাখ্যায়িকা' ও 'হিতোপদেশ'। 'পঞ্চতন্ত্রাখ্যায়িকা' বা 'পঞ্চতন্ত্র' রচিত হয়েছিল সংস্কৃত ভাষায় যে ভাষা দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাজ-দরবারের ভাষা বলে পরিচিত হয়েছিল। এর রচয়িতা ছিলেন পণ্ডিত বিষ্ণু শর্মা।...রচনা সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যেও...মতদ্বৈধ। একদল বলেন, রচনার গোড়ায় যার প্রভাব ছিল সেটা হচ্ছে খৃষ্টপূর্ব তিনশ' অব্দের আগে কাশ্মীরি ভাষায় লিখিত তন্ত্রাখ্যায়িকা নামে গ্রন্থটি। আর এক দলের মতে এতে খানিকটা প্রভাব পাওয়া যায় কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'র। পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলো প্রধানতঃ 'তন্ত্রাখ্যায়িকা' থেকে নেওয়া। বিষ্ণুশর্মার কৃতিত্ব শুধু বৃহৎ আকারের গ্রন্থকে কৌশলে পাঁচটা ভাগে ভাগ করে মৌলিকতা বজায় রেখে একটা শিক্ষামূলক গ্রন্থ রচনার ক্ষমতায়। সরল গদ্যের সঙ্গে মাঝে মাঝে ছোট শ্লোকের প্রয়োগে সংস্কৃত গল্প রচনায় এ এক বিশেষত্ব...। শ্লোকগুলোর উৎস হচ্ছে প্রধানতঃ সংস্কৃত মহাভারত ও পালি ভাষায় রচিত জাতকের শ্লোক।...সংস্কৃত সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে তাই এ ইংরেজ টিপ্পনীকারদের কাছে 'texteus simpiicior' বলে পরিচয় পেয়েছে। 'হিতোপদেশে'র খ্যাতি 'পঞ্চতন্ত্রে'র পাশেই। 'হিতোপ-দেশ' আলাদা কোন গ্রন্থ নয়। পঞ্চতন্ত্রকেই পরিবর্তিত করে নতুন আকারে নতুন ভঙ্গীতে সাজাবার একটা চেষ্টা।...'হিতোপদেশ' রচনা করেন নারায়ণ তখনকার একজন বাংলাদেশের বড় পণ্ডিত ধবলচন্দ্রের সাহায্যে। ('সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প', পৃঃ ৪৮-৯)

মূল সংস্কৃত থেকে পঞ্চতন্ত্র অনূদিত হয়েছিল ৫৭০ খৃষ্টাব্দে সিরিয়া আরবী ভাষায়। অনেক পরে ১২৫২ সালে অনুবাদ করেছিলেন স্পেনের কোন পণ্ডিত। তারপর একে অনুবাদ করা হয় হিব্রু ভাষায়। হিব্রু থেকে ল্যাটিনে অনুবাদ করেন ক্যাপুয়ার জন সাহেব যার অনুবাদ আমরা পাই ইটালী ভাষায় ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে। তারই প্রথম ভাগটা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন

১৫৭০ খ্রীস্টাব্দে স্যার টমাস নর্থ।...ভারতীয় পণ্ডিতদের মতে ঈশপ প্রভৃতি সাহেবরা 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ' অনেকটা ধার করেছেন গল্প, ভঙ্গী ও চরিত্র সৃষ্টিতে। কবি কিপলিং-এর 'Jungle Book' নামে বিখ্যাত গল্পগ্রন্থে জীবজন্তুর চরিত্রাঙ্কন ও কথাবার্ত্তায় পঞ্চতন্ত্রের প্রভাব অনেকটা লক্ষ্য করা যায়। ('সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প', পৃঃ ৪৯-৫০)

গল্পগ্রন্থ হিসেবে 'বৃহৎ কথা' ও 'বেতালপঞ্চবিংশতি' শ্রেষ্ঠ স্থান নেয়। 'বৃহৎ কথা' রচনা করেন মহাপণ্ডিত গুণাঢ্য পঞ্চম শতকের গোড়ার দিকে।... অধিকাংশেই পৈশাচি ভাষা। পৈশাচি ছিল তখনকার বিন্ধ্য পর্বতের পার্বত্য জাতিদের জাতীয় ভাষা। এ ভাষা প্রয়োগে লেখকের পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায় এর সঙ্গে প্রাকৃত ভাষা সংমিশ্রণে, যার থেকে সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধটা পাওয়া যায় খুব কাছাকাছি। এর প্রভাব খানিকটা পাওয়া যায় কালিদাসের বিখ্যাত নাটক-গুলোতে প্রাকৃত সংলাপ প্রয়োগে।...মূল গল্পাংশে অনেকটা দেখা যায় রামায়ণের প্রভাব। রাজা নরবাহন দত্তের বীরত্ব জীবন নিয়েই এর বিষয়বস্তু। নরবাহন দত্ত...হাজির হল...বিদ্যাধরের রাজ্যে। সেখানে তিনি রাজকুমারী মদনমঞ্জুকাকে বিবাহ করেন। সে সময়ে মদনমঞ্জুকার রূপে আকৃষ্ট হয়ে দুষ্ট চরিত্র মানসবেগ রাজার শত্রুতা অর্জন করে, যেমন রামায়ণে দেখা যায় রাবণ আকৃষ্ট হন সীতার প্রতি। সীতার মতই মদনমঞ্জুকাকে লেখক দেখিয়েছেন সতী সাধ্বী করে। রাজা নরবাহন দত্তের বিবাহোত্তর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জীবন অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে। মদনমঞ্জুকার চরিত্রেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব স্পষ্ট করে দেখান হয়েছে। তাই কজন টিপন্নীকার মন্তব্য করেছেন 'বৃহৎ কথা'য় গুণাঢ্য বৌদ্ধ ধর্মই প্রচার করেছেন বেশী করে।...পরবর্তী কালের নাট্যকারবাও তাঁর কাছে যথেষ্ট ঋণী। আমোদকারক গল্প হিসেবে 'বৃহৎ কথা'র পরই আসে 'বেতাল পঞ্চবিংশতিকা'। 'বৃহৎ কথা' গদ্য ও পদ্যে। 'বেতালপঞ্চবিংশতিকা' প্রধানতঃ সরল গদ্যে।... শিবদাস লেখক ছিলেন। · গল্পগুলো সরল সংস্কৃত ভাষায়।...পঁচিশটি গল্প পর্যায়-ক্রমে সাজান।...মহারাজ বিক্রমাদিত্য শ্মশানে মৃতদেহ আনতে গিয়ে প্রেতাত্মার অদ্ভুত গল্পের অবতারণায় তাঁকে বিব্রত করার কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী নিয়েই 'বেতালপঞ্চবিংশতি'। এর সঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে 'শুকসপ্ততি' গল্পগ্রন্থের। রচয়িতা ও রচনাকাল অজ্ঞাত।...অনেকটা প্রভাব 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র। ('সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প,' পৃঃ ৫০-৫২)

ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের ক্ষেত্রেই বা টলস্টয়ের War and Peace

বা ডস্টয়ভস্কির Brothers Karamozov-এর মত উপন্যাস কোথায়
('সাহিত্য ও সমাজ,' পৃঃ ৫৯)

শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ বইগুলির রচনা যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেচে তখন বাংলা সাহিত্যে একটি আন্দোলন শুরু হোল, এই আন্দোলন অতি উগ্রভাবে ব্যষ্টি-কেন্দ্রিক। 'কালিকলম' ছিল এই আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দিগের অন্যতম মুখপত্র। ('সাহিত্য ও সমাজ', পৃঃ ৬০)

চাই নির্জনতা, খৃষ্টের চল্লিশ দিনের নিঃসঙ্গ অবকাশ, বুঝবার ও বোঝাবার প্রয়াসে তপস্যা। ('সাহিত্য ও সমাজ', পৃঃ ৬২)

এই শীতের নির্জন অপরাহ্নে ছন্নছাড়া দরিদ্র সরাইখানা ও সরাইওয়ালীর দুঃখময় জীবন আলফাঁস দোদের মনে যে করুণ অনুভূতি যে ব্যথা ও বেদনাবোধ জাগিয়েছিল, আমাদের মনেও সেই জীবনের ছবিটি রেখাপাত করে গেল, কারণ লেখকের অনুভূতি তাঁর তপস্যাভূমি সেই সরাইখানার প্রাঙ্গণে একটি শীতের সন্ধ্যায় জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। ('সাহিত্য ও সমাজ', পঃ ৬২)

স্বপ্নের ফেরিওয়ালা

স্বপ্নই তো। খোদ বিভূতিভূষণের মুখের কথা। সাহিত্য তো স্বপ্নই; স্বপ্নোত্থিতের আরাম, সংসারীর শান্তি। সংসারে আর এক কিশোর যে এখনও মুগ্ধ হয়, বাল্যপ্রেমের স্মৃতিতে বিহ্বল বোধ করে, ভবিষ্যেরই ভাবনায় একান্ত নবীন হয়ে ওঠে, মানুষেরই দুঃখে অবসন্ন বোধ করে—সাহিত্য তো সেই শাপভ্রষ্ট দেবতারই আরোগ্যনিকেতন। বিভূতিভূষণের কথায়, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অল্প-বিস্তর এমন এক মানুষ আছে যে স্বপ্ন দেখে, ক্ষণিকের জন্যে হলেও আদর্শ-বাদের তীব্র প্রেরণা অনুভব করে, স্মৃতির স্মরণে সহসা উন্মনা হয়, ভবিষ্যতের কল্পনায় নেশার মত আসক্ত হয়—রসসাহিত্যের একটি প্রধান কাজ হচ্ছে প্রত্যেকের ভেতরকার এই স্বপ্নালু মানুষটির তৃপ্তিবিধান করা।

স্বপ্নের এই তৃপ্তিই বিভূতিভূষণের সাহিত্যের সবচেয়ে বড় মৌলিকত্ব। যাবার সময় বলেছিলেন, আমার কথা যখন লিখবেন, লিখবেন আমার কোন সাধই অপূর্ণ নেই। আমি জীবনে তৃপ্ত। তাঁর সাহিত্যেও কি আমরা সেই একই তৃপ্তি, একই স্বপ্নের আরাম পাই না যা পথের পাঁচালী থেকে ইছামতী পর্যন্ত, 'উপেক্ষিতা' থেকে 'কুশল পাহাড়ী' পর্যন্ত ব্যাপ্ত, ওতপ্রোত?

পথের পাঁচালীর যে পথ নিশ্চিন্দিপুরে অপুর নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে শুরু হয়েছিল বা বলতে পারা যায় তারও আরও আগে 'বল্লালী বালাই' থেকে—সেই পথ শুধু পথের পাঁচালীতেই প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালায়, অপু-দুর্গার চাপল্য-সাহচর্যে কী রোমান্সে ভরপুর! অপরাজিততেও তো তাই। মনসাপোতা থেকে দেওয়ানপুর, কলকাতা থেকে অমরকণ্টক হয়ে আবার নিশ্চিন্দিপুর পর্যন্ত সেই পথ স্বপ্নে-প্রজ্ঞায় কী অভিনব, জীবনব্যাপী! আরণ্যক-এও তাই। বিস্ময়ারণ্যেরই ধারে সংকুচিত শহুরে সত্যচরণ যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল, স্বপ্ন দেখছিল। শীতের বিকেলের বি. এন. আরের এক অখ্যাত স্টেশন থেকে ফোর্ট উইলিয়মের সামনে বাদাম গাছের ছায়ায় আর এক অপরাহ্ণ পর্যন্ত সে স্বপ্ন ব্যাপ্ত, বিসর্পিত। যেন কৈশোরেরই সেই কবিতা। Under the greenwood tree who loves to lie with me। আরণ্যক-এর সারা রাজ্য জুড়ে যুবক সত্যচরণের আর এক দ্বিতীয় কৈশোর—অনাঘ্রাতা ভানুমতীর কিনারায় যেখানে মহালিখারূপের পাহাড়, ফুলকিয়া বইহার, লবটুলিয়া,

প্রাগৈতিহাসিক রাজসমাধি স্বপ্নেরই ছায়াছবির মত উপস্থিত হয়, স্বপ্নেরই মত প্রত্যাবর্তনের দিবালোকে আবার বিলীন হয়। ইছামতীতেও তাই। শুধু একটি মানুষের নয়, শুধু ভবানীচরণের নয়, ইছামতীর তীরে যে গ্রাম্য নরনারী তাদের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, আনন্দ বিরহ নিয়ে যুগে যুগে জীবনপ্রবাহ রচনা করে ইছামতী সেই জনপদহৃদয়েরই স্বপ্ন। বিভূতিভূষণের ভাষায়, 'অপূর্ব জীবনপ্রবাহের ইতিহাস · বননিকুঞ্জের মরা বাঁচার ইতিহাস…কত সূর্যোদয়… সূর্যাস্তের নিষ্কিঞ্চন শান্ত ইতিহাস।'

এই স্বপ্ন নিয়েই তো তিনি সাহিত্যে এসেছিলেন। তাঁর প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা'র বিমল ও বৌদি আসলে তো স্বপ্নেরই ভাইবোন। বাঙলাদেশের পাড়াগাঁ, সেখানে দুই অনাত্মীয় যুবক-যুবতীর নিয়তদর্শন। চরিত্রহীনতার এত বড় বিভ্রম, আশঙ্কা পাঠকচিত্তে কি প্রতি মুহূর্তে উদ্যত হয়ে থাকে না? শুধু গল্প বলেই, শুধু স্বপ্ন বলেই তারা হয়ত রেহাই পায়। পাঠকও মমতার স্বপ্ন-বিভ্রমে হয়ত বা পথ হারায়। স্বপ্নশেষেও আরবসমুদ্রের অপরাহ্নে এই পরিত্যক্তা উপেক্ষিতাকে নিয়ে বিমলের আর এক স্মৃতির স্বপ্ন—বাস্তবের চেয়ে যা গাঢ়, মোহময়। সেই মোহই ভৈরবথানের সাধুর। পরিদৃশ্যমান পৃথিবী তাঁর মুগ্ধনেত্রে দ্যুলোক-ভূলোকের মহাশিল্পীরই এক স্বপ্ন। 'কবিই তিনি বটেন বাবা।…এই শালগাছটাতে ফুল ফোটে, বর্ষাকালে পাহাড়ে ময়ূর ডাকে, ঝর্ণা দিয়ে জল বয়ে যায়, তখনই ভাবি, কবিই বটে তিনি।'

বিভূতিভূষণের সমগ্র সাহিত্য জুড়েই এই কবিতার স্বপ্ন। তাঁর সাহিত্য আসলে স্বপ্নেরই এক মায়ারাজ্য। কিন্তু কোনক্রমেই একা বিভূতিভূষণের নয়। স্বপ্নলোকের চাবি তিনি সৎ সাহিত্যিকের মতই সবাইকে দিয়ে গিয়েছেন। তিনি শুধু স্বপ্নের রাজা নন, ফেরিওয়ালাও।

সাহিত্যে তাকেই আমরা বলি বাস্তবে পাওয়া, বাস্তবায়িত করে পাওয়া। নিজেরই একটি দিনলিপিতে এতদূরও লিখেছিলেন, সাহিত্যে না হলেও চলবে, শুধুই লিখে রেখে যেও তোমার দুঃখের অকৃত্রিম অনুভব, তুমি অমরতা পাবে। মানুষের নির্ভর হবে। তাঁর ভাষায়, 'জীবনে যদি বড় দুঃখ পাও, দুঃখ লিখে রেখে যেও উত্তরকালের জন্য। Sincere দুঃখের কাহিনী চিরদিন অমর থাকবে, তা চিরদিন লোকের মনে বল দেবে।'

সত্যি বলতে কী, অমরতার চেয়ে বড় বাস্তবতা পৃথিবীতে আর কী আছে? আরও সহজ করে বলতে পারা যায়, অনুভবের চেয়ে বড় বাস্তবতা কী? স্বপ্নের চেয়ে বড় সত্যি আর কী থাকতে পারে? বলাই বাহুল্য, তা স্বপ্নই,

হিস্টিরিয়া নয়। বাস্তবায়িত করা তার অনেক পরের কথা। স্বপ্নের সে টেকনোলজি, প্রাণের সে অ্যানাটমি।

দিনলিপিতে যে গভীর sincerityর কথা বিভূতিভূষণ বলেছিলেন, তাঁর সাহিত্যের সবচেয়ে বড় জোর সেই sincerityর জোর। বিভূতিভূষণের সাহিত্যের সবচেয়ে বড় বাস্তবতা তাঁর এই ঐকান্তিক আন্তরিকতা। আর শুধু তাঁর সাহিত্যের কেন সমস্ত কালজয়ী সাহিত্যেরই তো সবচেয়ে বড় গুণ এই অকৃত্রিম উপলব্ধি। যা আপন স্বভাবে অল্পও নয়, অতিও নয়—পর্যাপ্ত, পূর্ণ। কথা সেখান থেকেই ক্ষরিত হয়। সব রূপ সেই রূপানুভবেরই।

বিভূতিভূষণের দিনলিপি আর সাহিত্য এক এক জায়গায় এত ঘনিষ্ঠ যে সহসা মনেই করতে পারা যায় না, জায়গাটা কোথাকার। উনি নিজেও দু জাতের লেখার কথা বলতেন। একটা ফরমায়েশি, আর একটা সাহিত্যের। এই শেষ জাতের লেখার জন্যে তিনি দীর্ঘদিন ধরে নোট নিতেন, পরিকল্পনা করতেন। নোটে এবং লেখাতে এক এক জায়গায়, ভাবে তো বটেই, ভাষায় পর্যন্ত এত মিল যে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। তাঁর অন্যতম দিনলিপি তৃণাঙ্কুর যখন লিখছেন তখন অপরাজিত লেখা হয়নি, কিন্তু নোট নেওয়া চলেছে। পাশাপাশি রাখলে বুঝতে পারা যায় এ দুইয়ের মিল কত হুবহু; মানুষ আর শিল্পী বিভূতিভূষণ কত কাছাকাছি, অবলম্বী।

অপরাজিত-এর শেষে অপুর সেই অসীমানুভূতি—'আজকাল নির্জনে বসিলেই তাহার মনে হয়, এই পৃথিবীর একটা আধ্যাত্মিক রূপ আছে, এর ফুলফল আলোছায়ার মধ্যে জন্মগ্রহণ করার দরুন এবং শৈশব হইতে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে আবদ্ধ হওয়ার দরুন, এর প্রকৃত রূপটি আমাদের চোখে পড়ে না। এ আমাদের দর্শন ও শ্রবণগ্রাহ্য জিনিসে গড়া হইলেও আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও ঘোর রহস্যময়, এর প্রতি রেণু যে অসীম জটিলতায় আচ্ছন্ন—যা কিনা মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত, এ সত্যটা হঠাৎ চোখে পড়ে না।'

তৃণাঙ্কুর-এ সেই অনুভূতিরই নোট। 'একটা কথা আজকাল নির্জনে বসে ভাবলেই বড় মনে পড়ে। এই পৃথিবীর একটা spiritual nature আছে, আমরা এর গাছপালা, ফুলফল, আলোছায়া, আকাশবাতাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেচি বলে, শৈশব থেকে এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ বলে এর প্রকৃত রূপটি ধরা আমাদের পক্ষে বড় কঠিন হয়ে পড়ে। এই অপূর্ব সৃষ্টি যে আমাদের দর্শন ও শ্রবণ-গ্রাহ্য বস্তুসমূহ দ্বারা গঠিত হয়েও আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও ঘোর রহস্যময়, এর প্রতি অণু যে অসীম সম্ভাব্যতায় ভরা, মানুষের বুদ্ধি ও

কল্পনার অতীত এক জটিলতায় আচ্ছন্ন, তা হঠাৎ ধরা পড়ে না।'

কী পথের পাঁচালী-অপরাজিত-ইছামতী, কী 'মেঘমল্লার-পুঁইমাচা-কুশল পাহাড়ী' বিভূতিভূষণ কোথাও বানান বা অবিশ্বাস্য নন, কৃত্রিম নন। আর এই গুণেই সাধারণ পাঠক বিভূতিভূষণকে এত ভালবাসেন। বিভূতিভূষণের সাহিত্যের মৌলিক বাস্তবতা তাঁর মর্মমূলের বাস্তবতা, জীবনের উপলব্ধির বাস্তবতা। জোর করে তিনি কিছু হওয়ান না বা গড়ে তোলেন না। হওয়া বা গড়ে ওঠা বিষয়ই যা জীবনে স্তম্ভিত হয়ত বা বিস্মৃত হয়ে আছে বিভূতিভূষণ তাকেই মনে করিয়ে দেন। কে জানে বা বিস্মরণই যখন স্বভাব হয়ে ওঠে তখন এমনতর মানুষকেই আমরা অসম্ভব বলি, অবিশ্বাস করি। মানুষের বন্ধুকেই দরজা থেকে ফিরিয়ে দিই। কিন্তু সে তো অবুঝের কথা, সাহিত্যের নয়।

পথের পাঁচালী পড়ে রবীন্দ্রনাথও এই একই কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, বইটি দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে। মন ভোলাবার জন্যে কোথাও সস্তা রাঙতার সাজ পরান হয়নি। বিভূতিভূষণও বলেছিলেন, শৈশবস্মৃতির পুনরাবৃত্তি করছি। পড়তে পড়তে আমাদেরও কি মনে হয় না, পথের পাঁচালী পাঠকেরও একদা যাপিত সুখশৈশবেরই স্বপ্ন? কৌতুকে-জীবনাভাসে সবারই বুকের মাঝখানে যে কল্পনাপ্রবণ শিশু লুকিয়ে আছে পথের পাঁচালী তারই কথা, তারই বিকাশ? এমন মানুষ কি আছে যার শৈশব কখনও কৌতূহলে-চাপল্যে, দুষ্টুমি-নষ্টামিতে, রোমান্সে-কল্পনায় কাটেনি—আরও সহজ কথায় জীবনে যে কখনও স্বপ্ন দেখেনি, শৈশবের বনে পথ হারায়নি? সম্ভবতঃ নেই :বলেই বোধ হয় পথের পাঁচালী আমাদের কখনও অবাস্তব লাগে না, অপরিচিত বোধ হয় না, ফুরিয়ে যায় না। সেই নিশ্চিন্দিপুরের নীলকুঠির মাঠ থেকে মাঝেরপাড়া স্টেশন পর্যন্ত কী পরিব্যাপ্ত মানবশিশুরই স্বপ্নরাজ্য, তার শ্যামলঙ্কার দেশ! কোন ভাগ্যহত শিশু সে রাজ্যের বনে-উপবনে কখনও বেড়ায়নি, নির্বাসনের নসট্যালজিয়ায় পীড়িত হয়ে পড়েনি? মোহিতলাল বলেছিলেন, মশায় কী করেছেন মাঝেরপাড়া ডিসট্যাণ্ট সিগন্যাল নিয়ে?

অপরাজিততেও তো তাই। স্বপ্ন সেখানে প্রজ্ঞায়, বাস্তব সেখানে এক পরাবাস্তবে পরিণত হয়েছে। জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ সব কিছুই সেখানে গিয়ে চরিতার্থতা পায়, সার্থক হয়। অমরকণ্টকের পথে যেতে যেতে দুর্গা-সর্বজয়া-অপর্ণা হারান অপুর সেই অনুভূতি 'যে জগৎকে আমরা প্রতিদিনের কাজকর্মে হাটে-ঘাটে হাতের কাছে পাইতেছি জীবন তাহা নয়'—আমাদের কাছে কি খুব অপরিচিত লাগে? অথবা রোমাঞ্চকর সেই পৃথিবীর চিঠি, 'ভাই

প্রণব, আজ বুঝি, জীবন খুব বড় একটা রোমান্স'—সত্যিই কি খুব আবশ্যক? আসন্ন সন্ধ্যায় ইছামতীর ধারে অপুর সেই অবিস্মরণীয় অনুভব, 'বৃহত্তর জীবনচক্র কোন্ দেবতার হাতে আবর্তিত হয় কে জানে?'—সত্যিই কি আমাদের অনুভবে অদেখা লাগে?

ইছামতীতেও তো তাই। নিজেই লিখেছিলেন, একটা উপন্যাস লিখব—মহাকাল হবে পটভূমি, গ্রাম্য নরনারী নায়ক-নায়িকা। বিভূতিভূষণের সবচেয়ে প্রিয় থীম। সাহিত্যে তো বটেই, চিঠিতে-ডায়েরিতেও তাকে ঘিরে কী বিস্ময়! মোহিতলালকে লিখেছিলেন, আমার উপন্যাসের বক্তব্য vastness of space and passing time; দিনলিপিতে লিখেছিলেন, আমি শুধু কৌতূহলাক্রান্ত মহাকালের মিছিলে। সেই মহাকালকে আমরা ইছামতীতে কি কিছু কম দেখি? কম অনুভব করি? শিপটন সাহেবের ভয়ে পানের বোঝা মাথায় যে নালু পাল সদর রাস্তা থেকে নামাল জমিতে পালাত, সেই একদিন ব্যবসায়ী লালমোহন পাল হল। সাহেবের লোক তারই কাছে নীলকুঠি বন্ধক রাখার প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হলেন। জমজমাটের দিনে কুঠির যে কবরখানা থেকে সিঁদুর পড়লে তোলা যেত আজ সেখানে উলুখড়ের ঝাড়। কালের কী পরিবর্তন! বুঝতে কারও অসুবিধে হয়, অবিশ্বাস্য লাগে?

বিভূতিভূষণের গল্পে-উপন্যাসে এমনি করেই এক অনুভবের জোর, এক অন্তর্নিহিত বাস্তবতা রচনার মর্মমূলে রয়ে গিয়েছে। 'পুঁইমাচা' থেকে 'কুশল পাহাড়ী' পর্যন্ত তার কোথাও বিরাম নেই, ছেদ নেই। অসহায় এক দরিদ্র মেয়ের সামান্য লোভ থেকে আকাশ-পৃথিবীর গায়ে সেই মহাশিল্পীর ছবি—কিছুই আমাদের অপরিচিত লাগে না, অদেখা লাগে না। কারণ বিভূতিভূষণ তাকে দেখেছেন। শুধু চোখে বা চোখ মেলে নয়। কারণ স্বপ্ন কি ঐভাবে দেখা যায়? তাকে অনুভবে-উপলব্ধিতে আমরা বাস্তব করে পাই। কোনটাই তো কম সত্যি নয়। কে জানে বা পরের সত্য হয়ত পরাসত্য। কারণ তাকে দেখতেও সময় লাগে এবং তা বেশি সময় ধরেও দেখা যায়। তা সত্যের নেহাৎই শরীর নয়, মর্মও। বদলাতে বা ক্ষয় হতে সময় লাগে। মরমের আরও বড় অধিকারীর জন্যে তাকে অপেক্ষা করতে হয়। এলেও পুরো মিথ্যে হয়ে যায় না। কারণ তার অনুভবের ঘরে কোথাও অন্যমনস্কতা থাকলে চলে না, শরীরী ক্ষেত্রে একটুও অহৈতুক হওয়ার জায়গা নেই।

এমন কম-বেশি গাঢ়তার উদাহরণ কি অপরাজিত আর ইছামতী নয়? দুটি উপন্যাসেই সেই একই অসীমানুভূতি। অপরাজিততে 'মহাকালের বীথিপথ',

ইছামতীতে 'মহাসমুদ্রের তীরহীন অসীমতা'। একই স্বপ্ন। তবু অপুর তুলনায় ভবানীচরণকে কি আমাদের একটু কম রক্তমাংসের, একটু কম আপন লাগে না? লাগারই কথা। কারণ অপরাজিত বিভূতিভূষণের গোড়ার দিককার এবং ইছামতী শেষদিকের লেখা। যে অসীমানুভূতি বিভূতিভূষণের উপন্যাসের প্রিয় থীম তা উপলব্ধির প্রথম দিনগুলিতে যতখানি রক্তাক্ত এবং সমুদ্ভূত, শেষের দিকে তা অনেক স্বস্তির এবং সাব্যস্ত ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। জীবনের গোড়ার দিক অর্থাৎ প্রথমা স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যু, উদ্‌ভ্রান্তের মত অজ্ঞাতবাস, ইসমাইলপুর-আজমাবাদের জঙ্গলমহালে নির্জনবাস—বন্ধন-মুক্তির আর্তনাদ ও আনন্দ অস্তিত্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখন মেশান। ইছামতী লেখার সময়ে বিভূতিভূষণ কোলাহলময় কলকাতা থেকে গ্রামাস্কুলে দীর্ঘকাল কর্মরত, ব্যক্তিগত জীবনেও সুদীর্ঘকাল সংসারে সমাসীন। শান্তিতে-সান্ত্বনায় তখন তিনি অনেক বেশি অনুদ্বিগ্ন, আধ্যাত্মিক। অপুর সঙ্গে ভবানীচরণের পার্থক্য কি এই দুই বিভূতি-ভূষণেরই পার্থক্য নয়? অপু, ভবানীচরণ দুজনেই অনন্তসন্ধ। তবু অপুর অনন্তের সঙ্গে সান্তের অনেক শোক ও সান্ত্বনা, ফলে বিশ্বাসও মেশান আছে। কিন্তু ভবানীচরণের অনন্ত অনেকখানিই অসংসারী ও আদর্শসুলভ। তার কারণ বিভূতিভূষণের অপু অনেক বেশি শরীরী অনুভব, ভবানীচরণ সশরীরেও নিশ্চিন্ত দার্শনিক। অপুর যন্ত্রণা আছে। সেই সঙ্গে এক অতিক্রান্ত, অভিমুখী রহস্যরসে সে আত্মহারা। ভবানীচরণে রহস্য আছে, সেই সঙ্গে তার ব্যাখ্যাও আছে। সহজ কথায়, বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে অপু অনেক গাঢ়, আয়তনিক; ভবানীচরণ একমাত্রিক, সমতলীয়। অপু জীবনেরই মত অনেক বেশি রূপবান। আর সেই কারণেই পাঠকের তাকে ভাল না লেগে পারে না।

সাহিত্যের রূপ আসলে এই রূপানুভবেরই রূপ, উপলব্ধিরই আকার। এবং তা জীবনের সুদূরকে নিয়েও হতে পারে, অদূরকে নিয়েও। কথায় কথায় যাকে আমরা বলি স্বপ্ন আর বাস্তব, near আর remote। যে পার্থক্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিভূতিভূষণের। তবু দুজনেই সত্যি। আর সে সত্যি বিষয়বস্তুর বাইরের রূপে নয়। তাদের অনুভবের বা উপলব্ধির বাস্তবতাতেই। সাহিত্যের রূপ বা আকার এই অনুভব বা উপলব্ধি থেকেও ঠিক নয়, বরং অনুভব ও উপলব্ধির সঙ্গেই ওতপ্রোত; অঙ্গাঙ্গী। রূপ সাজিয়ে কেউ কি কখনও উপলব্ধিতে পৌঁছয়? বলার কথা নেই অথচ শুধু কথা সাজিয়ে কেউ কি কখনও অনুভবের বক্তব্য বলতে পেরেছে? আবার উল্টোটাও। কবির রূপানুভূতি আছে অথচ রূপসৃষ্টি নেই, অভিজ্ঞতার উপলব্ধি আছে অথচ জীবন নেই? হয় নাকি?

হলে জানতে হবে নিশ্চয়ই কোথাও পরিমাপের বা যথাযথের অভাব ঘটেছে যা শিল্পসৃষ্টির সবচেয়ে বড় অন্তরায়।

বিভূতিভূষণের সাহিত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক স্বপ্নসম্ভব সৃষ্টি। এক স্বপ্নেরই বাস্তবতা, কল্পলোকেরই মাটি। আটপৌরে ভাষায়, বিভূতিভূষণের সাহিত্যে এমন এক সহজ আন্তরিকতা, এক গভীর উপলব্ধি আছে যা পাঠকের ভাল না লেগে পারে না। তবে নিশ্চয়ই তার কম-বেশি আছে। কিন্তু তা উপলব্ধিরই কম-বেশি। আর তার কারণও বোধ হয় দার্শনিক লেখকদের অবাধ্য অসুবিধে। সেই অসুবিধে প্রৌঢ় বিশ্বাসের বা দর্শনারূঢ়ির যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহিত্যে জীবনকে কমজোরি করে আনে। এবং সে সব ক্ষেত্রে এই ধরণের লেখা যতখানি দর্শনের হয় ততখানি জীবনদর্শনের হয় না। বিচ্ছিন্নভাবে হয়ত ভাল লাগে। কিন্তু জড়িয়ে তেমন জোরাল বা জীবিত হয় না। যদিও জীবনের বরাদ্দেই তারা রচিত হয়। তবু সে সব ইতিহাস সাহিত্যের সাজঘরেই থেকে যায়। সহৃদয় সব জানেন - এমন আত্মবিশ্বাসেই দার্শনিক লেখকরা লিখতে শুরু করেন। কথা ঠিকই। হৃদয়বান মানুষ অনেকটাই জানেন, কিন্তু তবু তাঁকে মনে করিয়ে দিতে হয়। দর্শনবিহারী সাহিত্যে এই মনে করিয়ে দেওয়া, দেখিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা খুবই কম থাকে। আরও সাধারণ কথায়, দর্শন মানুষের অপরিচিত বা অপছন্দ নয়, কিন্তু সেখানে আমরা অনেক অনুকূলতা-প্রতিকূলতায় গিয়ে পৌঁছই। দর্শন অনুভবের সেই হচ্ছে অবয়ব বা শরীর। তাকে বাদ দিয়ে পুরো প্রসঙ্গটাই সাধারণ পাঠকের কাছে অনতিক্রম্য, ঔৎসুক্যহীন ব্যাপার হয়ে থাকে। যে ঔৎসুক্যহীনতা কিছুটা ভবানীচরণকে নিয়ে, জিতুকে নিয়ে—বিভূতিভূষণের তাবৎ ভালমানুষ দার্শনিকদের নিয়ে।

অথচ তারই পাশে পথের পাঁচালী-অপরাজিত-আরণ্যক, 'মেঘমল্লার-কুশল পাহাড়ী'র জন্যে বিভূতিভূষণের পাঠকের কী অসীম আগ্রহ! এইসব লেখা কী রূপবানী! রূপের কী অজস্র সমারোহ! সেই বেলাশেষের কুঠির মাঠে নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে যাওয়া থেকে শুরু করে প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালায়, রেললাইন দেখতে যাওয়ার গোপন অভিযানে—অপুর স্বপ্নানুভবের কী বিচিত্র রূপসৃষ্টি। একালের এক মানুষের কথায় 'কল্পনার বিকাশ অপুর ক্রমাভিব্যক্তির প্রধান কথা'। অপরাজিততে রোমান্সে-বাস্তবে, বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে, শোকে-সান্ত্বনায়, ব্যর্থতায়-উত্তরণে গভীর জীবনানুভবের কী মোহময় অবয়ব! আরণ্যক-এও তাই। নির্বাসিত শহুরে সত্যচরণের জন্যে ফাল্গুনী পূর্ণিমার ছায়াবিহীন জ্যোৎস্নায়, ভানুমতী-যুগলপ্রসাদে অরণ্যের কী মোহন আয়োজন! রোমান্টিক নভেলের

মতই সে রূপ শিথিল, অসংবদ্ধ কিন্তু এক গভীরতর তাৎপর্যে অতি ইঙ্গিতময়, দূরাবধি। গল্পেও তাই। প্রদ্যুম্নের প্রেম কখন কলালক্ষ্মীর বন্ধন মোচনে চির-নিবেদিত। বালিকার মুখ কখন নাস্তিক লোকনাথের চিরআশ্বাসরেখা হিশেবে দেখা দেয়। সামান্য ফুলেল তেলের দানে বিশ্বের এত গন্ধ সুবাসিত হয়। বিভূতিভূষণের এইসব গল্পে-উপন্যাসে মনে হয় রূপ যেন একান্তই রূপানুভবের বুকের পাশে। শুধু চোখ মেলার অপেক্ষা। এত অনায়াস, এত নিরন্তর, এত আপন!

ভাষাও সেই রূপানুভবের বুকের ভাষা। অনুভবের মতই অকৃত্রিম, অনুভবের স্বভাবের মতই স্বপ্নাচ্ছন্ন, সুদূর। দোষও আছে। ব্যাকরণিয়া কেন, সাধারণ মানুষও ধরতে পারে! একঘেয়েমি আছে, পুনরাবৃত্তি আছে, খুঁজলে পাতলে আরও দু চারটে ত্রুটি। তবু সর্বোপবি প্রাণেরই মত বড় সাবলীল, সতেজ, স্বপ্নময়।

: কোথায় কোন্ দুটি বালক বালিকা এক ক্ষুদ্র গ্রামের গ্রামসীমায় বুনো খেজুরের ঝোপে ঝোপে তলায় পড়া খেজুর কুড়িয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছে···সময়ের দীর্ঘ পাষাণ অলিন্দের দূরতম সীমায় তাদের ছোট্ট ছোট্ট পা গুলির অস্পষ্ট শব্দ ক্রমেই অস্পষ্টতর হয়ে আসছে ··ওধারে তারা দুটিতে ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে···

এক গ্রাম্য বনের মৌ গাছের ডাল থেকে দুজনে মৌ ফুল পেড়ে খাচ্ছে, বালিকাটি ভাল রসাল ফুল পেলেই বালকের হাতে তুলে দিচ্ছে, এই যে এটি, কি মিষ্টি দেখ, বরং দেখ তুমি খেয়ে···

নীলব্যোম-পথে দীর্ঘদেহ, শ্বেতশ্মশ্রু, সমিধ্‌বাহী, জ্যোতির্ময় ঋষিরা চলেছেন —তাদের মধ্যে কে যেন পেছন ফিরে সঙ্গীদের নিকট প্রস্তাব করছেন—ওহে সঙ্গীগণ, আমাদের কমণ্ডলু যা দিয়ে পূর্ণ করেছি, এস তা ফেলে দিয়ে পুনর্বার নূতন জল সংগ্রহ করি ··এতদিন ভ্রমণের পর মিষ্টি জলের উৎসের সন্ধান পেয়েছি ···তাদের কমণ্ডলু থেকে কালীগোলার মত কি ঝরে পড়ছে।

পথের বাঁকে একদিনের মেঘভরা বৈকালে মেয়েটিকে কে খুব মেরেছে, তার এলোমেলো চুলগুলি মুখের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—কাপড় কে টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে—সে কেঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলছে—কেন তুমি মারবে? কেন আমায় মারবে তুমি?···এ পাড়ায় আসি বলে!···আর কক্‌খনো আসব না···দেখে নিও, আর কক্‌খনো যদি আসি···

লোকনাথের মরণাহত দৃষ্টি বিরাট বিশ্বের উপর সেইভাবেই মুগ্ধ, আবদ্ধ রইল, বহু বৎসর পূর্বে শৈশব কালে গ্রামবাসীর মাঠে তাঁর অজ্ঞান শিশুনয়ন দুটি

যে ভাবে আবদ্ধ রইত···প্রায়ান্ধকার জগৎটা আবার একটা বিরাট প্রশ্নের রূপ পরিগ্রহ করে·তাঁর মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে রইল···প্রশ্নের কোন উত্তর তাঁর কাছে পাওয়া গেল না··· ।

অথবা পথের পাঁচালীর উদাসী বাউলের মত সেই অবিস্মরণীয় পথ !

: সোনাডাঙার মাঠ এ অঞ্চলের সকলের বড় মাঠ। এখানে ওখানে বনঝোপ, শিমুল, বাবুল গাছ, খেজুর গাছে খেজুরের কাঁদি ঝুলিতেছে, সোঁদালি ফুলের ঝাড় ঝুলিতেছে, চারিধারে বৌ-কথা-কও পাপিয়ার ডাক। দূরপ্রসারী মাঠের উপর তিসির ফুলের রং-এর মত গাঢ় নীল আকাশ উপুড় হইয়া পড়িয়াছে, দৃষ্টি কোথাও বাধা মানে না, ঘন সবুজ ঘাসে মোড়া উঁচু নীচু মাঠের মধ্যে কোথাও আবাদ নাই, শুধুই গাছপালা বনঝোপের প্রাচুর্য আর বিশাল মাঠটার শ্যাম-প্রসার, সম্মুখে কাঁচা মাটির চওড়া পথটা গৃহত্যাগী উদাসী বাউলের মত দূর হইতে দূরে আপন মনে বাঁকিয়া চলিয়াছে।

বিভূতিভূষণের হিশেবের খাতা

ভাবতেই মজা লাগে, বিভূতিভূষণ সুবর্ণরেখার ধারে শালবনে বসে হিশেবের খাতা লিখছেন!

১৯৪১ সনের হিশেব।

প্রবাসী থেকে কত পেলেন? দেশ থেকে কত? কত সুদ হল? সবসুদ্ধ জড়িয়ে কী দাঁড়াল?

'মোট দু হাজার নশো ছিয়াশি টাকা ড আনা মাত্র। অতএব এই সালের মাসিক আয় গড়ে ২৪৮৸/০ আনা মাত্র। ঘাটশিলা। সুবর্ণরেখা তীরের শালবন। সকালবেলা।'

সবচেয়ে মজার শেষ দুটো লাইন। নির্মল, সুগন্ধি, বালকবৎ। বিভূতিভূষণের সেই অতি প্রিয় মনোভাব, The play is the thing।

অত্যন্ত ঘোরতর সংসারীর মত বিভূতিভূষণ হিশেব রাখতেন। নইলে ভাবুন, সম্ভ বিবাহিতা স্ত্রী; তাঁকে লিখছেন, Time is money with me now। রাত্রে গিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করব।

'একটা কথা লিখি আমার চাকুরী ছাড়া সম্বন্ধে। ভাল করে বিবেচনা করে দেখলাম চাকুরী ছাড়াই আমার পক্ষে সঙ্গত।···বারাকপুর সস্তার জায়গা এবং কলকাতার নিকটে। ওখানে বসে লিখলে এবং কলকাতার বইয়ের দোকান দিলে আমার যা আয় হবে তা বর্তমান আয় অপেক্ষা কম নয়।···আমি হিসেব করে দেখলাম রোজ যদি ৩ পাতা লিখি তবে ৩৬০ দিনে (এক বছর) আমি লিখবো ৩×৩৬০=১০৮০ পাতা। ৪ খানা বড় উপন্যাস। সেই জায়গায় বাদ দিয়েও লিখবো তিনখানা উপন্যাস—ধরো যদি সবদিন ৩ পাতা লিখতে নাও পারি। তাতে ২০০০৲ টাকা থেকে ২৫০০৲ টাকা বছরে আয় দাঁড়ায়। তার ওপর যদি আমি কিছু ধানের জমি করি তবে ঘরের ভাত ঘর থেকেই হোল। রোজ সকালে উঠে বেলা ৯-৯৷০ টার মধ্যে দুপাতা এবং রাত্রে একপাতা লেখা আমার পক্ষে খুব সহজ কাজ। এই লিখেই উক্ত আয় হোতে পারে। ২০০০৲ টাকাও যদি বছরে আয় হয়, তবে বারাকপুরের মাসিক খরচা মাসে মাত্র ২৫৲ টাকা কি ৩০৲ টাকা হিসাবে ৩৬০৲ টাকা বছরে। নুটুকে ৪০৲ টাকা ধরেও ৪৮০৲ টাকা। মোট ব্যয় ৩৬০৲+৪৮০=৮৪০। এর ওপর যদি ধানের

জমি থাকে, তবে খরচা আরও কম পড়বে, কারণ চাউল কিনতে হবে না। বছরে ১১৬০৲ টাকা বা ধরো ১০০০৲ টাকা জমা সোজা কথা নয়। ১০ বছরে ১০,০০০৲ টাকা হাতে জমে যাবে।···তিন পাতা করে লেখা কিছু কঠিন নয়, আমার পক্ষে। তোমাকে সেই সময়টা আমায় দিতে হবে।···Time is money with me now···দুজনে একথা সেদিন রাত্রে আলোচনা করবো।'

বিভূতিভূষণ এই বছরেই অবশ্য কলকাতা স্কুলের চাকরি ছেড়েছিলেন। তবে ব্যবসার কোন সুবিধের জন্যে নয়। নেহাৎই বোমার হিড়িকে। এবং বারাকপুরে এসে তিনি ধানজমি বা শুধু লেখা কোনটাই শুরু করেননি। গোপালনগর স্কুলে মাস্টারি করেছেন।

হিশেবের খাতাও রাখতেন। তাতে লেখা—বাঁশ বিক্রি কুড়ি টাকা, ডাঁটা এক টাকা।

এমনিই ছিল তাঁর হিশেবের অভ্যেস। অত্যন্ত নিয়মিত এবং নিখুঁতও।

বর্তমান প্রবন্ধে অপ্রকাশিত ডায়েরির পাতা ঘেঁটে পরিচয়ে প্রসঙ্গে সম্পাদিত করে তাকেই উপস্থাপিত করা হল।

আর এক স্বতন্ত্র, জনসাধারণ বিভূতিভূষণ।

কোথায় চাকরি করতেন? কী মাইনে পেতেন? বাড়তি ইনকাম কী ছিল? সাহিত্য সভায় গেলে কীরকম পারিশ্রমিক নিতেন?

এমনিই সব বড় বিভূতিভূষণের ছোট ছোট রমণীয় তথ্য।

১৯৩৩ সনের দিনলিপি।

ফেব্রুয়ারী মাসে বনগ্রাম বাসায় খরচ[1]

১৯শে জানুয়ারী দোকানে সওদা	—১৸০
হাতখরচ মেয়েদের কাছে	—২৲
ঐ যাতায়াত গাড়ীভাড়া[2]	—১॥৵০
	৫।৵০

Week ending (২৯ জানুয়ারী)

শ্রীপঞ্চমীর বাজার	—১।৴০
ধোপা	—১৲
১৩।২।৩৩ তাং এ ১ দফা	—৪।১৫
	১১৸৶১৫

১ ভগিনীপতির মৃত্যুর পর বিভূতিভূষণ তাঁর বোন জাহ্নবীকে শ্বশুরবাড়ি চালকী থেকে বনগাঁয়ে নিয়ে আসেন। সেই বাসার খরচ তিনিই চালাতেন।

২ কলকাতা থেকে বনগাঁ যাতায়াতের ভাড়া। বিভূতিভূষণ তখন খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশনে চাকরি করতেন এবং কলকাতায় এক মেসে থাকতেন।

(কয়লা ক্রয় ১ মণ ও যাতায়াত ভাড়া including জলের দেনা[1] ১৮ই পর্যন্ত শোধ)

ননীর[2] দুধ বাবদ মাঘ মাস শোধ

—২৲

(মোট ৪৲ টাকা দুই মাসে ও মাসে ২৲ টাকা + এ মাসে ২৲)

—২।• (দোকান সওদা)

—।৶১•—ডাল

—২।•—হাত খরচ

১৮৸৶১৫

জল ১৭ দিনের শোধ upto ২৬শে Feb রবিবার —১৩।•

ননী দুধ } —॥৵•, —১৲

৩২৶১৫

(বাড়ীভাড়া Feb দেওয়া হয় নাই)

২৬শে মার্চ—মোট খরচ—৯।৶•

(ভাড়া সমেত)

দুধ মার্চ শোধ। কয়লা ১মণ। শোধ। দোকান দেনা শোধ। দুধ মে শোধ। ১২ পোয়ার দাম শোধ অর্থাৎ মে শোধ।

বিভূতির[3] কাছে এক শত টাকা জমা থাকার মধ্যে আমি ১৯।৬।৩৩ তারিখে ১৭॥• লইয়া আসি।

আষাঢ় ও শ্রাবণ দুধের মূল্য শোধ —ননী মোট—৪।৵• ২৪ ভাদ্র, ১৩৪•।

ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের ১৮ই পর্য্যন্ত দুধের মূল্যের মধ্যে মাত্র ১৲ টাকা বাকী থাকিল। ৫৵• শোধ। এখন হইতে হিসাব ১৯শে আশ্বিন হইতে আরম্ভ হইবে।

১৯৪১ সনের দিনলিপি।

[জানুয়ারি]

রাম[4]	—৩৫৲
বঙ্গশ্রী[5]	—১•৲
প্রবাসী[6]	—৩•৲

---

১ বনগাঁর বাসায় ভারীতে জল দিয়ে যেত। তারই দেনা।

২ ননী চট্টোপাধ্যায়, বনগাঁবাসী।

৩ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (সাহিত্যিক নন), বনগাঁবাসী।

৪ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য। খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইন্সটিটিউশন, যেখানে বিভূতিভূষণ শিক্ষকতা করতেন সেই স্কুলের ইনি প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এখানে বিভূতিভূষণের মাইনে ছিল ৩৫৲ টাকা মাত্র।

৫ বঙ্গশ্রীতে 'বিচিত্র জগৎ' নামে বিভাগ ছিল। বিভূতিভূষণ এতে নিয়মিত লিখতেন। পৌষ সংখ্যায় তাঁর একটি লেখা ছিল, নাম, 'ক্রেটার হ্রদ ও যোসেমাইট'। সেই লেখার টাকা।

৬ 'তিরোলের বালা' (বেণীগির ফুলবাড়ী), প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৭।

শচীন[1]	—১০৲
অপূর্ব[2]	— ১৲
	৮৬৲

[ফেব্রুয়ারি]

রাম	—৩৫৲
শিবরাম[3]	— ১৲
অপূর্ব	— ১৲
শচীন	— ৫৲
ভট্টাচার্য	—১০৲
মিত্র ও ঘোষ[4]	—৩০৲
অপূর্ব	—১০৲
	৯২৲
সজনী[5]	—৯০৲
	—১৮২৲

[মার্চ]

রাম	—৩৫৲
বিপিনের সংসার (কাত্যায়নী)[6]	—৩৫০৲
মিত্র ও ঘোষ	—৫০৲
নীরদ[7]	—১০৲
শচীন	— ৬৲
	৪৫১৲

[এপ্রিল]

রাম	— ৩২৲
ক্ষিতীশ[8]	—১০৲

---

১ সাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; বিভূতিভূষণের ভাগিনেয়ী জামাই।

২ প্রকাশক অপূর্বকুমার বাগচী (এম. সি. সরকার)। বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড় প্রথমে এঁদের পত্রিকা মৌচাক-এ প্রকাশিত হয় ; পরে এম. সি. সরকার থেকে বই করে বেরয় (১৯৩৮)। সম্ভবতঃ সেই বাবদ টাকা অপূর্বকুমারের কাছে ধার হিশেবে ছিল। ডায়েরিতে বর্তমান টাকা এবং পরবর্তী স্বল্প অংশের প্রায় সব টাকাই সুদের। বেশি অঙ্কের গুলো আসল। শুধু অপূর্বকুমারকে নয়, অনেককেই তিনি টাকা ধার দিতেন।

৩ শিবরাম চক্রবর্তী।

৪ বিভূতিভূষণের অভিযাত্রিক-এর প্রকাশক ছিলেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র / মিত্র ও ঘোষ। বর্তমান টাকা এই বইয়ের রয়ালটির।

৫ সজনীকান্ত দাস। বিভূতিভূষণ অনেক সময় এঁর কাছে টাকা জমা রাখতেন। সম্ভবতঃ সেই টাকা।

৬ বিভূতিভূষণের এই উপন্যাসের প্রকাশক ছিলেন গিরীন্দ্রকুমার সোম/ কাত্যায়নী বুক স্টল। বর্তমান টাকা বইয়ের রয়ালটির।

৭ নীরদচন্দ্র চৌধুরী।

৮ মাসপয়লা পত্রিকার সম্পাদক ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। চাঁদের পাহাড় মাসপয়লা প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়।

বার্নপুর সাহিত্য সভ্য[১]	— ২০৲
অপূর্ব	— ৸০
বেণীগির ফুলবাড়ি	—১০০৲
কাত্যায়নী (ঐ বই দং)[২]	— ৮৲
অপরাজিত ২য় সংস্করণ (কাত্যায়নী)	— ৫০৲
শিবরাম	— ১৲
	২২১৸০
জের	—২২১৸০
মিত্র ও ঘোষ (দং অভিযাত্রিক)	— ৩০৲
কাত্যায়নী দং পথের পাঁচালী কপি	— ১০৲
	২৬১৸০
[মে]	
রাম	— ৩২৷০
বই D.M.	— ৯৵০
,, ,,	— ৯৲
নীরদ	— ৫৲

মাতৃভূমি দং কেদার রাজা (by cheque)[৩]	—, ৫০৲
M. C. (নতুন নভেল contract)[৪]	— ৫০৲
রাম	—৩২৷০
	১৮৮৶০
জের	—১৮৮৶০
শচীন (মার্চ ও এপ্রিল)	— ৬৲
মরণের ডঙ্কা বাজে (অপূর্ব)[৫]	— ১০৲
	— ১০৲
	—২১৪৶০
[জুন]	
মিত্র ও ঘোষ (দং অভিযাত্রিক)	—২০৲
[জুলাই]	
রাম	— ৩২৷০
মিত্র ও ঘোষ	— ৪৲
কাঞ্চনজঙ্ঘা দেব সাহিত্য কুটীর[৬] (Advance)	— ২০৲
অপূর্ববাবু	— ১৲

১ ৫ই এপ্রিল বিভূতিভূষণ এই সম্মেলনে যোগদান করতে যান। এই ধরণের সাহিত্যসভায় যাতায়াতের খরচ তিনি নিতেন। সেটা দূরে হলেও নিতেন, কাছে হলেও নিতেন।

২ বিভূতিভূষণের বেণীগির ফুলবাড়ী গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন গিরীন্দ্রকুমার সোম / কাত্যায়নী বুক স্টল। বর্তমান টাকা বইয়ের রয়ালটির।

৩ ১৩৪৭ সালের অগ্রহায়ণ থেকে বিভূতিভূষণের এই উপন্যাস মাতৃভূমিতে প্রকাশিত হতে শুরু করে। তখনও চলছিল। তারই টাকা।

৪ হীরা মাণিক জ্বলে। বিভূতিভূষণের এই উপন্যাস ১৩৪৮ সালের বৈশাখ মাস থেকে মৌচাক-এ প্রকাশিত হয়। তারই চুক্তির টাকা।

৫ বিভূতিভূষণের এই উপন্যাস প্রথমে মৌচাক-এ পরে এম. সি. সরকার থেকে প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ সেই প্রসঙ্গেই অপূর্ব নামে ১০৲ টাকা লেখা।

৬ দেব সাহিত্য কুটীর থেকে ১৯৪২ সনে কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজে বিভূতিভূষণের একটি উপন্যাস বেরয়। নাম, মিসমিদের কবচ। তারই অগ্রিম টাকা।

All India Radio (by cheque)	— ২০৲
অপূর্ব	— ৸০
শঙ্করানন্দ[1]	
পঞ্চদশী রেডিও[2]	— ১৫৲
ক্ষিতীশ	— ২৲
	৯৫৸০

[অগস্ট]

রাম	— ৩২৸০
আম বিক্রয় বারাকপুরের	— ১৲
দেব সাহিত্য	— ১০৲
অপূর্ব	— ১৲
হিরণ্ময় (বই)	— ।৶০
সুনীল (বই)	— ॥৴০
	৪৫৸০

[সেপ্টেম্বর]

রাম	— ৩২॥০
শচীন (জুলাই শোধ)	— ৯৲
মহীতোষ[3]	— ৩৲
সজনী (by cheque)	—১০০৲
ইউনিভার্সিটি (by cheque)[4]	—২০২৲
অপূর্ব দং মরণের ডঙ্কা	—১০৲
	৩৪৬॥০

[অক্টোবর]

জের	—৩৪৬॥০
বই বিক্রয় (বিপিনের সংসার)	—২৭৲
দুন্দুভি (গল্প)	— ১০৲
বাণীভবন (by cheque)[5]	—১০০৲
নবশক্তি	—১০৲
বাতায়ন (by cheque)	—১০৲
মাধব	—১৫৲
মিত্র ও ঘোষ (by cheque) (দং অভিযাত্রিক)	—৪০৲
m.c. (দং হীরা মাণিক জ্বলে)	—২০৲
কাত্যায়নী (বুক ষ্টল) (দং কেদার রাজা)[6]	—১০০৲
মাতৃভূমি (দং কেদার রাজা)	—৫০৲
	৭২৮॥০
মাধব (দং স্মৃতির রেখা)	—৫৲
দেব সাহিত্য কুটির (দং মিসমিদের কবচ)	—৩০৲
তরুণ সাহিত্য মন্দির	—২৫৲
	৭৮৮॥০
মিত্র ও ঘোষ (দং অভিযাত্রিক)	—২৫৲
রাম	—৩২॥০
শচীন	—৩৲
	৮৪৯৲

---

১ ? শঙ্করানন্দ ঠাকুর। ইনি বিভূতিভূষণের উপন্যাস দুই বাড়ীর প্রকাশক ছিলেন (১৯৩১)। সম্ভবতঃ তাঁর কাছে কোন প্রাপ্য টাকার তিনি উল্লেখ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অসাবধানতায় শেষ পর্যন্ত লেখা হয়নি।

২ বিভূতিভূষণের অন্যতম বারোয়ারী উপন্যাস।

৩ অধ্যাপক মহীতোষ রায় চৌধুরী।

৪ বিভূতিভূষণ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) বাঙলার পরীক্ষক ছিলেন। তারই পারিশ্রমিক।

৫ বিভূতিভূষণের অনূদিত আইভ্যানহোর প্রকাশক ছিলেন জগৎতারণ দাস / বাণীভবন। বর্তমান টাকা সেই বাবদ।

৬ বিভূতিভূষণের এই উপন্যাসের প্রকাশক ছিলেন গিরীন্দ্রকুমার সোম / কাত্যায়নী বুক ষ্টল। কেদার রাজা বেরিয়েছিল ? ১৯৪৫ সনে। সম্ভবতঃ তারই অগ্রিম টাকা।

	—৫০৲
	৮৯৯৲
দেশ দং গল্প[1]	—১৫৲
জের	—৯১৪৲
বঙ্গশ্রী দং বিচিত্র জগৎ[2]	—১০৲
	৯২৪৲

[নভেম্বর]

রাম	—৩২॥০
অপূর্ব	—১৲
শরৎ পাল (দং মিসমিদের কবচ)	—১০৲
রাধা (?) চৌধুরী	—৫৲
দং সুলোচনার কাহিনী ঐ মাং শিবরাম	— ৫৲
বই বিক্রয়	—৫৲
অপূর্ব	—৸০
	৫৮৷০

[ডিসেম্বর]

রাম	—৩২॥০
মৌচাক[3]	—৩৲
নীরদ চৌধুরী	—১৫৲
মৌচাক[3]	—১৫৲
শচীন	—৬৲
অপূর্ব	— ॥০
তরুণ সাহিত্য	—১৭৫৲

রাম	—৩২॥০
বই বিক্রি	—৬৲
পুরোনো কাগজ	—৸৶০
বিষ্ণুপুর সাহিত্য সম্মেলন	— ১৩৲
নীরদ	—৲
	৩৯০৷৶০
জানুয়ারি	—৮৬৲
ফেব্রুয়ারি	—১৮২৲
মার্চ্চ	—৪৫১৲
এপ্রিল	—২৬১৸০
মে	—২১৪৶০
জুন	—২০৲
জুলাই	—৯৬৲
অগাস্ট	—৪৬৲
সেপ্টেম্বর	— ৩৪৬॥০
অক্টোবর	—৯২৪৲
নভেম্বর	—৫৮৷০
ডিসেম্বর	—৩০০॥৴০
	২৯৮৬৵০

টাকা ২৯৮৬৵০ মোট দু হাজার নশো ছিয়াশি টাকা দু আনা মাত্র।

অতএব এই সালের মাসিক আয় গড়ে ২৪৮৸৴০আনা মাত্র। ঘাটশিলা। সুবর্ণরেখা তীরের শালবন। সকাল-বেলা। ২৯-১২-৪১।

---

১ 'অসমাপ্ত' (বিধুমাষ্টার), শারদীয়া দেশ ১৩৪৮।

২ 'মরুভূমির শহর টিউনিস ও প্রাচীন কার্থেজ', বঙ্গশ্রী, আশ্বিন ১৩৪৭।

৩ হীরা মাণিক জ্বলে মৌচাকে বেরচ্ছিল। তারই কিস্তির টাকা।

১৯৪৩ সনের দিনলিপি।

জানুয়ারী	
চতুরঙ্গ[1]	—১৫৲
ফেব্রুয়ারী	
বাটা[2]	—৫০৲
অপূর্ব	—৫৲
M. C.	—১০৲
বরেন্দ্র (দং মেঘমল্লার)[3]	—১৫৲
অপূর্ব (April)	—১০৲
১০০৲ (পথের পাঁচালী)	—১০০৲
মাতৃভূমি	—৫০৲
বরেন্দ্র দং মেঘমল্লার	—১০৲
M. C. (মৌচাক)	—১০৲
হাওড়া সঙ্ঘ ও উত্তরপাড়া	—৫৲
মল্ল মাস্টার[4]	—৪৲
D. M.	—৫৲
অপূর্ব (মে ও জুন)	—৫৲
দং মরণের ডঙ্কা বাজে	—১৫৲
	—২১১৲
জের	—২১১৲
অপূর্ব বাবু (দং মরণের ডঙ্কা বাজে)	—২০৲
সুধীরবাবু[5]	—৫০৲
কাত্যায়নী (পথের পাঁচালীর ৪র্থ সংস্করণের শেষ)	—২০০৲
দেব সাহিত্য কুটীর (গল্প)	—১৫৲
অমিয় ব্যানার্জি	—২৲
	৪৯৮৲
অমিয় ব্যানার্জি	—২৫৲
অপূর্ব (দং মরণের ডঙ্কা)	—২০৲
সুদ	—২৲
গজেন মিত্র (দং ছোটদের বই)	—২০৲
	৫৬৫৲
বরেন্দ্র লাইব্রেরী (দং মেঘমল্লার)	—১০৲
দং পথের পাঁচালী ১০ খানা	—২২৷৴০
	৫৯৭৷৴০
দং বই (কপি)	—২৬।০
দং অমিয় ব্যানার্জি	—২৫৲
Correction (ঐ কপি)	—৩৲
বাটার জীবনীর বাকি টাকা	—২৫৲
	৬৭৬৸৴০

---

১ 'বিড়ম্বনা' (উপলখণ্ড), চতুরঙ্গ, পৌষ ১৩৪৯।

২ বিভূতিভূষণের অনূদিত টমাস বাটার আত্মজীবনী। বইটির প্রকাশক ছিলেন সুরেশচন্দ্র দাস। জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স।

৩ বিভূতিভূষণের এই গল্পগ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন বরেন্দ্রনাথ ঘোষ / বরেন্দ্র লাইব্রেরী।

৪ মল্লভূষণ চট্টোপাধ্যায়, গোবরাপুরবাসী (বনগাঁ)।

৫ সুধীরচন্দ্র সরকার।

জের	—৬৭৬৶/০
অভিযান	—১০৲
অপূর্ব (দং মরণের ডঙ্কা)	—৩৫৲
জুলাই আগস্ট	—৫৲
সজনী	—৫৲
রমেশ বাবু দং নতুন বই[১]	—৫০৲
রেডিও অফিস (by cheque)	—২৫৲
	১৩০৲
যুগান্তর (by cheque)[২]	—১৫৲
গিরিন সোম (দং অপরাজিত ২য় সং)	—১০০৲
দং কেদার রাজা	—৫০৲
দং কপি বই (পথের পাঁচালী)	—৮৲
দং স্ট্যাম্প	—॥০
	৩০৩॥০
University (by cheque)	—২১৭৲
	৫২০॥০
বরেন্দ্র লাইব্রেরী মেঘমল্লার ২য়	—১০৲
মিত্র ও ঘোষ দং গল্পের বই	—৮০৲
সজনী (গল্প)[৩]	—৫৲
	৬১৫॥০

জের	—৬৭৬৶/০
	—৬১৫॥০
	১২৯২/০
আনন্দবাজার[৪]	—২০৲
M. C. দং বনে জঙ্গলে[৫]	—১৫৲
	১৩২৭/০
দেশ[৬]	—২৫৲
অপূর্ব বাবু September	—২৲
মৌচাক গল্প[৭]	—১০৲
রেডিও	—১০৲
শিবরাম	—৫৲
গৌরীশঙ্কর (for তৃণাঙ্কুর ও অনুবর্ত্তন)[৮]	—১০০৲
	১৪৭৯/০
অপূর্ব (১৫০৲ টাকার মধ্যে ১৫৲ টাকা)	—১৫৲
সুদ (October)	—২৲
	১৪৯৬/০
Signet Press[৯]	—২৫৲
	১৫২১৲

১ রমেশচন্দ্র ঘোষাল ; ইনি বিভূতিভূষণের তালনবমী গ্রন্থের (১৯৪৪) প্রকাশক। বর্তমান টাকা অগ্রিম চুক্তি বাবদ।

২ ‘পারমিট’ (নবাগত), শারদীয় যুগান্তর ১৩৫০।

৩ ‘ভিড়’ (নবাগত), শনিবারের চিঠি (সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত), অগ্রহায়ণ ১৩৫০।

৪ ‘মুক্তি’ (নবাগত), শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৫০।

৫ বনে জঙ্গলে নয়, বনে-পাহাড়ে। বিভূতিভূষণের এই ভ্রমণ-দিনলিপি ১৩৫০ সালের আষাঢ় মাস থেকে মৌচাক-এ প্রকাশিত হয়। তারই টাকা।

৬ ‘গায়ে হলুদ’ (নবাগত), শারদীয়া দেশ ১৩৫০।

৭ সম্ভবতঃ ‘চাউল’ গল্প (তালনবমী)। এটি ১৩৫০ সালের মাঘ মাসের মৌচাক-এ বেরয়।

৮ বিভূতিভূষণের এই বই দুটির প্রকাশক ছিলেন গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য / মিত্রালয়। বর্তমান টাকা তারই রয়ালটির।

৯ ১৯৪৪ সনে সিগনেট থেকে বিভূতিভূষণের আম আঁটির ভেঁপু (পথের পাঁচালীর কিশোর সংস্করণ) বেরয়। সম্ভবতঃ তারই অগ্রিম টাকা।

নবাগত[১] বইয়ের বাকি Money Order মিত্র ও ঘোষ —১০০৲

১৬২১৲

১২)১৬২১(১৩৫৲
১২
৪২
৩৬
৬১
৬০

Average income = Rs 135 a month

১৯৫০ সনের দিনলিপি ।

জানুয়ারী

গজেন	—৭৫৲
গোরা	—২৫৲
"	—৬৫৲
গজেন	—১০৲
	১৮৫৲
খাজনা	—২৲
	১৮৭৲

Feb

বিজয় মিত্র[২]	—১০০৲
রাহা খরচ বিল	—১৪৲
	১১৪৲
গজেন মিত্র	—২৫৲
গৌরী	—২৫৲
	১৬৪৲

9ই গিরিন গোম দং অপরাজিত	৬০৲
	২২৪৲

মার্চ

মাইনে[৩]	—৫০৲
গজেন	—৫০৲
Gouri	—৫০৲
	১৫০৲
[?]	—১০৲
	১৬০৲

April

মাইনে	—২৫০৲
গজেন	—৪০৲
ডাঁটা	—১৲
গজেন	—৮০৲
গৌরীশঙ্কর	—৫০৲
আনন্দবাজার[৪]	—৫০৲
	৪৮০৲

মে

মাইনে	—৫০৲
গজেন	—৩০৲
গৌরী	—৫০৲
ঐ	—১০৲
গজেন	—২৫৲
দেব সাহিত্য	—৫০৲
গিরিন	—৫৫৲
	২৮০৲
বিজয় মিত্র	২৫৲
	৩০৫৲

১ এই বইয়ের প্রকাশক ছিলেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র / মিত্র ও ঘোষ। বর্তমান টাকা তারই রয়ালটির।

২ ইনি বাঙলা নামে মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকায় ১৯৫০ সনে বিভূতিভূষণের একটি উপন্যাস বেরয় ; নাম, অনশ্বর। বর্তমান টাকা সেই বাবদ।

৩ বিভূতিভূষণ এই সময়ে গোপালনগর হরিপদ ইন্স্টিটিউশনে (বনগাঁ) শিক্ষকতা করতেন।

৪ 'টান' (অনুসন্ধান), :আনন্দবাজার বার্ষিক সংখ্যা ১৩৫৬।

জুন

গল্প	—৩০৲
গজেন	—৫০৲
গৌরী	—৩০৲
	১১০৲

জুলাই

গৌরী	—২০৲
তরুণের স্বপ্ন[1]	—২০৲
বিজয় মিত্র	—২৫৲
স্কুল	—৫০৲
কৃষ্ণনগর সভা	—৫৲
	১২০৲

গৌরী	—১৫৲
গজেন	—১৫৲
অজিত	—২০৲
কৃষ্ণনগর	—৫৲
	৭৫৲

আগস্ট

মাইনে	—৫৫৲
বিজয় মিত্র	—২৫৲
মায়া প্রেস (হিন্দী অনুবাদের জন্য)	—১৫৲
দমদম সভা—	—৭৲
	৯৭৲
Gouri Sankar	—২৫৲
	১২০৲

সেপ্টেম্বর

বাঁশ	—২০৲
মাহিনা	—৫০৲
গিরিন দং	—১০০৲
বিপিনের সংসার (২য়)	—৫০৲
General Printers	
শরৎ পাল	—৫০৲
	২৭০৲

October

পূজায় গল্পের গল্পভারতী	—৫০৲

১ 'হরিকাকা' (কুশল পাহাড়ী), তরুণের স্বপ্ন, শ্রাবণ ১৩৫৭

পত্র-পত্রিকায় বিভূতিভূষণ

আজ তিরিশ বছর হল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত হয়েছেন। সম্প্রতি সাহিত্য অকাদেমীর দ্বারা তাঁর গ্রন্থ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে, বিদেশে তাঁর পরিচয়ের জন্যে ইউনেস্কো থেকে পথের পাঁচালীর ইংরেজি ও ফরাশি অনুবাদ বার হয়েছে, দেশি-বিদেশি পত্র-পত্রিকায় তাঁর সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে সাধারণের উৎসাহের অন্ত নেই। বাঙলাদেশে বোধ হয় লেখাপড়া-জানা এমন কোন মানুষ নেই যিনি পথের পাঁচালী পড়েননি এবং পড়ে অভিভূত হননি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বইটি পড়ে বলেছিলেন, 'সাহিত্যে একটা নতুন জিনিস পাওয়া গেল, অথচ পুরাতন পরিচিত জিনিসের মত সে সুস্পষ্ট।' ১৯৩৩ সালে (যে বছর আইভান বুনিন নোবেল প্রাইজ পান) গুজব রটেছিল, বিভূতিভূষণ নোবেল প্রাইজ পাচ্ছেন। তবে খবরটা নেহাৎই গুজব। কেন না, তখনও পর্যন্ত পথের পাঁচালীর ইংরেজি কোন অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। তবু গুজবটা একান্তই অহেতুক ছিল না। এডওঅর্ড টমসন এর কিছুদিন আগে পথের পাঁচালীর সপ্রশংস উল্লেখ করে অ্যালবার্ট হলের এক সভাতে বলেছিলেন—পথের পাঁচালীর মত বই যে লেখা হয়েছে এ কথা পৃথিবীর সবাইকে জানান উচিত। সেই সঙ্গে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, বিশিষ্ট ভারতীয় সাহিত্যিক যাঁরা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন তাঁদের নোবেল প্রাইজ জাতীয় পুরস্কার দেওয়া হোক।

বর্তমানে বিভূতিভূষণের রচনা যথাসম্ভব সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। যদিও তার বাইরে অনেক রচনা অসংকলিত ও অপ্রকাশিত থেকে গিয়েছে। আশা করা যায়, কালক্রমে সেগুলিও সংকলিত ও প্রকাশিত হবে। কিন্তু অধুনা দুষ্প্রাপ্য দেশি-বিদেশি পত্র-পত্রিকায় তাঁর জীবৎকালেই তাঁর সম্বন্ধে কত যে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তা ভাবতে বিস্ময় লাগে। এই আলোচনাগুলির অতি সামান্য অংশই গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে। বাকি লেখাগুলি সংগ্রহ ও মূল্যায়নের কোন চেষ্টা আজ পর্যন্ত করা হয়নি। বর্তমান প্রবন্ধে এই দুষ্প্রাপ্য লেখাগুলি বিষয় ও কাল অনুযায়ী গুছিয়ে আলোচনা করা হল।

পরিচয় পত্রিকায় ১৩৩৮ সালের মাঘ-কার্তিক সংখ্যায় দিলীপকুমার রায় 'পথের পাঁচালী' নামে পত্রাকারে একটি প্রবন্ধ লেখেন। পত্রটি লেখা সোমনাথ

মৈত্রকে। এই প্রবন্ধটি প্রধানতঃ পথের পাঁচালী সম্বন্ধে প্রথম বিস্তৃত আলোচনা। দিলীপ রায় তাঁর আলোচনার ভূমিকায় লেখেন, যাকে সচরাচর আমরা চমকপ্রদ ও ওরিজিনাল উপন্যাস বলি, যাতে সাময়িকতার উত্তেজনা থাকে যথেষ্ট, পথের পাঁচালী সে রকম নয়। এই প্রসঙ্গে বোদলেআরের একটি উক্তি তাঁর খুব ভাল লেগেছে। সে উক্তি এই, সুন্দর বিস্ময়োদ্দীপক বলে এ কথা বলা হাস্যকর যে, বিস্ময়োদ্দীপক মাত্রেই সুন্দর। রূপকার যখন শুধু বাস্তবকে, শুধু দৃশ্যমানকে রূপ দিতে চান তখন তিনি ভুল করেন। আমাদের স্বপ্নলোকে যে 'আনন্দপরম' রয়েছে তাকে মূর্তি দিলেই শিল্পীর কীর্তি নিরুপম হয়ে ওঠে। দিলীপ রায় বলেছেন, পথের পাঁচালী শিল্পী বিভূতিভূষণের এমনই এক নিরুপম কীর্তি। ভূমিকায় আর-একটি কথা তিনি বলেছেন, তা হচ্ছে, পথের পাঁচালীর 'soul of rhythm'। বইটি পড়তে গিয়ে সর্বাগ্রে যে গুণে মন মুগ্ধ হয় তা এর অনবদ্য গদ্যছন্দ। নিপুণ গায়কের মত তিনি জানেন, ভাষার এই ছন্দকে কোথায় কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে। তাই অপু-দুর্গার ছেলেমানুষির কথা শুনতে শুনতে চোখের সামনে ফুটে ওঠে শিশু-হৃদয়ের সৌন্দর্য ; সর্বজয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষার ও সোহাগ-শাসনের কথা শুনতে শুনতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মমতাময়ী মায়ের স্নেহ-দুর্বলতার ছবি ; ইন্দির ঠাকরুনের কাতর মিনতি শুনতে শুনতে ভেসে ওঠে পল্লীবিধবার অসহায় রূপ এবং এই সব কিছুর সঙ্গে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে নদীর ঘাট, মাঠ-ঝোপ, ফুলফল, ঝড়বৃষ্টি প্রভৃতির ছবি। বস্তুতঃ, পথের পাঁচালী 'আদ্যন্ত সুরেলা, এতটুকু বেসুর কোথাও কানকে প্রতিহত করে না'। এই সুরকে, সরল দীপ্তভাষার জেরকে তিনি আগাগোড়া টেনে নিয়ে গিয়েছেন। সার্থক রচয়িতার লেখায় অবশ্য এই দীপ্তি বা ঔজ্জ্বল্য থাকে, কিন্তু তাকে সমান তালে বজায় রাখা একমাত্র উঁচুদরের শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। পথের পাঁচালার আদ্যোপান্ত মনোজ্ঞ বর্ণনার মণি দিয়ে গাঁথা। 'সে মণিমালা মৃদুহাস্যে মধুর, কখনও অশ্রুতে সজল, কখনও প্রশান্তিতে শুদ্ধ. কখনও উদাস দীর্ঘশ্বাসে নিষিক্ত।' পথের পাঁচালীর এই 'দীপ্তভাষা অপরাজিত'তে, বিশেষ করে মধ্যভারতের বনশ্রীর বর্ণনায়, আরও উদাত্ত ও অপরূপ হয়েছে।

মূল প্রবন্ধে দিলীপ রায় বলেছেন, আধুনিক সাহিত্যে যে কখানি গ্রন্থে স্থায়ী রসের প্রকাশ ঘটেছে তাদের মধ্যে পথের পাঁচালীর স্থান খুব উঁচুতে। গ্রন্থের মূল প্রেরণার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, এ গ্রন্থের উদ্ভব 'সত্য রসানুভূতি' থেকে। সে সত্য রসানুভূতির জগতে দ্রষ্টব্যের অফুরন্ত মেলা বসিয়ে প্রকৃতি কোন্ অনাদ্যন্ত কাল থেকে আমাদের ডাকছে। এই সমস্ত দ্রষ্টব্য এবং অকিঞ্চিৎকর.

ঘটনা নিত্য আমাদের চোখে পড়েও চির অচেনাই থেকে যায়। পথের পাঁচালীর কবি তাদের নিকট পরিচয়ের আনন্দেই আত্মহারা।

সত্য রসানুভূতি বা জীবনের অকৃত্রিমতা বা বিভূতিভূষণের সাহিত্যের আসল উপাদান তার কথায় একদা তিনি দিলীপ রায়কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমি কোনো বড় ঘটনায় বিশ্বাসবান্ নই। দৈনন্দিন ছোটোখাটো সুখদুঃখের মধ্যে দিয়ে যে জীবনধারা ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীর মত মন্থর বেগে অথচ পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ও আনন্দের সঙ্গে চলেচে আসল জিনিসটা সেখানে। কোনো কৃত্রিম প্লট সাজানো, প্যাঁচ কসা, কৃত্রিম 'সিটুয়েশন' তৈরী করা—আমি মানি না। নভেল কেন কৃত্রিম হবে? প্রতিদিনের অমূল্য দানকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কৃত্রিমতার মালা গাঁথা ও তারই বেসাতি শুধু টেকনিকের বেসাতি হয়ে দাঁড়ায়। কোনো সুস্থ সতর্ক ও অনলস মনের বিভিন্নমুখী কৌতূহল তাতে চরিতার্থ হয় না।' বিভূতিভূষণের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও স্পষ্ট করার জন্যে তিনি নিজেকেই পূর্বপক্ষ হিশেবে দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করেছেন—বড় ঘটনা বড় বলেই কি কৃত্রিম হবে? জীবনটা তো শুধু ছোটখাটো সুখদুঃখের ধারা নয়, শুধু প্রতিদিনের অমূল্যদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জীবনধারায় যেমন গ্রাম্য নদীর মন্থর বেগ, তেমনি কলস্বনার দুর্বার আবেগও আছে। জীবনে যেমন প্রতিদিনের অমূল্য দান, তেমনি দূরাভিসারের ও অসীমের আনন্দও আছে। বিভূতিভূষণ তবু যে 'দৈনন্দিন ছোটোখাটো সুখদুঃখের' ওপর এত জোর দিয়েছেন তার কারণ, জীবনে তুচ্ছতমের মধ্যেও তিনি সেই 'মাধ্বীধারা'র সন্ধান পেয়েছেন। এ তাঁর অলীক কবিকল্পনা নয়, সত্যানুভূতি। বলেছেন, থ্যাকারে যেমন তাঁর অপূর্ব উপন্যাস '*Pendennis*'-এর ভূমিকায় লিখেছেন, তিনি যা জানেন, গ্রন্থে তারই বর্ণনা করেছেন, অভাবনীয়ের যোগাযোগে পাঁচজনকে তাক লাগাতে চাননি। বিভূতিভূষণও তেমনি পথের পাঁচালীর ভূমিকায় তাঁর অনাড়ম্বর প্রকাশের কথা লিখতে পারতেন। যে বাস্তবতা একপ্রকার শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি ও যা মানুষের আদর্শকে হেয় প্রতিপন্ন ও দৈনন্দিন ক্ষুদ্রতায় অবনমিত করে সে বাস্তবতাকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। পথের পাঁচালী-অপরাজিত-এর অপুর আনন্দবেদনা, আশা ও স্বপ্নভঙ্গ, জীবনের ভাঙাগড়া দেখতে দেখতে মনে হয়—তিনি যাকে মানুষের আদর্শ বলে জেনেছেন তা হচ্ছে উত্তরণের অভীপ্সা। ভাগ্‌নারের কথা তুলে বলেছেন, 'আর্টে আমরা সেই স্বপ্নই খুঁজি—যা জীবনে পদে পদে ভঙ্গ হয়—ব্যর্থ হয়।' আমি না পারলেও যা হতে চেয়েছি, ঈশ্বরের কাছে আমার অর্ঘ তাই।

তাঁর এই প্রথম বক্তব্যের শেষে তিনি পথের পাঁচালীকে বলেছেন, ওরিজিন্যাল,

কারণ ওরিজিন্যালিটির ভূত এর ঘাড়ে চাপেনি। 'বইখানি পড়তে পড়তে একটা কথা স্বতঃই মনে হয়। সেটা এই যে, ওরিজিন্যালিটির ভূত যাদের ঘাড়ে না চাপে তারাই সত্য ওরিজিন্যাল হতে জানে। ওরিজিন্যালিটি বস্তুটি মিষ্টি হাসির মতন, আপনা থেকে ফুটে উঠলে তবে সে প্রাণ কাড়ে, চেষ্টা করে যারা মিষ্টি হাসে তাদেরই বলে ককেট।' দিলীপ রায়ের আলোচনার প্রথম বক্তব্যের গোড়ার কথা হল, পথের পাঁচালীর প্রেরণা 'সত্য রসানুভূতি' থেকে। পরের কথা হল, যেসব দ্রষ্টব্য ও অকিঞ্চিৎকর ঘটনা নিত্য আমাদের চোখে পড়েও চির অচেনা, বিভূতিভূষণ তাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আনন্দে আত্মহারা। দিলীপ রায়ের বক্তব্যের এই দুটি দিকের সঙ্গে পথের পাঁচালী সম্বন্ধে পরবর্তীকালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের আশ্চর্য রকমের মিল আছে। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য দিলীপ রায়ের প্রবন্ধের বৎসরাধিক কাল পরে পরিচয় পত্রিকায় ১৩৪০ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সম্পূর্ণ পাঠ নিয়ে এই প্রবন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দিলীপ রায়ের বক্তব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মিলের অংশমাত্র আলোচনা করা গেল। পথের পাঁচালী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বইখানি দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে।' আর বলেছিলেন, 'কাছের জিনিসেরও অনেক পরিচয় বাকি থাকে। যেখানে আজন্ম আছি সেখানেও সব মানুষের সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে না।' রবীন্দ্রনাথের আলোচনা দিলীপ রায়ের প্রবন্ধের পরে প্রকাশিত হয়েছে বটে, কিন্তু দিলীপ রায়ের প্রবন্ধের এক জায়গায় আছে—'সাধে কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতন গুণী পথের পাঁচালীর উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতি করেছেন।' পরিচয়-এর উল্লিখিত সংখ্যার পূর্বে পথের পাঁচালী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোন লেখা প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায় না। দিলীপ রায়ের মন্তব্য থেকে জানা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ পথের পাঁচালী সম্বন্ধে লেখার আগেই তাঁর মতামত আলাপ-আলোচনায় জানিয়েছিলেন। দিলীপ রায়ের প্রবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গে পরবর্তীকালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মিল রয়েছে, আবার দিলীপ রায় তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস মনোভাবের উল্লেখ করেছেন। এতেই বোঝা যাচ্ছে, এ প্রবন্ধ লেখার সময় রবীন্দ্রনাথের অভিমত দিলীপ রায়ের মনে ছিল।

পথের পাঁচালী সম্বন্ধে দিলীপ রায়ের দ্বিতীয় বক্তব্য, যে কারণে বইটি তাঁকে সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করেছে সে কারণ হচ্ছে এই—পথের পাঁচালী আসক্তির নয় অনাসক্তির, ঘরের নয় পথের, অচলায়তনের নয় চলার গান। 'জীবন যে চলচঞ্চল, গতি উচ্ছল, আনন্দ বেদনা হাসি অশ্রু ছলছল মায়ারসে অভিষিক্ত সেই রসই

কবির পথের একমাত্র পাথেয়।' তিনি বলেছেন, বিভূতিভূষণ সামগ্রিককে উচ্ছ্বাস-উত্তেজনার ধোঁয়াটে ভাবপরিমণ্ডলে চিরন্তন করে দাঁড় করানর চেষ্টা করেননি, যা অনিবার্য তাকে বিজ্ঞ সিনিকের দৃষ্টিতে তুচ্ছ করার চেষ্টা করেননি, অথবা যা রুদ্র ও ভয়ানক তাকে নিয়ে হাহাকার করে সহানুভূতি জোগাড়ের প্রয়াস পাননি। একদিকে কারুণ্য, অনুকম্পা, ব্যথা, দরদ ; অপরদিকে হৃদয়-হীনতা, মৃত্যু, দূরাভিসার, জীবনের পরিবর্তনশীলতা—দুইকেই তিনি মূর্ত করে তুলেছেন।

দিলীপ রায় যখন এই প্রবন্ধ লেখেন তখন প্রবাসীতে অপরাজিত সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর এই প্রবন্ধ যদিও শিরনামা অনুযায়ী পথের পাঁচালী নিয়ে, তবু একান্তভাবে পথের পাঁচালী নিয়ে নয়। কারণ, প্রবন্ধের মধ্যে একাধিকবার তিনি অপরাজিত-এর উল্লেখ করেছেন, যা সত্যিই খুব স্বাভাবিক। পথের পাঁচালী ও অপরাজিত আসলে একটি বই। প্রবন্ধের এক জায়গায় দিলীপ রায় বলেছেন, 'পথের পাঁচালী ও অপরাজিততে অপুর আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, আকাশকুসুম স্বপ্নভঙ্গ, ভাঙাগড়া কল্পনাকুহক দেখতে দেখতে মনে হয় যে লেখক জানেন' আদর্শের অস্তিত্ব অপ্রাপ্তিতে নয়, অভীপ্সায়। ভাগ্নারের কথা তুলে তিনি বলেছেন, জীবনে যে স্বপ্ন পদে পদে ব্যর্থ, ভঙ্গ ও লুণ্ঠিত হচ্ছে আর্টে আমরা তাকে খুঁজি। দিলীপ রায় এখানে সংগতি-বৈষম্যের আলো-অন্ধকারে মেশান যে বিরাট জীবনের কথা ভেবেছেন, যার কথায় অপুর মনে হয়েছে, 'যুগে যুগে এ জন্মমৃত্যুচক্র কোন্ বিশাল-আত্মা দেবশিল্পীর হাতে আবর্তিত' হচ্ছে, সে জীবনবোধ পথের পাঁচালীর নয়, অপরাজিত-এর ফলশ্রুতি। বর্তমানে বিভূতিভূষণের সমালোচকদের মধ্যেও কেউ মনে করেন, গতিচেতনাই এই গ্রন্থের মূলসুর। এমনকি স্বয়ং বিভূতিভূষণও একদা পথের পাঁচালী সম্বন্ধে মোহিতলালকে বলেছিলেন, এই উপন্যাসের প্রেরণায় কোন বিশেষ স্থানকাল-পাত্রের প্রতি পক্ষপাত নেই ; সমস্ত বিবৃতি ও বর্ণনার মধ্যে দিয়ে যে ধারণাটিকে তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তা হচ্ছে 'vastness of space and passing time'[১]। দিগন্তবিস্তৃত সোনাডাঙার বিশাল মাঠ অথবা গৃহত্যাগী উদাসী বাউলের মত পথের ছবিতে 'vastness of space'-এর পরিচয় থাকলেও পথের পাঁচালীতে 'vastness of time'-এর পরিচয় কোথায়? সেটুকু আছে সেটুকু তো গ্রন্থের নেপথ্যে। সত্যিই কি পথের পাঁচালীতে দিশাহারা দেশকালের বা গতিচেতনার স্বপ্ন প্রধান হয়ে উঠেছে? খুব সহজ কথায়, পথের পাঁচালী

১ মোহিতলাল মজুমদার, সাহিত্য বিতান, 'দুইখানি উপন্যাস'।

পড়তে পড়তে এবং পড়ার শেষে আমাদের মন কি স্মৃতিভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে না, যাকে আটপৌরে ভাষায় বলি মন-কেমন-করা? ইংরেজিতে যাকে নস্ট্যালজিয়া বলে, পথের পাঁচালীর মূল সুর কি তাই নয়? 'বল্লালী-বালাই'-এ সন্ধ্যালোকে ইন্দির ঠাকরুনের মুখে দুর্গার রূপকথা শোনা, 'আম-আঁটির-ভেঁপু'তে বালক অপুর প্রকৃতিমুগ্ধতা ও দুর্গা-পটু-গুলকীর সঙ্গে খেলা এবং সবশেষে 'অক্রূরসংবাদ'-এ উদ্বাস্তু ও বিপন্ন অপুর নিশ্চিন্দিপুরে প্রত্যাবর্তনের আকুলতা—শৈশব-কৈশোরের এইসব মায়াময় ছবি কি আমাদের বিহ্বল ও স্মৃতিবিধুর করে তোলে না? পথের পাঁচালীর যথার্থ শেষ কি অপুর এক বিচিত্র অনুভূতি, যাকে নস্ট্যালজিয়া বলা যায় তাতে নয়? তা 'দুঃখ নয়, শোক নয়, বিরহ নয়, তাহা কি সে জানে না। কত কি মনে আসিল অল্প এক মুহূর্তের মধ্যে…আতুরী ডাইনী…নদীর ঘাট…তাহাদের কোঠাবাড়ীটা…চাল্‌তেতলার পথ…রাণু…কত বৈকাল, কত দুপুর…কতদিনের কত হাসি-খেলা…পটু…দিদির মুখ……দিদির কত না-মেটা সাধ…'।[১] পাঁচালীর যে গ্রাম্য, মেঠো অথচ মন-ভোলান সুর তা কি 'আম-আঁটির ভেঁপু'তেই শেষ হয়ে যায়নি? যে প্রশান্তিতে ও তিক্ততায়, মাধুর্যে ও বিষাদে জীবনের পূর্ণ পরিচয় তার তিক্ত স্বাদ অপু 'অক্রূরসংবাদ'-এ প্রথম পেয়েছে। কিন্তু সে পরিচয় তো অপরাজিত-এর পরিচয়। তাই সূক্ষ্ম বিচারে 'অক্রূরসংবাদ'-এর যথার্থ স্থান পথের পাঁচালীতে নয়, অপরাজিততে। এমন কি 'অক্রূরসংবাদ' রেখে দিলেও পথের পাঁচালীর গানকে অনাসক্তির বা পথের গান বলা চলে না, কারণ 'অক্রূরসংবাদ'-এ নিশ্চিন্দিপুরের জন্যে অপুর অসপত্ন আসক্তি প্রকাশিত হয়েছে। গ্রাম্য প্রকৃতি ও নরনারী নিয়ে নিশ্চিন্দিপুর তো তার নিজের বাড়ি। মনিববাড়িতে মেজবাবুর প্রহারে জর্জরিত হয়েও অপুর চোখে জল পড়েনি, কিন্তু দূর নিশ্চিন্দিপুরের মায়াময় স্মৃতিতে 'উচ্ছ্বসিত চোখের জল ঝরঝর করিয়া পড়িয়া তাহার সুন্দর কপোল ভাসাইয়া দিতেই চোখ মুছিতে হাত উঠাইয়া আকুল স্বরে মনে মনে বলিল—আমাদের যেন নিশ্চিন্দিপুর ফেরা হয়—ভগবান তুমি এই কোরো, ঠিক যেন নিশ্চিন্দিপুর যাওয়া হয়—নৈলে বাঁচবো না—পায়ে পড়ি তোমার।'[২]

গতিচেতনা বা অনাসক্তির গান যে পথের পাঁচালীর নয় তার কারণ খুব সহজ ও স্বাভাবিক। পথের পাঁচালী যার চোখে দেখা ও দেখান সে অপু শিশু

---

১ পথের পাঁচালী (৮ম সং), ২৮ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২৭৯।

১ ঐ, ৩৪ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩৫০।

ও কিশোর। একজন শিশুর ও কিশোরের পক্ষে সৃষ্টির অন্তরালবর্তী গতিচেতনাকে উপলব্ধি করা বা অনাসক্তির গান শোনা স্বাভাবিক নয়। পথের পাঁচালীর যে অংশ গতি বা অনাসক্তির বিভ্রম আনে সে অংশ একেবারে গ্রন্থের শেষাংশ, যেখানে বিভূতিভূষণ লিখেছেন, 'পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন—মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয় নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায়, কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়! তোমাদের সোনা-ডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে···দেশ ছেড়ে দেশান্তরের দিকে, সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশ্যে···দিনরাত্রি পার হয়ে, জন্ম মরণ-পার হয়ে, মাস বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চলে যায়···তোমাদের মর্মর জীবনস্বপ্ন শেওলা-ছাতার দলে ভ'রে আসে, পথ আমার তখনও ফুরায় না···চলে··· এগিয়েই চলে···অনির্বাণ তার বীণা শোনে শুধু অনন্ত আকাশ···সে পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া করে এনেছি···'।[১] আসলে এই অংশটা না থাকলে বোধ হয় পথের পাঁচালী সম্বন্ধে গতি বা অনাসক্তির এত কথা উঠত না। এই অংশটি এত কাব্যগুণসমৃদ্ধ, পডতে এত ভাল লাগে যে এটিকে আমরা আমাদের গ্রন্থপাঠের সমগ্র ধারণায় অকিঞ্চিৎকর ভাবতে পারি না। কিন্তু নস্ট্যালজিয়া যেখানে পথের পাঁচালীর ফলশ্রুতি সেখানে এই অংশ মনোরম হলেও কি অপরিহার্য? পড়তে ভাল লাগে বলে একে রাখলে কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু রেখে তাৎপর্য খুঁজতে গেলে অসুবিধা আছে। দ্বিতীয়তঃ, পথের পাঁচালীর এই অংশের উক্তি কার? অপুর তো নয়, অপুর রচয়িতার। এবং এই উক্তি গ্রন্থমধ্যে নয়, গ্রন্থনেপথ্যে, যে নেপথ্যে তিনি অপরাজিত-এর পরিকল্পনা করেছেন। অপুকে অপরাজিত জীবনরহস্যের সন্ধান দেবেন বলেই তিনি তাকে পথের তিলক ললাটে দিয়ে ঘরছাড়া করেছেন। কিন্তু সে কথা তো অপরাজিত-এর বা পথের পাঁচালীর পরের কথা। পথের পাঁচালী প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ মোহিতলালকে যে দিশাহারা দেশকালের কথা বলেছেন অথবা দিলীপ রায় যে অনাসক্তির গানের কথা লিখেছেন তা তাঁরা অপরাজিত-এর কথা মনে রেখেই সম্ভবতঃ করেছেন। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মতটি বড় দ্বিধাহীন। পথের পাঁচালীকে তিনি বলেছেন বাঙলা পাড়াগাঁয়ের কথা যাকে অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়।

১ পথের পাঁচালী (৮ম সং), ৩৪ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩৫০।

রবীন্দ্রনাথ পথের পাঁচালীর মধ্যে কোন দার্শনিকতার সন্ধান পাননি। দিলীপ রায় তাঁর প্রবন্ধের এক জায়গায় গ্রন্থের শেষাংশকে—যেখানে দার্শনিকতা রয়েছে, তাকে, পথের পাঁচালীর দুর্বলতম স্থান বলেছেন। 'বস্তুতঃ পথের পাঁচালীর সবচেয়ে দুর্বল স্থান বোধ হয় তার শেষ কয়টি ছত্র—যেখানে কবি তাঁর দৃষ্টির সম্বল ছেড়ে দার্শনিকের চিন্তায় সান্ত্বনা পেতে গিয়েছেন।' আর দিলীপ রায়ের প্রবন্ধের সবচেয়ে দুর্বল স্থান বোধ হয় সেই অংশ যেখানে স্ববিরোধী হয়ে তিনি একবার বলেছেন পথের পাঁচালীর পাতায় পাতায় নভোপিপাসা ···এ গান আসক্তির গান নয় অনাসক্তির গান ; আবার বলেছেন, 'পথের পাঁচালীর মধ্যে কোনো বৃহৎ দিগ্বলয়ের পরিচয় নেই।' অথচ শেষের কথাটি কত যথার্থ। সত্যিই তো, পথের পাচালীতে জীবনের পরিপূর্ণতা কোথায় যে তাতে বৃহত্তর জীবনের দিগ্বলয় দেখা যাবে ? সে দিগ্বলয়ের পরিচয় বিভূতিভূষণ অপরাজিত-এর অপুর জন্যে রেখে দিয়েছেন।

দিলীপ রায়ের তৃতীয় বক্তব্য, বাঙলা সাহিত্যে পথের পাঁচালী এক অভিনব সৃষ্টি। শিশুর চোখ দিয়ে জগৎকে দেখা এর আগে কোন বাঙলা বইয়ে হয়নি। তবে তিনি বলেছেন, বাঙলায় এ ধরণের বই নতুন হলেও, ধরণটা বিভূতিভূষণের তৈরি নয়। কারণ তাঁর আগেই রলাঁ *'Jean Christophe'* গ্রন্থে এই ধরণের দৃষ্টির আমদানি করেছেন। সুতরাং ওরিজিন্যালিটির দাবি বিভূতিভূষণ করতে পারেন না। তাছাড়া রলার শিশু-জঁা ক্রিস্তফের বিশ্লেষণ আরও নিপুণ ও সমৃদ্ধ। তবু রলাঁর দ্বারা প্রভাবিত হলেও বিভূতিভূষণ যেভাবে অপু-দুর্গার চোখ দিয়ে জীবনকে দেখিয়েছেন তাতে তাঁর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। শুধু পথের পাঁচালী গ্রন্থখানির মূলে যে দুটি শিশু চরিত্র রয়েছে তা নয়, বিভূতিভূষণের কল্পনার মূলেই রয়েছে এক শিশুহৃদয়। এ বিষয়ে তাঁকে লেখা মোহিতলালের এক পত্রের তিনি উল্লেখ করেছেন। মোহিতলাল লেখেন, 'বিভূতিভূষণের কল্পনার মূলে আছে সৃষ্টির প্রাণলীলার অসীম রহস্যে আত্মহারা শিশুমানবের সুস্থ অনুভূতি, দারিদ্র্য শোক তাপ এমন-কি মৃত্যুবিভীষিকাও যে জীবনানন্দকে দমন করতে পারে না—সেই অপরাজিত হৃদয়ের দুর্দমনীয় বস্তুর সচেতনা, অসীম কৌতূহলবাপ্য রূপ-পিপাসা। জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর যেন শক্তি পরীক্ষা চলেছে—বন্ধনের সঙ্গে মুক্তির, দুঃখের সঙ্গে আনন্দের। একটি আত্মনির্লিপ্ত বা আত্মহারা রসচৈতন্য নিয়তির ওপরেও জয়ী হচ্ছে। সর্বস্ব হারিয়েও চিত্তগহনের কোনখান থেকে নিরন্তর সান্ত্বনা কিছুতেই ফুরোতে চাচ্ছে না।'

পথের পাঁচালীতে বিভূতিভূষণের কবিহৃদয়ের নিবিড় গ্রামপ্রীতি ফুটে

উঠেছে। নিশ্চিন্দিপুরের গাছপালা, লতাপাতা, ঝোপঝাড়, ঋতুতে ঋতুতে পরিবর্তনশীল বনশ্রী প্রভৃতির রূপ তাঁর চোখে যেমন পরিচিত তেমনি আবার চিরনতুন। এত দেখেও বিভূতিভূষণ যেন বলতে চান, 'বড় বিস্ময় লাগে'। দিলীপ রায় বলেছেন, এর কারণ তাঁর প্রকৃতিই হচ্ছে বিস্মিত হওয়া। 'এ সম্ভব হয়েছে শুধু এইজন্যে যে, স্রষ্টার তৃতীয় নয়ন বিভূতিভূষণের সহজাত।' তাই তাঁর কাছে তৃণাঙ্কিত মাঠও যেমন নগণ্য নয়, তেমনি অতি সামান্য ঘটনাও তুচ্ছ নয়। দুই-ই রহস্যময়।

বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচিত্রণের কথা আলোচনা করতে গিয়ে দিলীপ রায় বলেছেন, আমাদের সাহিত্যে বিভূতিভূষণ এ ব্যাপারে অতুলনীয় নন। কারণ তাঁর আগে রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্র গ্রন্থের অন্তর্গত চিঠিপত্রে প্রকৃতির ভাবমূর্তি দেখিয়েছেন, শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত গ্রন্থে নিশীথ-অভিযান ও শ্মশানচিত্রে প্রকৃতির এক গরীয়ান্ রূপ দেখিয়েছেন। তবু বিভূতিভূষণ গ্রাম্য জীবনের প্রতি এক অসাধারণ মমতায় অনন্য। রবীন্দ্রনাথ গ্রাম বাঙলার প্রকৃতি ও মানুষকে ভালবেসেছেন তাঁর কবিকল্পনায়, শরৎচন্দ্র ভালবেসেছেন তাঁর গভীরবেদনায় (গ্রাম্য প্রকৃতিকে নয়, নিপীড়িত মানুষকে), আর বিভূতিভূষণ সব জড়িয়ে গ্রামকে ভালবেসেছেন তাদেরই একজন হয়ে। তাই বলে তিনি যে গ্রামের মানুষের ঈর্ষা দৈন্য হৃদয়-হীনতা সম্বন্ধে উদাসীন তা নয়। তাঁর গ্রামপ্রীতি ঠিক গ্রাম্যজীবনের জন্যে প্রীতি নয়, তাঁর প্রকৃতিপূজা ঠিক প্রকৃতির চিররম্যোৎসবের ঐকান্তিক পূজা নয়—তাঁর ভালোবাসা হল মাটির টান, যাকে আমরা বলি আজন্মসংস্কার। 'অপু মাটি দেখিতে না পাইলে থাকিতে পারে না।' দিলীপ রায় বলেছেন, এইখানে তিনি অদ্বিতীয়। সোঁদালিফুলের ঝাড়, সাঁইবাবলা ও বাঁশবন, উদাসী বাউলের মতো কাঁচামাটির পথ, ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ, কলরবরত খেয়ানৌকোর যাত্রিদল—এইসব নিয়ে অপু গ্রামের মাটি ভালবাসে। এ মাটি তার কাছে শুধু মৃন্ময়ী মৃত্তিকা নয়, নিগূঢ় বন্ধনে বাঁধা চিন্ময়ী লীলাসঙ্গিনী।

দিলীপ রায় সব শেষে বলেছেন, বিভূতিভূষণের উদ্দিষ্ট না হলেও পথের পাঁচালীতে স্বাভাবিকভাবে একটি প্রশ্ন ফুটে উঠেছে। সে প্রশ্ন, গ্রামের সঙ্গে শহরের সম্পর্ক রক্ষার। পথের পাঁচালীর শেষে হরিহর যেখানে নিশ্চিন্দিপুরের বাস উঠিয়ে কাশীতে গেল ও সেখানে মারা গেল এবং জীবনধারণের ও অপুকে মানুষ করার জন্যে সর্বজয়াকে রাঁধুনিবৃত্তি অবলম্বন করতে হল সেখানে আপনা-আপনিই এই প্রশ্ন জেগেছে, 'গ্রাম্যজীবনের বিসর্জনী কি এখন মানুষকে গাইতেই হবে? বরণ করে নিতেই হবে এই অর্থহীন ইটকাঠের বোঝা, ঠোকাঠুকির

চকমকি, উত্তেজনার হররা, কর্মযজ্ঞের ধূম? লীলার চরম সার্থকতা নিহিত কি এই শ্রীহান বৈচিত্র্যে, অর্থহীন জটিলতায়, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে নাড়ীর টান, হৃদয়ের রসের সঙ্গে নীরবতার যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, মনের কুঞ্জে ফুলফোটানোর সঙ্গে শিশিরবর্ষী অবসরস্নিগ্ধ সমাহিত জীবনের যে অপরিহার্য যোগসূত্র সে সবকে কি নির্দয় হয়ে ছিন্ন না করলেই চলবে না? এই কি এখনকার নিষ্করুণ যুগধর্ম? শান্তির সঙ্গে গতির কি কোনো সন্ধি, কোনো সামঞ্জস্যই সম্ভব হবে না, হতে পারে না?' দিলীপ রায় বলেছেন, বিভূতিভূষণ এ সমস্যার কোন সমাধান করেননি, অপুকে তিনি ঘরছাড়া করে পথে বার করেছেন। কিন্তু অপু যদি পুনরায় নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে আসতে চায় তাহলে তার কী অবস্থা হবে সে সম্বন্ধে তিনি কোন উচ্চবাচ্য করেননি। 'তবে ইঙ্গিতে জানিয়েছেন যে, তাহলে গতিকটা বড় সুবিধের হবে না।' হরিহরের মৃত্যুর পর সর্বজয়ার অবশ্য নিশ্চিন্দিপুরে ফেরার কথা একবার মনে হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়েছে, দেশে তো ভিটে ছাড়া আর কিছুই নেই। তাছাড়া, গ্রামের যে ঝি-বৌদের কাছে ভবিষ্যৎ জীবনের সুখের ছবি এঁকে সে চলে এসেছে তাদের কাছে সহায়সম্বলহীন বিধবার বেশে সে কীভাবে ফিরে যাবে?

পথের পাঁচালী শুধু বাঙালির কাছে নয়, বাঙলা-জানা বিদেশির কাছেও যে কী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৩২ সালের ৮ই মার্চ তারিখে অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভায়। পরদিনের *Liberty* পত্রিকায় এই সভার বিস্তৃত বিবরণ বার হয়। এই সভায় বক্তা ছিলেন এডওআর্ড টমসন এবং সভাপতি ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ভারতীয় সাহিত্য যাতে বিশ্বের দরবারে পরিচিত ও পরীক্ষিত হয় সেজন্যে টমসন কতকগুলি প্রস্তাব পেশ করেন। এই সভাতেই তিনি *Oxford Book of Bengali Verse* এবং ভারতীয় সাহিত্যের *Year Book* প্রকাশের কথা বলেছিলেন। সেই সঙ্গে বলেছিলেন, পৃথিবীতে পথের পাঁচালীর মত বই যে লেখা হয়েছে অথবা পরিচয়-এর মত পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে এ কথা সবার জানা দরকার। তাঁর অপর প্রস্তাব ছিল, যে বিশিষ্ট ভারতীয় সাহিত্য সৃষ্টি সারা পৃথিবীতে সাড়া আনবে তার জন্যে স্বতন্ত্রভাবে নোবেল প্রাইজ জাতীয় কোন পুরস্কার দেওয়া উচিত। টমসনের দ্বিতীয় প্রস্তাব খুব সাধু হলেও, সুচিন্তিত নয়। কারণ যে বই পৃথিবীতে সাড়া আনবে সে বইকে তো নোবেল প্রাইজই দেওয়া উচিত।

বছর কয়েক আগে সঞ্জয় ভট্টাচার্য পূর্বাশায় লিখেছিলেন, 'বাজারে তখন গুজব ছিল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যের নোবেল প্রাইজ পাবেন। মধ্য

কলকাতায় তাঁর মেসের ঘরে গিয়েও তাঁর মুখে সেই গুজবের কথা শুনলাম।' কিন্তু নোবেল প্রাইজ পেলেন সে বছর (১৯৩৩) আই. এ. বুনিন।'[১] টমসনের পথের পাঁচালী সম্বন্ধে প্রশংসা এবং ভারতীয় সাহিত্যের জন্যে নোবেল প্রাইজ জাতীয় পুরস্কারের প্রস্তাব সম্ভবতঃ এই দুটি ব্যাপার মিলে সাধারণ মানুষের মনে ধারণা হয়েছিল, বিভূতিভূষণ সে বছর নোবেল প্রাইজ পাচ্ছেন।

পরিচয় পত্রিকায় ১৩৪০ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় পুস্তক-পরিচয় বিভাগে চারুচন্দ্র দত্তের রুক্ষ রাও গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পথের পাঁচালী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান মন্তব্য প্রকাশ করেন। এমন গ্রন্থের আলোচনা তাঁর আগেই করা উচিত ছিল কথা স্বীকার করে তিনি লেখেন, 'আধুনিক অনেক ভালো গল্প সম্বন্ধে আজও কোনো মত দিই নি—সেই অপরাধ হল নিবিড়—যথা বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'।' পথের পাঁচালীর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, এর আখ্যানটা অত্যন্ত দেশি, কিন্তু তাই বলে কম আকর্ষণীয় নয়। কারণ কাছের জিনিশেরও অনেক পরিচয় আমাদের কাছে বাকি থাকে। আমরা আজন্মকাল যেখানে আছি সেখানে আছি বলেই যে তার সব জায়গায় প্রবেশ করতে পেরেছি, সব জানতে পেরেছি তা নয়। 'পথের পাঁচালী যে পাড়াগাঁয়ের কথা সেও অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়।' রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন বিষয়গত নতুনত্বের কথা বলেছেন অপরদিকে তাঁর রচনার কথায় বলেছেন, বিভূতিভূষণ এই নতুনকে রচনার অক্ষমতায় ঝাপসা অথবা মনোহরণের জন্যে সস্তা করে ফেলেননি। পথের পাঁচালী খুব খাঁটি, খুব উঁচুদরের কথা এবং এই সত্যের জোরে সে দাঁড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, পথের পাঁচালীতে আমরা নতুন কিছু পেলাম, যা নতুন হয়েও চিরন্তন—সারস্বত ভাষায় যাকে আমরা বলি চিরায়ত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দিলীপ রায়ের বক্তব্যের আশ্চর্যরকম মিলের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এমন-কি উভয়ের প্রকাশভঙ্গিরও আশ্চর্যরকম মিল লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পথের পাঁচালীর আখ্যানটা অত্যন্ত দেশি। কিন্তু কাছের জিনিসেরও অনেক পরিচয় বাকি থাকে। যেখানে আজন্মকাল আছি সেখানেও সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে না। পথের পাঁচালী যে বাংলা পাড়াগাঁয়ের কথা সেও অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়।' দিলীপ রায় বলেছেন, 'যেসব অকিঞ্চিৎকর ঘটনা নিত্য আমাদের চোখে পড়ে অথচ চির অচেনাই থেকে যায় পথের

---

১ মাঘ ১৩৭০, সম্পাদকীয়।

পাঁচালীর কবি তাদের নিকট-পরিচয়ের আনন্দেই আত্মহারা, সমীপ-স্পর্শেই বিভোর।'

শুধু বাঙলাদেশে নয়, বিদেশেও যে পথের পাঁচালী নিয়ে আলোচনা ও বিদেশি পাঠকের সঙ্গে তার যথাসম্ভব পরিচয়ের চেষ্টা হয়েছিল তার সংবাদ লণ্ডন থেকে প্রকাশিত Indian Art and Letters পত্রিকা মারফত জানা যায়। এই পত্রিকার এবং London School of Oriental and African Studies-এর তরফ থেকে অনুষ্ঠিত এক যুক্ত সাহিত্যসভায় শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায় 'আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ধারা' সম্বন্ধে ১৯৪৩ সালের ৮ই জুলাই বক্তৃতা দেন। এই সভার সভাপতি ছিলেন এডওঅর্ড টমসন। বক্তৃতাটি উপরিউক্ত পত্রিকায় এই বছরেই প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত প্রবন্ধে শিশিরকুমার বিশেষ করে পথের পাঁচালী সম্বন্ধে একটি অনতিদীর্ঘ আলোচনা করেন। লেখক পথের পাঁচালী (The Wayfarer's Song) এবং অপরাজিতকে (The Undefeated) রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের সবচেয়ে স্মরণীয় গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'The most interesting and perhaps the most original work of the period has been done by Bibhutibhusan Bandyopadhyay···after the main body of Tagore's poetry, this is the most significant achievement in Bengali literature'। বিদেশি পাঠকের সঙ্গে পথের পাঁচালীর বিষয়বস্তুর পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে তিনি বলেন, এই গ্রন্থে বাঙলাদেশের অজ পাড়াগাঁয়ের প্রকৃতির মাঝখানে অপুর মতো এক দরিদ্র শিশুর অনুভূতি ও কল্পনাপ্রবণ মনের কীভাবে বিকাশ হল তাই দেখান হয়েছে। বিভূতিভূষণ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি এবং সহানুভূতি দিয়ে এই শিশু-নায়কের হর্ষ-বেদনা এবং আশা-নিরাশার ছবি এঁকেছেন। তাঁর ভাষায়, 'The Wayfarer's Song tells the story of a little boy born of poor middle class parents in a remote Bengali village, how he grows up in a perfect harmony with his surroundings, how every sight, smell or sound speaks to his sensitive nature and excites imagination. Bibhutibhusan has described the joys and sorrows, the disappointments and ambitions of his hero with insight and sympathy.'

গ্রন্থটির অভিনবত্বের প্রসঙ্গে উক্ত লেখক বলেন, এমন করে গ্রাম বাঙলার শান্ত সৌন্দর্য বাঙলা সাহিত্যে এর আগে কেউ দেখাননি। এই উপন্যাসে

প্রকৃতি শুধু পশ্চাৎপট নয়, এক সজীব সত্তা। সে অপরের ভালবাসায় সাড়া দেয়। 'He has seen the quiet beauty of a Bengali village as none has seen it before. His gift for revealing the spirit of a landscape is unique. For, in his novel Nature is not a mere decorative background but a living person capable of being loved and responding to love.'

শিশিরকুমার বলেছেন, পথের পাঁচালীর অপর গুণ এর ভাষার অপূর্বতা। বিভূতিভূষণ মনের সূক্ষ্ম, দুর্লভ অথচ স্বাভাবিক অনুভূতিগুলি অতি সুন্দর ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। পথের পাঁচালীর বর্ষান্ধকার রাত্রির ছবি, ঝড়ের শব্দ, ভেজা গায়ে মায়ের হাতের স্পর্শানুভূতি প্রভৃতির কথা উত্তর জীবনে অপুর মনে পড়েছিল, যেমন পড়েছিল প্রুস্তের *A la Recherche du Temfis Perdu*র নায়কের। এইসব নিবিড় অনুভূতির প্রকাশে বিভূতিভূষণ বাঙলা সাহিত্যে অতুলনীয়। 'The other interesting feature of the Wayfarer's Song is that Bibhutibhusan has found words to describe the most subtle shades of feeling, the most rare and yet perfectly natural sensations; how little Apu wakes up in the middle of night in the thatched hut in darkness, finds his mother fast asleep and hears the pattering of rain on all sides, and what a strange effect the confusion of the sound of wind and rain, the surrounding darkness, the touch of his sleeping mother had on his mind and how he remembered it afterwards. Readers of *A la Recherche du Temfis Perdu* will remember how the very taste of a cup of tea evoked a train of association in the mind of Proust's hero, till a long vista of his past life flashed before his eyes as if in a mirror. In Bengali literature Bibhutibhusan is without a rival in the expression of these significant moments.'

সবশেষে প্রবন্ধকার বলেছেন, পথের পাঁচালীর উৎসসন্ধান এক দুষ্কর কাজ। অথচ বাইরে থেকে তাকে খুব সহজ বলে মনে হয়। বিভূতিভূষণ শরৎচন্দ্রের মত পল্লিকেন্দ্রিক ঔপন্যাসিক। কিন্তু এ মিল একান্তই বহিরঙ্গের। কারণ বিভূতিভূষণের উপন্যাসে প্রকৃতি যেখানে অন্যান্য চরিত্রের মত প্রাধান্য পেয়েছে,

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে প্রকৃতি সেখানে পটভূমিমাত্র। আবার, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লিসমাজের যে প্রাধান্য, বিভূতিভূষণের উপন্যাসে তা অনুপস্থিত। ভাষার ওপর রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের প্রভাব থাকলেও পথের পাঁচালী তার পায়ের নীচের মাটি থেকে রস সংগ্রহ করে আধুনিক উপন্যাস সাহিত্যে আপন স্বকীয়তায় এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি হয়ে আছে। তাঁর ভাষায়, 'It is a spontaneous growth of the soil and stands apart from all contemporary novels in splendid isolation'।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যের সবচেয়ে বিতর্কিত গ্রন্থ অপরাজিত। একদা এই গ্রন্থের সার্থকতা ও ব্যর্থতা নিয়ে বিচিত্রা ও পরিচয় পত্রিকাতে একাধিক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৩৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের বিচিত্রায় মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য 'পথের পাঁচালী ও অপরাজিত' এই নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। দিলীপ রায়ের আলোচনা যেমন প্রধানতঃ পথের পাঁচালী সম্বন্ধে প্রথম বিস্তৃত আলোচনা, মহিমারঞ্জনের আলোচনা তেমনি প্রধানতঃ অপরাজিত এবং বিভূতিভূষণের সাহিত্য সম্বন্ধে প্রথম বিস্তৃত আলোচনা। মহিমারঞ্জনের এই প্রবন্ধেব পূর্বে পথের পাঁচালী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রবাসীতে অপরাজিত-এর প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়েছে। পথের পাঁচালী ও অপরাজিতকে মহিমারঞ্জন আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন। বিভূতিভূষণের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে তাঁর প্রথম বক্তব্য, লেখকের আশ্চর্য প্রকৃতিপ্রীতি। উভয় গ্রন্থে তাঁর প্রকৃতিপ্রীতির প্রাথমিক ও সাধারণ পরিচয় উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন, অপরাজিততে বিভূতিভূষণের প্রকৃতিবোধের বিবর্তন ঘটেছে। পথের পাঁচালীর অপু মাঠঘাট, নদীবন, ফুলফল সব নিয়ে নিশ্চিন্দিপুরকে ভালবেসেছে এবং ভালবাসার নিবিড়তায় প্রকৃতির সৌন্দর্যের অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। মহিমারঞ্জনের ভাষায়, 'বিশেষ প্রকৃতিরই একটা সৌন্দর্য অপুতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল।' পরবর্তীকালে প্রমথনাথ বিশী অপুর সম্পর্কে বলেছিলেন, 'অর্ধেক মানব তুমি অর্ধেক প্রকৃতি।' অপরাজিততে সেই অপুর প্রকৃতিবোধের বিবর্তন হয়েছে। তার মনে হয়েছে, প্রকৃতির সৌন্দর্যের মাঝখানে অসীম রহস্যময় এক প্রকৃত সৌন্দর্য লুকিয়ে রয়েছে। পথের পাঁচালীতে যে অপু ভিজে মাটির গন্ধ, বনকুসুমের সৌরভ নিয়ে নিশ্চিন্দিপুরের পল্লিপ্রকৃতির সৌন্দর্যে আত্মহারা, অপরাজিততে সেই অপু এই দৃশ্যমান প্রকৃতির মায়া-যবনিকা সরিয়ে তার অসীম রহস্যময় মর্মস্থলে আসীন। অপুর প্রকৃতিবোধের বিবর্তনের কথা লিখতে গিয়ে মহিমারঞ্জনের সম্ভবতঃ মনে পড়েছে অপরাজিত-এর সেই স্মরণীয়

জায়গা, 'এই পৃথিবীর একটা আধ্যাত্মিক রূপ আছে, এর ফুলফল, আলোছায়ার মধ্যে জন্মগ্রহণ করার দরুন এবং শৈশব হইতে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার দরুন এর প্রকৃত রূপটি আমাদের চোখে পড়ে না। এ আমাদের দর্শন ও শ্রবণ-গ্রাহ্য জিনিসে গড়া হইলেও আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও ঘোর রহস্যময়, এর প্রতি রেণু…অসীম জটিলতায় আচ্ছন্ন…।'[১] মহিমারঞ্জন যথার্থই বলেছেন, অপরাজিততে অপুর মন বিস্তৃত ও গভীর হয়েছে। পথের পাঁচালীর অপু শুধু নিশ্চিন্দিপুরের পল্লিপ্রকৃতিকে ভালবেসেছে, কারণ তার বাইরে সে প্রকৃতির অন্যরূপকে তখনও দেখেনি। অপরাজিত-এর অপু তার সঙ্গে মধ্য-প্রদেশের আরণ্যপ্রকৃতি এবং প্রকৃতির অন্তরশায়ী এক সজীব সত্তাকে ভালবেসেছে। লেখক অপুর প্রকৃতিবোধের বিবর্তনের কথাই শুধু বলেছেন, জীবনবোধের বিবর্তনের কথা উল্লেখ করেননি। অথচ তার এই দুই বোধই এক মৌলিক উপলব্ধি থেকে। প্রকৃতির এই দৃশ্যমান রূপের মাঝখানে সে যেমন অরূপের সন্ধান পেয়েছে, তেমনি দুর্গা-সর্বজয়া-অপর্ণার মৃত্যুর মাঝখানে অমরতার আভাস পেয়েছে; বিভূতিভূষণের ভাষায় 'সে এক শাশ্বত রহস্যভরা গহন গভীর জীবন-মন্দাকিনী'।

প্রকৃতিপ্রীতির পথ ধরে মহিমারঞ্জন অপুর সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্বের এক অভিযোগ এনেছেন। বলেছেন, অপুর ভালবাসা সীমাবদ্ধ। তার ভালবাসা শুধু গ্রাম-বাঙলার প্রতি, শহর-বাঙলার প্রতি নয়। এমন কি কল্পনায়ও সে শহরকে সহ্য করতে পারে না। তাই বিলেতকে দেখে জুনিপারের বনে, প্রাচীন নর্মান দুর্গের মাঝখানে, গ্রীসকে দেখে অলিভ-মার্টল কুঞ্জে, মিশরকে দেখে নলখাগড়ার বনে, নীলনদের ধারে। এ তো গেল তার স্বপ্নের কথা, জাগরণে সে কলকাতাকে একেবারে সহ্য করতে পারে না, বরাবরই তাকে ঘৃণা করে।

অপুর নিবিড় পল্লিপ্রীতির কথা ভাবতে ভাবতে মনে হয়—অপুর পক্ষে এমন হওয়াই বোধ হয় স্বাভাবিক। কারণ যে প্রকৃতিকে ভালবাসে সে শহরে তার অভাব দেখে বলেই শহরকে ভালবাসতে পারে না, সহ্য করতে পারে না। কিন্তু সত্যিই কি অপু কলকাতা ভালবাসে না? প্রকৃতিপ্রীতি তার মনের অনেকটা অংশ জুড়ে আছে বটে, কিন্তু তাই কি অপুর সব? তা হলে কলকাতা থাকাকালে সে তার কলেজ-জীবনকে, শীলেদের অফিসের অসহায় টাইপিস্ট নৃপেনকে, তার ও অপর্ণার প্রতিবেশিনী পিন্টুর মাকে, দরিদ্র কবিরাজ-বন্ধু ও তার স্ত্রীকে কী করে

---

১ অপরাজিত (৬ষ্ঠ মুদ্রণ), ২৬ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩১৬।

ভালবাসল? অপুর জীবনের বিবর্তন কি তার বৃহত্তর জীবনবোধে নয়, যে বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে উপন্যাসের শেষে বলেছে, 'সুখ ও দুঃখ দুইই অপূর্ব। জীবন খুব বড় একটা রোমান্স, বেঁচে থেকে একে ভোগ করাই রোমান্স—অতি তুচ্ছতম হীনতম, একঘেয়ে জীবনও রোমান্স'।[১] জীবনের এই রোমান্সরাজ্যে প্রবেশের অন্যতম সদর দরজা প্রকৃতি, তাই সে প্রকৃতিকে এত ভালবাসে। বিভূতিভূষণ এই গ্রন্থের সমকালীন তাঁর এক দিনলিপিতে বলেছেন, 'প্রকৃতির নিরাবরণ মুক্ত রূপের স্পর্শে এই (অনন্তের) অনুভূতি খোলে। সুপ্ত আত্মা জাগ্রত হয় চৈত্র-দুপুরের অলস নিমফুলের গন্ধে, জ্যোৎস্না-ভরা মাঠে, আকন্দফুলের বনে, পাখীর বেলা-যাওয়া উদাস গানে, মাঠের দূর পারে সূর্যাস্তের ছবিতে, ঝরাপাতার রাশির সোঁদা সোঁদা শুকনা শুকনা সুবাসে'।[২] অপুর বিরুদ্ধে শহর-বিদ্বেষের অভিযোগ যথার্থ নয়। বরং এই কথাই কি ঠিক নয়, সে যখন স্কুলের পড়া শেষ করল তখন দেওয়ানপুরের হেডমাস্টারমশাই তাকে বলেছিলেন, 'পাড়াগাঁয়ের কলেজে খরচ কম পড়ে বটে কিন্তু সেখানে মন বড় হয় না, চোখ ফোটে না, আমি কলকাতাকেই ভালো বলি।' এবং অপুও সেই বৃহত্তর জীবনবোধের সন্ধানে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও কলকাতায় এসেছিল। এই কলকাতাতেই সে অনিল-প্রণব-লীলার ভালবাসা, অপরদিকে প্রীতি-সুরেশদা-উড়ে ঠাকুরের অপমান পেয়েছে, দুঃখসুখের তিক্ত-মধুর রসে জীবনের রোমান্সকে উপলব্ধি করতে শিখেছে। যে কলকাতায় থাকার ফলে তার সঙ্গে জীবনের রোমান্সের পরিচয় সেই কলকাতাকে সে ঘৃণা করবে কেমন করে? আসলে অপু যাকে অপছন্দ করেছে সে শহর নয়, মানুষের হৃদয়হীনতা। এ ব্যাপারে শহর বা গ্রাম বলে বিভূতিভূষণের কোন পক্ষপাত নেই। তাই পথের পাঁচালীতে তিনি সুনীলের মা (সেজ বৌ), অন্নদা রায় এবং পরবর্তীকালে আরণ্যক-এ রাসবিহারী সিং, নন্দলাল প্রভৃতির মত হৃদয়হীন মানুষের চিত্র আঁকতে দ্বিধান্বিত হননি।

মহিমারঞ্জন প্রবন্ধের শেষাংশে পথের পাঁচালী-অপরাজিত-এর গুটিকয়েক অপ্রধান চরিত্রের আলোচনা করেছেন। কাজলের কথায় লেখক যথার্থই বলেছেন, সে তার পিতা অপুর মত গঙ্গানন্দপুরের বা কলকাতার আবেষ্টনের সঙ্গে নিবিড়-ভাবে মিশে যেতে পারেনি। এখানকার দৃশ্য ছায়াছবির মত তার চোখের সামনে আসা-যাওয়া করেছে, মনের মধ্যে কোন ছাপ রাখতে পারেনি। তার

১ অপরাজিত (৬ষ্ঠ মুদ্রণ), ২৫ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩৯০।

২ তৃণাঙ্কুর (৪র্থ মুদ্রণ), পৃঃ ৫৩-৪।

৩ অপরাজিত (৬ষ্ঠ মুদ্রণ), ৪ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৭০।

কারণ কাজল যেখানে মানুষ হয়েছে তার চারপাশে নিশ্চিন্দিপুরের মত নয়নাভিরাম প্রকৃতি নেই। দ্বিতীয়তঃ, কাজল একান্তই একা, তার জীবনে দুর্গার মত দিদি বা পটুর মত সাথী নেই। মহিমারঞ্জন বলেছেন, পথের পাঁচালীর উপেক্ষিত চরিত্র গুলকী, গোকুলের বৌ এবং বোষ্টমদাদু। এই চরিত্রগুলি অপ্রধান হয়েও অবিস্মরণীয়। অপরাজিততে অপু তার পুরন সঙ্গীসাথী সতুদা, দেবব্রত, সত্যেন, সুরেশ্বর, সবার দেখা পেয়েছে ; কিন্তু এরা চিরতরে বিদায় নিয়েছে। অথচ পাঠকের মনে এইসব ক্ষণস্থায়ী চরিত্রগুলি এত গভীরভাবে তাদের ছাপ রেখে গিয়েছে যে তাদের উত্তরজীবনের পরিণতি সম্বন্ধে বরাবর একটা কৌতূহল থেকে যায়। পরবর্তীকালে নীহাররঞ্জন রায়ও তাঁর প্রবন্ধে এই কথা বলেছিলেন। মহিমারঞ্জন সব শেষে এনেছেন লীলার কথা। তিনি লীলা চরিত্রের সমালোচনার চেয়ে পরিচয় দিয়েছেন বেশি। এবং সে পরিচয় একান্তভাবে তাঁর সহানুভূতি-মিশ্রিত। বলেছেন, লীলার মত এমন তেজস্বিনী মেয়ের শোচনীয় পরিণাম পাঠককে অত্যন্ত ব্যথিত করে তোলে। পরবর্তীকালে নীহাররঞ্জন এই প্রসঙ্গে লীলার জীবনের শুধু বিপুল ব্যর্থতার নয়, তার ঔপন্যাসিক সম্ভাবনার সুন্দর ইঙ্গিত করেন। বর্তমান প্রবন্ধের যথাস্থানে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পরিচয় পত্রিকায় ১৩৩৯ সালের শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যার পুস্তক-পরিচয় বিভাগে নীরেন্দ্রনাথ রায় অপরাজিত-এর সমালোচনা করেন। বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পর এই প্রবন্ধটি ১৩৫৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসের পরিচয়-এ সম্পাদকের মন্তব্য-সহ 'অপরাজিত ও বিভূতিভূষণ' এই নামে পুনর্মুদ্রিত হয়। নীরেন্দ্রনাথ অপরাজিত-এর পরিচয় প্রসঙ্গে প্রথমে পথের পাঁচালীর আলোচনা করেন। কারণ তাঁর মতে অপরাজিত কোন স্বতন্ত্র উপন্যাস নয়, তা পথের পাঁচালীর সম্প্রসারণ। পথের পাঁচালী নিয়ে সারস্বত আলোচনার আগে তিনি গ্রন্থটির অনন্য সৌভাগ্যের উল্লেখ করেন। বলেন, পথের পাঁচালী বিভূতিভূষণের প্রথম উপন্যাস হওয়া সত্ত্বেও তার ভাগ্যে যে খ্যাতি ও স্তুতি জুটেছিল তা বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনার ভাগ্যে জোটেনি। কথাটি বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের এবং সাধারণভাবে অধিকাংশ গ্রন্থকারের ক্ষেত্রে সত্য হলেও শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে কিন্তু সত্য নয়। ১৩১৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় ভারতীতে অপরিণত বয়সের প্রথম লেখা বড়দিদি বাদ দিলে শরৎচন্দ্রের যথার্থ আবির্ভাব ১৯১৩ সালে ফণীন্দ্র পাল সম্পাদিত যমুনা পত্রিকায়। শরৎচন্দ্রের কথায়, 'আমার সত্যিকারের সাহিত্যিক জীবন বলতে যা বুঝায় তা ১৯১৩ সাল থেকেই আরম্ভ হয়েছে।'

তখন ফণী পালের 'যমুনা' মাসিক পত্রিকাখানা মর-মর—আমিও সবেমাত্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসেছি—ফণীবাবু আমাকে তাঁর কাগজের জন্য কিছু লিখতে অনুরোধ করেন।' এই অনুরোধের ফলেই 'রামের সুমতি' (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯), 'পথনির্দেশ' (বৈশাখ ১৩২০) এবং 'বিন্দুর ছেলে' (শ্রাবণ ১৩২০) গল্প তিনটির সৃষ্টি এবং শরৎচন্দ্রকে নিয়ে বাঙলা সাহিত্যে সাড়া। ইংরেজিতে অনূদিত শ্রীকান্ত-এর ভূমিকায় টমসন এ ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন—'This became at once extremely popular, and made me famous in one day. In Bengal perhaps I am the only fortunate writer who has not had to struggle'।

পথের পাঁচালীর খ্যাতির কথা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নীরেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সাহিত্যের ইতিহাসে সমসাময়িক প্রতিভার ভিত্তি অনেক স্থানেই কতকগুলি সাময়িক কারণের সমাবেশ' এবং পথের পাঁচালীও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। গ্রন্থটির খ্যাতির সাময়িক কারণ, যুগোপযোগিতা। পথের পাঁচালী যখন বেরিয়েছে তখনও পর্যন্ত বাঙলার সামাজিক জীবন প্রধানতঃ পল্লিকেন্দ্রিক। বাঙালির ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা হৃদয়াবেগ শুধু নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্প পল্লিজীবনকে কেন্দ্র করে। সেই পল্লিশ্রীর স্বপ্ন শরৎচন্দ্রের লেখা পড়ে আমাদের ভাঙল এবং সেই থেকে বাঙলা সাহিত্যের টান অতিরিক্তমাত্রায় শহরমুখী হয়ে পড়ল। একদিকে পল্লিবিদ্বেষের মাত্রাধিক্য, অপর দিকে বাঙলা সাহিত্যকে আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের শ্রেণীতে তোলার জন্যে একদল পশ্চিমানুরাগী বাঙালি সাহিত্যিকের উৎকট প্রচেষ্টায় সাধারণ পাঠকের শ্বাসরোধের উপক্রম হল। এমন এক সংকট মুহূর্তে মুক্তির বার্তা আনলেন বিভূতিভূষণ এবং সেই সাময়িক সুযোগের সদ্ব্যবহারে পথের পাঁচালীর সুখ্যাতি হল। সাময়িকতার কারণ দেখানর পর নীরেন্দ্রনাথ এইবার খুঁজেছেন পথের পাঁচালীর সার্থকতার স্থায়ী কারণ। বলেছেন, শরৎচন্দ্র এবং বিভূতিভূষণ উভয়ের সাহিত্যের বিষয় গ্রাম-বাঙলা, কিন্তু দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিভূতিভূষণ নিপুণভাবে শরৎচন্দ্রের এলাকার পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। বিভূতিভূষণের পল্লিচিত্র শরৎচন্দ্রের পল্লিচিত্রকে সমর্থনও করে না, আবার অস্বীকারও করে না। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বিভূতিভূষণের তুলনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, শরৎচন্দ্র যেখানে এঁকেছেন পল্লিসমাজ, বিভূতিভূষণ সেখানে এঁকেছেন পল্লিগৃহ। এবং সে গৃহও সম্পূর্ণ নয়। সর্বজয়া-ইন্দির ঠাকরুনের সংসারে হরিহরের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। নীরেন্দ্রনাথ পল্লিচিত্রের বাস্তবতা বিচার করতে গিয়ে ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর

মতে, ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যুর যে করুণ চিত্র বিভূতিভূষণ এঁকেছেন তা কোন পল্লিগ্রামে ঘটা সম্ভব নয়। তিনি বিশ্বাস করেন, বাঙলার পল্লিসমাজ যতই পাপদুষ্ট হোক, অসহায় মুমূর্ষুকে সেবাশুশ্রূষা করার মত হিতবুদ্ধি তার আছে। লেখক যার উপর নির্ভর করে ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যুর অস্বাভাবিকতা নির্ণয় করেছেন তা আর্ট নয়, ব্যক্তিগত বিশ্বাসের তথা বাস্তবতার নিকষ। সর্বজয়ার দরিদ্র সংসারে ইন্দির ঠাকরুনের স্থানাভাব, বিতাড়ন এবং তাকে রাখার ব্যাপারে প্রথমে গ্রামবাসীদের উৎসাহ ও পরে উদাসীনতা, ফলে ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যু— এগুলি উপন্যাসে স্বাভাবিকভাবেই এসেছে বলে মনে হয়। আর ইন্দির ঠাকরুন তো দীর্ঘকাল রোগ ভোগের ফলে মারা যায়নি, বার্ধক্যে ও পরিচর্যার অভাবে সহসা মারা গিয়েছে। সুতরাং দীর্ঘকাল রোগভোগের প্রসঙ্গ থাকলে গ্রামবাসীর সেবাযত্নের কথা উঠতে পারত। যাই হোক, পূর্বপ্রসঙ্গের জের টেনে বলা চলে পথের পাঁচালীর পল্লিগৃহচিত্র সম্পূর্ণ নয় এবং বিভূতিভূষণও পল্লির অবিকৃত চিত্র অঙ্কন করতে চাননি। পল্লি-পরিবেশ অপু-দুর্গার মত দুটি শিশুহৃদয়ে কী প্রভাব ফেলে তাই তিনি দেখাতে চেয়েছেন। গ্রন্থকার ও গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, বিভূতিভূষণ বিস্ময়বোধের কবি এবং পথের পাঁচালী বিস্ময়বোধের কাব্য। এই গ্রন্থের বিপুল আয়তনকে লেখক শিশুচিত্তবিকাশের অবকাশে ভরে দিয়েছেন। নিশ্চিন্দিপুরকে তিনি অপু-দুর্গার বিস্ময়দৃষ্টি দিয়ে দেখিয়েছেন এবং বাঙলা সাহিত্যে এইখানেই পথের পাঁচালীর অভিনবত্ব ও সার্থকতা। নীরেন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণের সঙ্গে দিলীপ রায়ের মতের মিল আছে। তিনিও বলেছিলেন, এর আগে বাঙলা সাহিত্যে শিশুর চোখ দিয়ে জগৎকে এমনভাবে দেখান হয়নি। নীরেন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে যা বলেননি তা দিলীপ রায় বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এ দেখা বাঙলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণে প্রথম হলেও সাহিত্যে প্রথম নয়। কারণ তাঁর আগে *Jean Christophe* গ্রন্থে রলাঁ এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। সেই সঙ্গে বলেছিলেন, রলাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েও বিভূতিভূষণের বৈশিষ্ট্য কিন্তু নষ্ট হয়নি। নীরেন্দ্রনাথ পথের পাঁচালী সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা শেষে বলেছিলেন, বহিঃপ্রকৃতির সানুরাগ পর্যবেক্ষণ-শক্তিতে বিভূতিভূষণের আসন ডবলু. এইচ. হাডসনের শ্রেণীতে। অবশ্য একথা পূর্বেই বিভূতিভূষণের সংবর্ধনা-সভায় নীরদচন্দ্র চৌধুরী উল্লেখ করেছিলেন।

নীরেন্দ্রনাথ তাঁর মূল আলোচনায় বলেছেন, অপুর নিশ্চিন্দিপুরে ফেরার উন্মুখতা থেকে শুরু করে চব্বিশ বছর বাদে নিশ্চিন্দিপুরে ফেরা পর্যন্ত—এই দীর্ঘ চব্বিশ বছরের অপু-চরিত্রের বঙ্কিম ইতিহাসই অপরাজিত। এই ইতিহাস পথের

পাঁচালী থেকে শুরু হলেও অপরাজিততে তার প্রকৃতি বদলেছে। লেখক এই দুই গ্রন্থের পার্থক্য প্রসঙ্গে বলেছেন, পথের পাঁচালীর প্রধান চরিত্র নিশ্চিন্দিপুর আর অপরাজিত-এর—অপু। অবশ্য নিশ্চিন্দিপুর অপরাজিত-এর অপুর চোখের আড়ালে গেলেও তার মনের গভীরে ঠাঁই পেয়েছে। তাই অপরাজিত-এর অপু একদিকে যেমন নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃতির স্মৃতি রোমন্থন করেছে অপর দিকে তেমনি এই গ্রাম্যপ্রকৃতির উন্মুক্ত পাঠশালার পাঠ নিয়ে মধ্যপ্রদেশের আরণ্যপ্রকৃতিকে উপভোগ করতে শিখেছে। অপরাজিততে চব্বিশ বছরের জীবনের চড়াই-উৎরাই ভেঙে অপু বৃহত্তর জীবনবোধের অধিকারী হতে চেয়েছে। কিন্তু নীরেন্দ্রনাথ বলেছেন, জীবন দীর্ঘ হলেও অভিজ্ঞতার স্বল্পতা এবং দৃষ্টির অগভীরতায় অপুর জীবনবোধ প্রগাঢ় হয়নি। তার কারণ, অপু ভূলোকের সামান্য তৃণগুচ্ছ থেকে দ্যুলোকের বিরাট নীহারিকা ও নক্ষত্রমণ্ডল পর্যন্ত নিজেকে যতখানি বিস্তৃত করতে পেরেছে মানবজগতের ক্ষেত্রে ততখানি সে পারেনি। লেখক অভিযোগ করেছেন, বিভূতিভূষণ বিপুল জীবনানন্দের ও রোমান্স-প্রিয়তার দোহাই দিয়ে অপুকে সর্বপ্রকার প্রলোভন এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে দূরে রেখেছেন। অপুর জীবনে যেটুকু সংঘর্ষ আছে তা শুধু দারিদ্র্যের সঙ্গে, অথচ দারিদ্র্যই তো জীবনের সব নয়। অপুকে লেখক 'সর্ববিধ অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রলোভন প্রেমাবেগ, ভাববিপ্লব আদর্শবিভ্রাট থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। অথচ জীবনের এই জটিলতাকে জানলে তবেই তো জীবনকে জয় করা সার্থক। যে তা জানল না সে অপরাজিত কোথায়? সে তো অপরিণত। নীরেন্দ্রনাথের ভাষায়, 'গভীরতার ও জটিলতার অভাবে কেন্দ্রীয় চরিত্রের পরম দুর্বলতাই উপন্যাসখানির প্রধান ব্যর্থতা।' কেন্দ্রীয় চরিত্র ছাড়া অন্যান্য চরিত্র—এমনকি লীলাও, যার মধ্যে জটিলতার অবকাশ ছিল—একান্তই মামুলি। অপু চরিত্র সম্বন্ধে নীরেন্দ্রনাথের যে অভিযোগ তা যথার্থ। চরিত্র হিশেবে অপু যে একেবারেই জটিল নয় এবং সে অর্থে অপরাজিত নয়, অপরিণত এ কথা ঠিক।

নীরেন্দ্রনাথের এই অভিযোগের যথার্থতা মেনে নিয়ে এবার তার প্রাসঙ্গিকতায় আসা যাক। অপরাজিত গ্রন্থে বিভূতিভূষণ অপরাজিত বলেছেন কাকে—অপুকে না অন্য কিছুকে? এই ব্যাপারে গোপাল হালদারের একটি স্মৃতিকথার উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রবাসী অফিসে অপরাজিত-এর নাম নিয়ে একদিন বিভূতিভূষণের সঙ্গে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর ঘোর তর্ক। গোপাল হালদারও সেই আলোচনায় উপস্থিত। উভয়ের আলোচনা শুনে গোপাল হালদার বলেছিলেন, 'অপরাজিত মানে Life Force—এই কি আপনার কথা? তা হলে ঠিকই

তো এ নাম।'[1] বিভূতিভূষণ শুনে খুশি হয়েছিলেন। অপরাজিত গ্রন্থে বিভূতিভূষণ জীবনরহস্যকেই কি অপরাজিত বলতে চাননি ? বিষ্ণুরাম রায়—বীরু রায় —ইন্দির ঠাকরুন—হরিহর—সর্বজয়া—অপুর মধ্য দিয়ে যে জীবনের ধারা আজ কাজলে এসে পৌঁচেছে তাকে উপলক্ষ করে কি তিনি বলেননি, 'যুগে যুগে অপরাজিত জীবনরহস্য কি অপূর্ব মহিমাতেই আবার আত্মপ্রকাশ করে!' সেই রহস্যের সন্ধানে অপুর মনে হয়েছে 'সে দীন নয়, তুচ্ছ নয়—এটুকু শেষ নয়, এখানে আরম্ভও নয়। সে জন্মজন্মান্তরের পথিক আত্মা।' অপরাজিততে বিভূতিভূষণ বলতে চেয়েছেন এই সবটা নিয়েই হচ্ছে বৃহত্তর জীবন. পৃথিবীর জীবনটুকু তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। বৃহত্তর জীবনসংজ্ঞার লক্ষণটি স্থির করে নিয়ে তিনি অপুকে ক্রমশঃই পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। এই জীবনসংজ্ঞার লক্ষণ নিয়ে মতান্তর থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু বিভূতিভূষণের লক্ষণ অনুযায়ী অপু কোথায় অপরিণত ? পথের পাঁচালীর যে অপু, অপরাজিত-এর পূর্বার্ধের যে অপু প্রিয়জনবিরহের বেদনায় কাতর ও জীবনের অর্থহীনতায় বিভ্রান্ত, অপরাজিত-এর শেষার্ধের সেই অপু মহাজীবনের অস্তিত্বের বিশ্বাসে শান্ত ও তন্ময়। একি তার অপরিণতির লক্ষণ? হর্ষ-বিষাদে, সঙ্গতি-বৈষম্যে যার মনে হয়েছে 'সবটা মিলিয়ে অপূর্ব রসসৃষ্টির আর্ট', তাকে কি অগভীর বলা চলে ?

এইবার অপুর চরিত্র প্রসঙ্গে যে জটিলতার অভাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল তার যৌক্তিকতা বিচার করে দেখা যাক। নীরেন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন, পৃথিবীর সামান্য তৃণগুচ্ছ থেকে আকাশের নীহারিকা ও নক্ষত্রমণ্ডল পর্যন্ত তার দৃষ্টি বিস্তৃত। এই উদার বিশালতার ফলেই তার চরিত্রের জটিলতা এত কম। জীবনকে এত বড় করে জানার বাসনা যার মধ্যে, যার দৃষ্টি জন্মজন্মান্তরের বীথিপথে দূরবিস্তৃত, এই জীবনকে যে বৃহত্তর জীবনের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ বলে মনে করে তার পক্ষে জীবনের সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি নিয়ে জটিল হওয়ার অবকাশ কি খুব বেশি ? কিন্তু খুব বেশি না থাক, জটিলতার অপেক্ষাকৃত স্বল্প উপস্থিতি যে অপু চরিত্রের উৎকর্ষ কমিয়েছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। অপুর চরিত্রে যদি স্বাভাবিক মানুষের মত জটিলতা থাকত তাহলে আমরা তাকে আরও নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতে পারতাম। তার জটিলতার সিঁড়ি বেয়ে মহাজীবনের মুক্তাঙ্গনে আরও স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারতাম। তা হয়নি বলেই যে অপরাজিত সার্থক রচনা হয়নি অথবা অপু চরিত্র ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে এ কথা বোধ হয় ঠিক নয়। তাছাড়া

১ শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৭৫, 'পথের পাঁচালী', গোপাল হালদার।

অপু চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা আদর্শবিভ্রাট একেবারেই নেই এ অভিযোগ নীহাররঞ্জন রায় খণ্ডন করেন। সে আলোচনা যথাস্থানে বিস্তৃতভাবে করা হয়েছে। আসলে অপরাজিত এত ভাল লাগে বলেই তার সামান্য ত্রুটি আমাদের অত্যন্ত পীড়িত করে।

নীরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধের শেষে অপরাজিত-এর খুঁটিনাটি বিবরণে যে ভুল রয়েছে তার উল্লেখ করেছেন। যেমন, মাঘ মাসের কয়েক মাস পরে সরস্বতী পুজো, পুজোর ছুটির পূর্বে হকি খেলার সীজন ইত্যাদি।

নীরেন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি প্রকাশের পরে ১৩৩৯ সালের কার্ত্তিক সংখ্যার বিচিত্রায় 'অপরাজিত' নামে নীহাররঞ্জন রায়ের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। নীহাররঞ্জনের প্রবন্ধ মৌলিক হলেও এর কিছুটা অংশ নীরেন্দ্রনাথের অভিযোগের জবাব। নীরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে অপরাজিত সম্বন্ধে যে-সমস্ত অভিযোগ এনেছেন লেখক সেগুলি খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন, পরে গ্রন্থটি সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিযোগ পেশ করেছেন এবং অবশেষে পথের পাঁচালী-অপরাজিত-এর আলোচনা করেছেন। নীহাররঞ্জন প্রথম আপত্তি, অপুর বিরুদ্ধে আনীত বৈচিত্র্যহীনতার অভিযোগ নিয়ে। 'তাঁহার চিত্রিত চরিত্রগুলি হয় মামুলী ধরণের প্রাণহীন জড পদার্থ' নীরেন্দ্রনাথের এই উক্তি নীহাররঞ্জনের সম্ভবতঃ স্মরণে ছিল। যাই হোক, বৈচিত্র্যহীনতার অভিযোগের জবাবে লেখক বলেছেন, নিশ্চিন্দিপুরের বাল্যজীবন থেকে শুরু করে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত অপু কি বহু বিচিত্র অবস্থা ও ঘটনার মধ্যে দিয়ে যায়নি? অবশ্য মনে প্রশ্ন উঠবে, তার যৌবনকালে তার 'Sex Life'-এর পরিচয় তো আমরা পেলাম না। তার কারণ হিসেবে নীহার-রঞ্জন বলেছেন, স্বভাবের দিক থেকে অপু বড মুখচোরা ও লাজুক, আদর্শপ্রবণ ও কল্পনাবিলাসী। নীহাররঞ্জন এখানে অবশ্য মূল প্রশ্নের ঠিক জবাব দেননি, ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ অপু মুখচোরা ও লাজুক হতে পারে কিন্তু বয়সের এই প্রবল ধর্মের সঙ্গে তার স্বভাব রফা করল কী করে, কী করে সে শুধল সেই 'আদিপক্কের ঋণ'? বিভূতিভূষণ তার উদ্গিরণ বা অবদমন কি গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে দেখিয়েছেন? 'Sex Life'-এর অনস্তিত্বের কারণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন— অপুর আবেষ্টন। অপু ছেলেবেলা থেকে যে আবেষ্টনে বড় হয়ে উঠেছে সে আবেষ্টন 'Conscious Sex Life'-কে বর্ধিত করার পক্ষে অনুকূল নয়। অপুর সঙ্গে যে সব মেয়ের পরিচয় হয়েছে তারা এক বিশেষ জাতের মেয়ে, সে জাত 'মঙ্গলরূপিণী' মায়ের জাত।

নীহাররঞ্জনের দ্বিতীয় আপত্তি, অপুর বিরুদ্ধে আনীত অপরিণতির অভিযোগ

সম্বন্ধে। নীরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'জীবনের জটিলতাকে জানিলে তবেই জীবনকে জয় করা সার্থক—যে তাহা জানিল না সে কিসে অপরাজিত ? তাহার সারা জীবনই তো অপরিণত।' এই অভিযোগের উত্তরে লেখক বলেছেন, এ অপরিণতি তার প্রাণের, এই তার স্বভাব। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন, অপু স্বভাবের দিক থেকে শিশু এবং যেহেতু শিশুকে আমরা অপরিণত বলি তাই অপুকেও অপরিণত বলা চলে। কিন্তু নীহাররঞ্জন বলেছেন, এ নেহাৎই আনুষ্ঠানিক বিচার। কারণ প্রকৃতির সামান্য ইঙ্গিতে যে মন সাড়া দেয় সে শুধু আমাদের শিশুমন নয়, চিরন্তন মন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি উল্লেখ করেছেন, অপরাজিত-এর শেষাংশে অপুর গভীর জীবনবোধের। অপু অপরিণত হলে তা কি কখনও আসতে পারত ? তৃতীয়তঃ বলেছেন, অপু যদি অপরিণত হত তাহলে সে আর দশজনের মত নিশ্চিন্দিপুরে জমিজমা দেখে, নয় মনসাপোতায় পুরুতগিরি করে জীবন কাটিয়ে দিত। যে অপরিণত 'সে এত বড় স্বপ্ন দেখতে পারে না, এত বড় আদর্শের পেছনে পাগল হয়ে ছুটতে পারে না।' অবশেষে নীহাররঞ্জন পরিণতির মানদণ্ডের কথা তুলেছেন। বলেছেন, আমরা পরিণতির বিচার সাধারণতঃ নিজেদের দৃষ্টি-অনুযায়ী করি। এ বিচার ঠিক নয়, 'অপুর জীবনকে দেখার ভঙ্গি দিয়ে অপুব বিচার করতে হবে।' তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে তার পরিণতি ঠিক হয়েছে কিনা দেখতে হবে। তা করলে দেখা যাবে 'তার মন, তার দৃষ্টি কোথাও নিশ্চল হয়ে নেই—তার পরিধি দিনের পর দিন বড় হয়ে সমস্ত পৃথিবীকে বেষ্টন করেছে'। লেখক বলেছেন, এই তো তার মত পরিণতি। তবে স্বীকার কবেছেন, এ পরিণতি অবশ্য একটু একঘেয়ে।

নীহাররঞ্জনের শেষ আপত্তি, অপুর বিরুদ্ধে :আনীত অন্তর্দ্বন্দ্ব-আদর্শ বিভ্রাটের অনুপস্থিতির অভিযোগ নিয়ে। অপুর :চরিত্রে যে সেগুলির অভাব নেই তার উদাহরণ হিশেবে অপর্ণার মৃত্যুর পর চাঁপদানিতে অপুর ইতরভাবে জীবনযাপন, কোন এক কোম্পানীর ধর্মঘটের সময় সেখানে চাকরি গ্রহণের চেষ্টা—এই সমস্ত ঘটনার তিনি উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া বলেছেন, অপুর অন্তর্দ্বন্দ্বের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার অন্তরাত্মার একাকিত্বে। অপুর আপন বলতে কেউ নেই, বন্ধু-বান্ধব বলতে কেউ নেই—নিঃসঙ্গতার এই দুঃখ দারিদ্র্যের চেয়েও ভীষণ। অবশ্য নীহাররঞ্জনের অনুমান সত্য হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মনে কি এই প্রশ্ন থেকে যায় না, অপরাজিততে এই দ্বন্দ্বের তেমন প্রকট পরিচয় কোথায় ? অপরাজিত উপন্যাস বলেই তার স্পষ্ট পরিচয়ের প্রত্যাশাও আমাদের বেশি।

পথের পাঁচালী ও অপরাজিত সম্বন্ধে নীহাররঞ্জন এইবার তাঁর নিজের

দু একটি অভিযোগের কথা তুলেছেন। তাঁর প্রথম অভিযোগ এই দুটি গ্রন্থে প্রাকৃতিক বর্ণনার পুনরুক্তি ঘটেছে। বিভূতিভূষণ এই দুই গ্রন্থে যথাক্রমে গ্রাম্য এবং আরণ্য প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই বর্ণনায় বৈচিত্র্য কম। বিশেষ করে গ্রাম্য প্রকৃতির বর্ণনার ক্ষেত্রে ভাষা ও রূপকল্প অধিকাংশই একধরণের। সেই সঙ্গে স্বীকার করেছেন, অমরকণ্টকের আরণ্য প্রকৃতির বর্ণনা কিন্তু অতুলনীয়। প্রাকৃতিক বর্ণনার মত আর-একটি বিষয়ে তাঁর পুনরুক্তি দোষ ধরা পড়েছে, সে বিষয় দূর-ভবিষ্যতের বর্ণনা।

পথের পাঁচালী ও অপরাজিত প্রসঙ্গে লেখকের দ্বিতীয় অভিযোগ—বিভূতিভূষণ কেন্দ্রীয় চরিত্র অপুকে ফোটাতে গিয়ে অন্যান্য চরিত্রের প্রতি অবহেলা প্রকাশ করেছেন। কথাসাহিত্যে চরিত্রের ঐক্যসূত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থেকেও লেখক বলেছেন, গৌণ চরিত্রের প্রতি অবহেলায় কেন্দ্রীয় চরিত্র অপুর 'interest' কতকটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ নীহাররঞ্জনের আপত্তি, এরা শুধু বিভূতি-ভূষণের উপেক্ষিত বলেই নয়। আরও মৌলিক কারণেই। তাঁর যুক্তি, গৌণ চরিত্র-গুলিকে বাড়তে দিলে অপু চরিত্রের 'interest' আরও নিবিড় হত। উদাহরণ হিশেবে তিনি লীলার চরিত্র নিয়েছেন। বলেছেন, লীলা অপুর জীবনে খুব বড় একটা স্থান জুড়ে আছে, কিন্তু বিভূতিভূষণ তাকে গ্রন্থমধ্যে বেশি জায়গা জুড়ে রাখেননি। লীলা চরিত্রের সম্ভাব্যতা বিভূতিভূষণ যদি আরও তলিয়ে দেখতেন তাহলে গল্পের 'interest' বাড়ত এবং অপুর জন্যে তার প্রয়োজনও ছিল। এর আগে মহিমারঞ্জনের প্রবন্ধে লীলার মর্মান্তিক পরিণতি নিয়ে লেখকের আক্ষেপই মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল, লীলা চরিত্রকে কীভাবে ফোটালে গ্রন্থের উৎকর্ষ বাড়ত তার আলোচনা ছিল না। সে আলোচনা নীহাররঞ্জনই করেন। তবে আলোচনার চিন্তাসূত্র হয়ত তিনি পূর্ববর্তী লেখকের কাছে পেয়ে থাকবেন।

নীহাররঞ্জনের শেষ অভিযোগ, গ্রন্থ-দুটিতে মৃত্যুর আধিক্য নিয়ে। তাঁর মতে অপুর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের জীবনে এতগুলি মৃত্যু অবাস্তব না হলেও এটা বিভূতিভূষণের উদ্দেশ্য প্রণোদিত বা 'bidout plot'। লেখক বলেছেন, এতগুলি মৃত্যু না হলে অপুর আদর্শের জয় যেন ঘোষিত হত না। প্রতিটি মৃত্যুতে একে-একে বন্ধন না খুললে অপু যেন অপরাজিত হত না। তাই লেখকের মনে প্রশ্ন জেগেছে, অপর্ণা, লীলা এদের বাঁচিয়ে রেখে, লীলার সঙ্গে তার সম্পর্ককে এতটা নিরাসক্ত না করে অপুকে কি অপরাজিত রাখা যেত না? লেখক বলেছেন, 'এক-একটা জীবনে যেন তার আদর্শের চাপ বাধা, এক-একটা মৃত্যুতে যেন সহজ হল, সুগম হল।' উদাহরণ হিশেবে তিনি সর্বজয়া, অপর্ণা,

লীলা এদের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ নীহাররঞ্জন বলতে চেয়েছেন, এরা সবাই অপুকে ভালবাসার বাঁধনে বেঁধেছে, তবু এ বাঁধন সোনার শেকলের বাঁধন। এদের মৃত্যুতে সে বাঁধন কেটেছে, অপু মুক্ত হয়েছে। মৃত্যুতে সর্বজয়া, অপর্ণা, লীলা এদের বাঁধন কেটেছে—এ কথা সত্য হলে কাজল সম্বন্ধে তিনি কী বলবেন? তার বাঁধন যে আরও নিবিড়, সে যে আসলেব সুদ। কাজলের প্রতি তার মমতা যে কত অধিক সে পরিচয় তো তাকে গঙ্গানন্দকাটি থেকে কলকাতায় নিজের কাছে নিযে আসার এবং শেষে তার আদিজননী নিশ্চিন্দিপুবের ক্রোড়ে রেখে যাওয়াব ঘটনায় ফুটে উঠেছে। শুধু মৃত্যুতেই জীবনের বাঁধন কাটে, এ কথা সত্য হলে কাজল বেঁচে আছে বলে অপুব বন্ধন কাটেনি এবং তদনুযায়ী অপু অপবাজিত হয়নি একথা কি বলা যাবে? আসলে ভাল করে লক্ষ কবলে দেখা যাবে, অপুব স্বভাবেব মধ্যেই আসক্তি-অনাসক্তিব বিরোধী অথচ সহজাত এক যুগ্ম প্রবৃত্তি আছে। সে সংসারীর মত একান্ত আসক্ত নয়, আবার সন্ন্যাসীর মত সম্পূর্ণ উদাসীনও নয়। আসলে অপু বাঙলা-দেশের এক গৃহী বাউল আব এই কাবণেই সে বোধ হয় আমাদের এত প্রিয়। নিশ্চিন্দিপুরের প্রতি তার মমতাও যত বেশি, নিশ্চিন্দিপুরের সীমানাব ওপারের জগৎকে জানার জন্যে তাব উৎকণ্ঠাও ততোধিক। দুর্গা, সর্বজয়া, অপর্ণা, লীলা এদের নিয়ে কাছের প্রতি ভালবাসাও তাব যত গভীর, দূর মধ্যপ্রদেশের অরণ্যশীর্ষের হাতছানিও তার কাছে তত লোভনীয়। মৃত্যু দিয়ে বিভূতিভূষণ কাজলকে অপুর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেননি। অপু কাজলকে ভালবেসেই দূরে গিয়েছে। সেজন্যে অপর্ণা বা লীলাকে বাঁচিয়ে রাখলে অপুকে যে অপরাজিত রাখা যেত না, তা বোধ হয় সত্য নয়। অপুব জীবনে এদের মৃত্যুর দাম আছে এবং সেই দাম দিয়ে সে জীবনকে চিনেছে। তবে তার জন্যে বিভূতি-ভূষণ এতগুলি মৃত্যু না ঘটালেও পারতেন।

নীহাররঞ্জন তাঁর প্রবন্ধের শেষাংশে গ্রন্থ-দুটির সার্থকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ আলোচনা তাঁর মূল প্রবন্ধের এক-তৃতীয়াংশ এবং সেদিক থেকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান্। নীরেন্দ্রনাথ অপরাজিত প্রসঙ্গে বলেছিলেন, বিভূতিভূষণ বড বই লিখলেও বড় লেখক নন। নীহাররঞ্জন কিন্তু তা মনে করেন না। তাঁব মতে বিভূতিভূষণ বড বই লিখেছিলেন এ কথা নিতান্তই অবান্তর, তিনি বড় স্রষ্টা। অর্থাৎ অপরাজিত শুধু বড় বই নয়, অপরাজিত 'great art'। নীহাররঞ্জন বলেছিলেন, 'কি দেশের কি বিদেশের আজকাল এই যুগের গল্প উপন্যাস যখন পড়ি, তার চতুরতা লিপিকৌশলে মানবচরিত্রের

সূক্ষ্ম জটিল বিশ্লেষণে আমরা মুগ্ধ হই···কিন্তু যতক্ষণ এ সব বই পড়ি, সর্বক্ষণই যেন মনে হয় চাপা বন্ধ গলি, lanes and alleysএর মধ্যে নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে, মুক্তির আলো কোনো দিক দিয়েই যেন দেখা যায় না।' কিন্তু বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী-অপরাজিত পড়ে পাঠক উদার উন্মুক্ত বিশালতার মধ্যে, 'creative freedom'-এর মধ্যে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। মানবজীবনের সূক্ষ্ম জটিলতার বিশ্লেষণ এ গ্রন্থে নেই এবং বিভূতিভূষণ তার চেষ্টাও করেননি। তিনি মানুষকে 'বুঝেছেন ও জেনেছেন যেখানে মানুষ সহজ ও স্বচ্ছন্দ, যেখানে সে একটা সুবৃহৎ পরিসরের মধ্যে নিজেকে মুক্ত করে দিয়েছে, যেখানে সে অসীম বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত, সীমাহীন প্রকৃতির সে আত্মীয় এবং আদিঅন্তহীন শাশ্বত কালের সঙ্গে সে নিজেকে এক করে অনুভব করেছে।' যে লিপিকৌশলের সাহায্যে এ বিশালতার আভাস সৃষ্ট হয়েছে তার কথায় লেখক বলেছেন, 'বিভূতিভূষণ জানেন স্মৃতির সাহায্যে কল্পনার সাহায্যে কি করে বর্তমানকে অতীত-ভবিষ্যতের মধ্যে বিসর্পিত করে আদিঅন্তহীন কালের সঙ্গে যুক্ত করে চিরন্তনের বিশালতার আভাস সৃষ্টি করা যায়।' নীহাররঞ্জন বলেছেন, পথের পাঁচালী-অপরাজিত অপুর জীবনকাব্য এবং বিভূতিভূষণ বিশালতার ভাবনার মাঝখানে অপুর জীবনকে সমগ্রভাবে দেখতে চেয়েছেন। এই সমগ্রভাবে দেখা সত্যদৃষ্টি এবং এই দৃষ্টিতেই মানুষ মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করে। এই দৃষ্টিতেই মানুষ এপিক লিখেছে, সুবিশাল কক্ষের দেয়াল জুড়ে বড় বড় ফ্রেসকো এঁকেছে। বিভূতিভূষণ এঁদেরই আত্মীয়। পথের পাঁচালী-অপরাজিত-এর বিপুল পরিসরে অপুর ক্রমবর্ধমান জীবনের ছবি দেখতে দেখতে তাঁর মনে পড়েছে নরওয়ের ভাস্কর গুস্তাভ ভিগেলাণ্ডের অতিকায় ভাস্কর্য 'Tree of Life'-এর কথা, যা আজও মানুষের কাছে 'epic in sculpture' হয়ে আছে।

পরিচয় পত্রিকায় ১৩৩৮ সালের কার্তিক-পৌষ সংখ্যার পুস্তক-পরিচয় বিভাগে পশুপতি ভট্টাচার্য বিভূতিভূষণের প্রথম ছোটগল্প-সংকলন মেঘমল্লার-এর আলোচনা করেন। এই গ্রন্থটির মাধ্যমে বিভূতিভূষণের লেখার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। তার পরে তিনি পথের পাঁচালী ও অপরাজিত পড়েন। 'এঁর লেখা এই প্রথম পড়লাম এবং একবার পড়েই চমৎকৃত হতে হয়েছে। উঁচুদরের গল্প-লেখকের যে প্রতিভা যা আমাদের দেশে দুর্লভ—এই বইখানির মধ্যে তারই সন্ধান পাওয়া গেল।' গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বিভূতিভূষণ তাঁর মেজমামা বলে উল্লেখ করেছেন পশুপতি ভট্টাচার্য তাঁকে কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র বলে মনে করেছেন। আসলে ইনি বিভূতিভূষণের

মাতুল। এঁর পিতা বর্ধমান শহরের খোশবাগানপাড়া-নিবাসী গুরুচরণ চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। লেখক শরৎচন্দ্র বিভূতিভূষণের মাতুল—এই ধারণায় অথবা সাধারণভাবে বাঙলা সাহিত্যের ধারার কথা ভেবে পশুপতি ভট্টাচার্য বলেছেন, শরৎচন্দ্রের 'ভাষাসম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে হয়তো ইনি পেয়ে থাকবেন।' সেই সঙ্গে আরও বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার প্রভাব এবং প্রভাতবাবুর ঘটনাবিন্যাসের পারিপাট্যও হয়তো গল্পগুলির মধ্যে দেখা যায়।' কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'এঁর ভাষায়, ভাবে এবং ধরণধারণে এমন-একটি উচ্চ অঙ্গের বৈশিষ্ট্য আছে যা একেবারে নূতন, স্বতন্ত্র এবং অননুকরণীয়।' এই উচ্চাঙ্গের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে তিনি প্রথমে বলেছেন গ্রন্থটির ভাষার কথা। ভাষার ওপর মেঘমল্লার-এর রচয়িতার দখল অনায়াস। গল্পগুলি পড়ে মনে হয়, তিনি যেখানে যেরকম আবহাওয়া ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে চান সেখানে সেই রকম উচিত কথা জোগাতে পারেন। 'প্রয়োজনমত ভাষা কোথাও সমুদ্রের গর্জনের মত গম্ভীর; কোথাও তটিনীর মত মৃদুগুঞ্জী; কোথাও মহান্ কল্পনার সঙ্গে তুচ্ছ কথার পাশাপাশি অপূর্ব সমাবেশ। ভাষার উপর এমন অধিকার রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং দৈবাৎ হয়তো আরও এক-আধজন ছাড়া আর কারো নেই।'

মেঘমল্লার-এর লেখকের দ্বিতীয় গুণ, অপূর্ব প্রকৃতিচিত্রণ-দক্ষতা। প্রকৃতির ছবি ফোটাতে গ্রন্থকারের দু-চার লাইনের বেশি বর্ণনার দরকার হয়নি। 'অল্প কথায়, অল্প উপকরণে এমন-সব মনোরম ছবি স্থানে স্থানে খাপ খাইয়ে বসানো যে পড়তে পড়তে শতবার বাহবা দিতে হয়। গ্রাম্য ঝোপঝাড়, বনবাদাড়, নদীর ধার-এঁর বড় প্রিয়।' লেখক বলেছেন, বিভূতিভূষণ যে চোখ দিয়ে পল্লির সৌন্দর্য দেখেছেন সে চোখ দিয়ে আমরা আগে কখনও দেখিনি। পল্লিপ্রকৃতির স্বাদ ও গন্ধ তিনি ভাষার মধ্য দিয়ে নিপুণভাবে পরিবেশন করেছেন।

সাম্প্রতিক সাহিত্যে যেখানে নরনারীর যৌনসম্পর্ক না থাকলে লেখা হয় না এবং হলেও জমে না সেখানে মেঘমল্লার 'নিরামিষ রচনা' হয়েও চমৎকার। বিভূতিভূষণ এই গ্রন্থে যে নারীমূর্তি এঁকেছেন সে নারী স্নেহে ও মমতায় করুণাময়ী এবং মঙ্গলরূপিণী। আধুনিক সাহিত্যে প্রেম বলতে হৃদয়ের যে বিশেষ ধরণের বৃত্তিকে বোঝায় এখানে তার অভাব সত্ত্বেও গল্পগুলিতে রোমান্সের কোন অভাব ঘটেনি। তিনি বলেছেন, 'রূপক হিসাবে এই কথাটারই আভাস দিয়েছে প্রথম গল্প 'মেঘমল্লার'।...কেউ চায় বাঁধতে, কেউ চায় মুক্তি দিতে। তাতে যদি পাষাণই হতে হয়—তবু পাষাণের বুক থেকে কত যে নির্ঝরিণীর

ধারণা হয়ে, তার প্রমাণ এই বইয়ের মধ্যে পাওয়া যায়।'

অন্যান্য গল্পের মধ্যে তিনি নাম করেছেন'উমারানী','পুঁইমাচা', খুকীর কাণ্ড' —এই তিনটি গল্পের। এইসব গল্পের চরিত্র আমাদের কাছে খুব চেনা হয়েও অবিস্মরণীয়। এই গল্পসংকলনের যে গল্পটি দিয়ে বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক-জীবনের শুরু সেই 'উপেক্ষিতা' গল্পটির কথায় তিনি বলেছেন, 'আমার মতে রসসৃষ্টি হিসাবে এইটাই শ্রেষ্ঠ রচনা। এ তো গল্প নয়, একখানা ছবি। · যেন সেই Impressionist Schoolএর ছবি। কয়েকটি মাত্র রেখা, মাঝে অনেকটা ফাঁকা।'

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা গেল, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এই গল্পটি পড়ে সেদিনের অখ্যাত লেখককে লিখেছিলেন, 'তোমার গল্পটি বড় মনোরম হইয়াছে! রচনা যেমন সুললিত তেমনি প্রাঞ্জল। পড়িতে আরম্ভ করিলে আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। দুঃখ হয় যে শীঘ্র ফুরাইয়া গেল। রুচিও সুমার্জিত। তুমি চেষ্টা করিলে এ বিষয়ে সুনাম অর্জন করিতে পারিবে।'

উপরি উক্ত পত্রিকায় ১৩৩৯ সালের মাঘ-চৈত্র সংখ্যার পুস্তক-পরিচয় বিভাগে গিরিজাপতি ভট্টাচার্য বিভূতিভূষণের ছোটগল্প-সংকলন মৌরীফুল-এর সমালোচনা করেন। লেখক তাঁর আলোচনার প্রারম্ভে বলেছেন, বিভূতিভূষণের প্রথম দুখানি উপন্যাস নিয়ে তখন এত অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনা হচ্ছিল যে সাধারণ পাঠক প্রায় ভুলতে বসেছিল বিভূতিভূষণের গল্পের দাবি কম নয়। প্রমাণ হিশেবে তিনি বলেছেন, প্রবাসীতে 'উমারানী' যখন প্রকাশিত হয় (শ্রাবণ ১৩২৯) তখন প্রায় এমন কোন বাঙালি পাঠক ছিল না যে এই গল্প পড়ে মুগ্ধ হয়নি। অথচ সেই 'উমারানী' ও আরও এমন কয়েকটি গল্প নিয়ে যখন মেঘমল্লার প্রকাশিত হল তখন পাঠকের দৃষ্টি আর তেমন আকৃষ্ট হল না। কিন্তু মৌরীফুল প্রকাশের সময় সে অবস্থার পরিবর্তন হয়। 'এখন বিভূতিবাবুর উপন্যাস সংক্রান্ত তর্কবিতর্ক স্তিমিত হয়েছে, এই অবসরে তাঁর দ্বিতীয় গল্পের বই মৌরীফুল প্রকাশিত হওয়ায় তাঁর গল্পের পরিচয় নেওয়ার সহজ অবকাশ উপস্থিত হবার কথা।' তিনি বলেছেন, বিভূতিভূষণ এই গল্পগ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করেছেন পল্লিগ্রাম এবং আমাদের জীবনের একান্ত অনাড়ম্বর ঘটনা থেকে। অবশ্য তাতে মাঝে মাঝে একটু বেশি করেই আড়ম্বর এসে পড়েছে। মৌরীফুল-এর পল্লিগ্রাম বিভূতিভূষণের তৈরি। তার একদিকে যেমন মানুষের গ্রাম্যতা, অজ্ঞতা, নির্মমতা, সরলতা, আতিথ্য ও সৌহার্দ্য অপরদিকে তেমনি প্রকৃতির অকৃপণ দান। গিরিজাপতির বিচারে এই সংকলনের মাত্র তিনটি গল্প—

'মৌরীফুল', 'রোমান্স' ও 'রাক্ষসগণ'—উল্লেখযোগ্য। বাকি গল্পগুলি নিরর্থক পণ্ডশ্রম, তাই তার আলোচনা তিনি করেননি। প্রথম তিনটি গল্পের মধ্যে আবার 'মৌরীফুল' গল্পটির মাত্র বিস্তৃত আলোচনা তিনি করেছেন। গল্পটিতে সুশীলার চরিত্রগত দ্বন্দ্ব উজ্জ্বল হয়েছে। 'এই করুণাবঞ্চিত, অত্যাচারিত, অন্তর্বেদনাপূর্ণ গ্রাম্য বধূটির জন্ত সকল পাঠকের হৃদয় আর্দ্র হয়ে উঠবে।' এই গল্পে সুশীলার অপমৃত্যু—যাকে তিনি দায়ে পড়ে খুন করা বলেছেন—অত্যন্ত অস্বাভাবিক। সুশীলার মৃত্যু সম্বন্ধে লেখকের এ অভিযোগ যথার্থ। সুশীলার মৃত্যুতে করুণ-রসের আধিক্য রয়েছে এ কথা না ভেবে পারা যায় না। তার অবাঞ্ছিত অখ্যাতি এবং শাস্তিস্বরূপ নির্বাসনের দণ্ডই তো পাঠকের সহানুভূতি সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট। 'রোমান্স' গল্পটি প্রসঙ্গে লেখক শুধু বলেছেন, 'দুই বোনের বালিকা-মনের ঈষৎ প্রেমের ইশারা ও তারতম্য এই গল্পটিকে রঙীন ও সুষমামণ্ডিত করেছে।' তৃতীয় গল্পটি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'রাক্ষসগণ'-এ সেবাপরায়ণ রেণুর নিঃস্বার্থ রমণীসুলভ অন্তরঙ্গতার চিত্র পাঠককে অন্তমনা করবে। এই গল্পটি সম্বন্ধে তাঁর অভিযোগ, রেণুর অকালবৈধব্যফল থেকে নিজে অব্যাহতি পাওয়ার জন্তে নায়কের যে উল্লাস তা সার্থক নয়, রূঢ়। কারণ লেখক নায়ককে গল্পের মধ্যে ইতর বা হৃদয়হীন করে সৃষ্টি করেননি, বরং রেণুর অন্তরঙ্গতায় মুগ্ধ করে দেখিয়েছেন। গিরিজাপতি এই গল্পের সূক্ষ্ম কটাক্ষটিকে বোধ হয় নজর করেননি। রেণুর অকালবৈধব্যাবস্থা দর্শনে সুরেশের যে উল্লাস সে তো মনুষ্যমাত্রেরই আত্মরক্ষার জৈব উল্লাস। তার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কোথায়? তবু স্বাভাবিক হয়েও মনুষ্যত্বের আদর্শে সুরেশ যে অপরিপূর্ণ তার জন্তে বিভূতিভূষণ কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। কিন্তু এটাই কি সুরেশের সব? সুরেশ তো শুধু আত্মরক্ষার জৈব উল্লাসে মনুষ্যজীব নয়, সে যে চরিত্রগত দ্বন্দ্বে মানুষ। তাই একবার তার যেমন মনে হয়েছে, 'কি বেঁচেই গিয়েছি! রাক্ষসীর ফাঁদই তো বটে!' আবার সেই সঙ্গে 'সুরেশের মনে দূর সম্পর্কিত সহানুভূতিশূন্য এক আত্মীয়ের দ্বারস্থ এই পিতৃমাতৃহীনা নিরপরাধা অভাগিনী বালিকার ছবিটি সম্পূর্ণ অন্তভাবে ফিরে এল। কার অপরাধে এই প্রস্ফুট-মুকুল প্রথম বসন্তের দিনে তার জীবনের আনন্দদীপটি নির্বাপিত হয়ে গেল চিরদিনের মত?' 'গ্রহের ফের' সম্বন্ধে লেখক যথার্থই বলেছেন, এই গল্পের নায়ক রাজচন্দ্রবাবুর তন্ময়তা ও মস্তিষ্কবিকৃতি মনকে খুব স্পর্শ করলেও, লেখার বিষয়টি সিদ্ধসত্যবিরোধী হওয়ায় শেষ পর্যন্ত গল্পটি ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। রাজচন্দ্রের প্রতিভার উৎকর্ষ দেখানর জন্ত তাকে এক ধূমকেতুর ভবিষ্যদ্বক্তা করা হয়েছে। কিন্তু ধূমকেতুর আবিষ্কর্তাদের নাম নিয়ে কল্পনা করা

হাস্তকর।

বিভূতিভূষণের প্রদর্শিত পল্লিজীবন সম্বন্ধে লেখকের অভিযোগ, তা 'রমণীয় কিন্তু অনতিগভীর।...যদি শরৎবাবুর লেখার সঙ্গে তুলনা...হয় তবে বলা চলে যেখানে বিভূতিবাবু নম্র সুষমাময় ও অনতিগভীর সেখানে শরৎবাবু কত সতেজ কত জীবন্ত কত বিশিষ্ট কত গভীর হতেও গভীরতর।' গিরিজাপতি এখানে গভীরতাব একটি বিশেষ দিকের কথাই ভেবেছেন। সে বিশেষ দিক জটিলতা। শরৎচন্দ্র এবং বিভূতিভূষণ উভয়ের লেখার বিষয় পল্লিজীবন হলেও উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সজাতীয় ভিন্নতা রয়েছে। নীরেন্দ্রনাথ যার জন্তে বলেছিলেন, শরৎচন্দ্র যেখানে এঁকেছেন পল্লিসমাজ, সেখানে বিভূতিভূষণ এঁকেছেন পল্লিগৃহ। সুতরাং দুটি ভিন্ন বিষয়কে নিয়ে কি এভাবে গভীরতার বা উৎকর্ষের পরিমাপ চলে? আরও সহজভাবে জিজ্ঞাসা করা চলে, পথের পাঁচালী-অপরাজিত-এর অপু, 'মেঘমল্লার'-এর প্রদ্যুম্ন, 'নাস্তিক'-এর লোকনাথ—এরা কি অনতিগভীর?

মৌরীফুল গল্পসংকলনটি থেকে গিরিজাপতি মাত্র তিনটি সার্থক গল্পের যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন তা অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। 'জলসত্র'-এর মত গল্প যাতে সেই গ্রাম্যবালিকাটি অসহ্য পিপাসায় বুনো কচুর ডাঁটা মুখে মারা গিয়েছিল 'আজ তারই স্নেহ করুণা এই বিরাট বটগাছটার নিবিড় ডালপালায় বেড়ে উঠে এই জলকষ্টপীড়িত পল্লীপ্রান্তরের একধারে পিপাসার্ত পথিকদের আশ্রয় তৈরি করেছে।—এরই তলায় আজ বিশ বছর ধরে সে মঙ্গলরূপিণী জগদ্ধাত্রীর মত দশ হাত বাড়িয়ে প্রতি নিদাঘমধ্যাহ্নে কত পিপাসাতুর পল্লীপথিককে জল জোগাচ্ছে'; অথবা 'দাতার স্বর্গ'-এর মত গল্প যাতে দাতা শ্রেষ্ঠী কর্ণসেন আত্মবিস্মৃত হয়ে জীবনে একবার মাত্র যথার্থ দান করার ভাগ্য করেছিলেন—এগুলি জীবনের গভীরতর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে কি সার্থক গল্প হয়নি? গিরিজাপতি এদের কেন 'নিরর্থক পণ্ডশ্রম'-এর পর্যায়ে ফেলেছেন জানি না।

পূর্বোল্লিখিত পত্রিকায় ১৯৪১ সালের মাঘ-চৈত্র সংখ্যার পুস্তক-পরিচয় বিভাগে বিভূতিভূষণের যাত্রাবদল গল্পগ্রন্থের সমালোচনা করেন গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। এর আগের গল্পগ্রন্থটি সম্পর্কে তাঁর প্রশংসা যেমন কুণ্ঠিত, এটির সম্পর্কে তাঁর প্রশংসা তেমনি অকৃপণ। "যাত্রাবদল' বিভূতিবাবুর হাতের একটি অপূর্ব গল্পগ্রন্থরূপে পরিগণিত হবে নিশ্চয়। এর গল্পগুলোতে গল্পরচনার যে স্তরে তিনি পৌঁছেছেন তাকে ছাড়িয়ে তাঁর আরও ঊর্ধ্বস্তরে যাওয়া সম্ভব কিনা তা আপাততঃ ধারণা করা শক্ত।' পূর্বগ্রন্থের পল্লিজীবন সম্বন্ধে তিনি যে অনতি-

গভীরতার অভিযোগ এনেছিলেন এখানে তা আনেননি। বরং বলেছেন, খাত্রাবদল-এ ব্যাপকতর পল্লিজীবন রূপায়িত হয়েছে। বাঙলা সাহিত্যে পল্লি-জীবনের রূপায়ণের পারম্পর্য বিচার করে তিনি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের গল্পে আমরা পল্লির স্নিগ্ধতা, শ্যামলতা ও রম্যতার প্রথম স্পর্শ পেলাম। এর পর শরৎচন্দ্রের লেখায় এই জীবনের উপর পীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ পাওয়া গেল। সবশেষে 'বিভূতিবাবুর গল্প আজ অন্য সুরে ক্ষমণীয় রেশ তুলে বলছে ব্যর্থ, অকৃতিময়, মূল্যহীন, দরিদ্র পল্লীজীবন আজও দরদী ও কবির কাছে সুধাভাণ্ডরূপেই বিরাজ করছে।' এই ব্যর্থজীবনের উদাহরণ হিশেবে তিনি 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পটির উল্লেখ করেছেন। এই গল্পে ভণ্ডুলমামার বাড়ি যেমন অসমাপ্ত, তার জীবনও তেমনি ব্যর্থ। 'কিন্তু তবু যেন এই বাড়ি বিশাল অরণ্যের গ্রাসে লুপ্ত হবার জন্যই 'অনন্তকাল অনন্তযুগ ধরে তৈরী হয়' ও তারই মাথায় ভণ্ডুলমামা ঠিক তারই মত জীবনজীর্ণ হয়ে 'উদ্দেশ্যহীন, অর্থহীন রূপে' গল্পের মধ্যে সঞ্জীবিত হয়ে বিরাজ করেন।' সমালোচক বোধ হয় নজর করেননি, এই গল্পে ভণ্ডুলমামার জীবনের ব্যর্থতা পাঠকচিত্তকে স্পর্শ করলেও গল্পটির আবেদন আরও গভীরে মনের এক মায়ারাজ্যে। ভণ্ডুলমামার বাড়ি তারই ছায়ামূর্তি। সে ছায়া শৈশবের কোনদিনটি থেকে যে পড়তে শুরু করে এবং কবে তার শেষ হয় তা মানুষের অজানা। আমাদের মনের এই ছায়াময় মায়ারাজ্যকে গল্পটিতে এমন উপযুক্ত ধূসরতা বা অস্পষ্টতার রঙে আঁকা হয়েছে যে মনে হয় এ যেন একটা হাল্কা জলরঙের ছবি। 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি উঠছে আজ থেকে নয়, জীবনের পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে যতদূর দৃষ্টি চলে ততকাল ধ'রে···যেন অনন্ত কাল, অনন্ত যুগ ধ'রে ভণ্ডুলমামার বাড়ির ইঁট একখানির পর আর একখানি উঠছে··· শিশু থেকে কবে বালক হয়েছিলুম, বালক থেকে কিশোর, কৈশোর কেটে গিয়ে এখন প্রথম যৌবনের উন্মেষ, আমার মনে এই অনাদ্যন্ত মহাকাশ বেয়ে কত শত জন্মমৃত্যু, সৃষ্টি ও পরিবর্তনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ভণ্ডুলমামার বাড়ি হয়েই চলেছে···ওরও বুঝি আদিও নেই, অন্তও নেই।' এই গল্পসংকলনের অন্যতম গল্প 'সার্থকতা' সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, বিভূতিভূষণের একটি প্রিয় বিষয় হচ্ছে—পল্লিবালকের বিদেশে গিয়ে উন্নতিলাভ ও তারপর একদিন নিজের গ্রামে ফিরে এই তথাকথিত সার্থকতার মূল্যবিচার করা। এসব গল্পের নায়করা যাকে সাফল্য ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে তার সম্বন্ধেই পরে ভাবে, জীবনে এইসবের মূল্য কী? লেখক সম্ভবতঃ এই গল্পের প্রসঙ্গে 'উপেক্ষিতা'র কথা ভেবেছেন। গিরিজাপতির

মতে 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি'র মত এই সংকলনের অন্যতম সেরা গল্প 'যাত্রাবদল'। গল্পের বিষয়বস্তুর পরিচয় দিয়ে বিভূতিভূষণের কৃতিত্বের কথায় তিনি বলেছেন, 'এর টিকিটবাবু ও নেশাখোর শ্মশানযাত্রীদের প্রতি গ্রন্থকারের লেখনীর মৃদুকোমল স্পর্শ বাঙলা গল্পসাহিত্যে দুর্লভ। তেমনি অভ্রান্ত নিপুণতায় তিনি এরই সঙ্গে গেঁথেছেন এই অভাগিনী পল্লিবধূটির অকালমৃত্যুর জন্য একটি দীর্ঘশ্বাস।' ভাষার বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, যাত্রাবদল-এর ভাষা বিশেষণবর্জিত ও নাতি-অলংকার বহুল।

পরিচয় পত্রিকায় ১৩৪২ সালের মাঘ-চৈত্র সংখ্যার পুস্তক-পরিচয় বিভাগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র বিভূতিভূষণের অন্যতম উপন্যাস দৃষ্টিপ্রদীপ-এর আলোচনা করেন। এই গ্রন্থটি প্রথমে প্রবাসীতে (ফাল্গুন ১৩৪০-চৈত্র ১৩৪১) প্রকাশিত হয়, পরে ১৩৪২ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে বার হয়। এর দু বছর বাদে প্রবাসীতে (কার্তিক ১৩৪৪-ফাল্গুন ১৩৪৫) আরণ্যক বেরয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দৃষ্টিপ্রদীপকে 'আরণ্যক পর্বের আধুনিক অবদান' বলেছেন। এখানে আরণ্যক পর্ব বলতে তিনি আরণ্যক গ্রন্থের নয়, অপরাজিত-এর আরণ্যক পর্বের কথাই বোধ হয় বুঝিয়েছেন। দৃষ্টিপ্রদীপ বিভূতিভূষণের তৃতীয় উপন্যাস। তাঁর কথাসাহিত্যের ধারার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন, মেঘমল্লার-এর যুগ থেকে তাঁর কাছে আমরা একটা বিশেষ রসের আস্বাদ পেয়ে আসছি। সে রস মধুর স্বচ্ছ গ্রাম্য রস। বিভূতিভূষণ তাঁর অনুভূতি-মাহাত্ম্যে এবং মর্মস্পর্শী অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে তাকে রূপায়িত করেছেন। 'পথের পাঁচালীতে পেলাম বাংলার পল্লীর অন্তর্লীন রূপ অপুর দৃষ্টি দিয়ে। তার আরণ্যকতা, গ্রাম্য জীবনযাত্রা অদ্ভুত সুসঙ্গতি পেল পারিপার্শ্বিক সহানুভূতিতে। প্রথম বোঝা গেল, মেঠো সুর ধরবার এক বিশেষ ভঙ্গিতে তাকে সুধীসমাজের কাছে উপাদেয় করে তোলা যায়। এজন্যে লেখককে সাম্প্রতিকদের আসরে প্রাথম্য না দিই প্রাধান্য দিতে বাধল না।' কিন্তু লেখক বলেছেন, অপরাজিততে এসে বাধল। অপরাজিততে অপুর জীবন শহরে আর সেই রসসংগতি পেল না, শহরের চলিষ্ণু রূপ ফোটাতে গিয়ে তাঁর হাতের তুলি কেঁপে গেল। আর এই ব্যাপারটা 'একটা লজ্জার মত সমস্ত বইটাকে সংকুচিত করে রাখে। মনে হল পথের পাঁচালীর এ অনুবৃত্তিটুকু না এলেই ভালো হত। মোটের ওপর বিভূতিবাবুর সৃজনী-প্রতিভার সীমানা পাওয়া গেল।' কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কি সত্যিই সীমানা পেলেন? পথের পাঁচালীর সীমানা কি অপরাজিত-এরও সীমানা? তার মেঠো সুর কি

অপরাজিত-এরও? পথের পাঁচালীর সীমানা কি নিশ্চিন্দিপুরের পল্লিজীবন নয়? কিন্তু অপরাজিত-এর সীমানাও কি তাই, না জন্মমৃত্যুতে গাঁথা 'বৃহত্তর জীবন'? পথের পাঁচালীর মেঠো গান কি অপরাজিততে এসে উচ্চাঙ্গের মহাসংগীত হয়ে বাজেনি? পরিচয়-এ কিছুদিন আগে নীরেন্দ্রনাথ উভয়গ্রন্থের পার্থক্য প্রসঙ্গে কি বলেননি—'একই অপুর জীবনকাহিনী হইলেও অপরাজিত ঠিক পথের পাঁচালীর সমধর্মী রচনা নহে।' 'বিভূতিভূষণ এই উপন্যাসে পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে একটা নতুন জগৎ খুলে দিয়েছেন'—দৃষ্টিপ্রদীপ-এর প্রচ্ছদপত্রের এই নির্দেশ পড়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন, বিভূতিভূষণ এইবার নতুন কিছু পরিবেশন করবেন। কিন্তু দৃষ্টিপ্রদীপ তাঁকে হতাশ করেছে। দৃষ্টিপ্রদীপ সাধারণ পাঠককে যে নিরুৎসাহ করে তার সব চেয়ে বড় কারণ, এই জগতের সঙ্গে তার পরিচয়ের অভাব। দৃষ্টিপ্রদীপ-এর জগৎ অতীন্দ্রিয়তার জগৎ। অথচ আমাদের সংসার এই ইন্দ্রিয়জগৎকে নিয়ে, যে জগতে জিতুর অন্তর্দৃষ্টির কোন ব্যাখ্যা দিতে পারা যায় না। গ্রন্থটির সামগ্রিক ব্যর্থতা সম্বন্ধে লেখকের যে অভিযোগ তা যথার্থ। তিনি আরও বলেছেন, গ্রন্থটি জিতুর জবানীতে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে রচিত না হয়ে যদি ডায়েরি-মাধ্যমে রচিত হত তাহলে 'তর্ক বা মন্তব্যের ধারা ভিন্ন দিকে বইত। সে ক্ষেত্রে নায়ক হতেন একক, পারিপার্শ্বিক গৌণ।' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে গ্রন্থের যে কি উৎকর্ষ বাড়ত তা বোঝা যায় না। ডায়েরি-মাধ্যমে রচিত হলে সাধারণের কাছে দৃষ্টিপ্রদীপ-এর জগতের কি অতিরিক্ত পরিচয় প্রকাশিত হত তা তিনি বলেননি। আসলে এ গ্রন্থ একান্তভাবেই আমাদের সাহিত্যের এলাকার বাইরে, কারণ সাহিত্য যে লৌকিক জগতের ওপর নির্ভর করে এখানে সে জগৎ প্রায় নেই বললেই চলে।

গ্রন্থের আখ্যানবস্তু বিচার করতে গিয়ে জ্যোর্তিরিন্দ্রনাথ বলেছেন, জিতুর অশরীরী উড়োজীবন লোচনদাসের আখড়ায় মালতীর প্রেমে আমাদের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এসেছে। এই ঘটনার ওপর শরৎচন্দ্রের কমললতার কাহিনীর প্রভাব স্বীকার না করে পারা যায় না এবং তুলনামূলকভাবে এ কথাও বলতে হয়, শরৎচন্দ্রের কাহিনীটি কত উৎকৃষ্ট। হিরণ্ময়ীকে নিয়ে জিতুর দ্বিতীয় প্রেমে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ-এর প্রভাব পড়েছে বলে লেখক উল্লেখ করেছেন। এখানে সম্ভবতঃ 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটির কথা তাঁর মনে ছিল। সবশেষে তিনি বিভূতিভূষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এ যাবৎ যে নৈহারিকতার চূড়ায় লেখক আশ্রয় নিয়েছেন সেটা ত্যাগ না করলে, ভাবোচ্ছ্বাসের বাষ্পে পাঠকদের উৎপীড়িত করেই

তুলবেন। এবার তাঁর cerebral cortexএর দিকে নজর দেবার সময় হয়েছে।' কিন্তু পথের পাঁচালী-অপরাজিত এবং তাঁর গল্পগ্রন্থগুলি পড়ে সত্যিই কি তাঁর মনে হয়েছে ভাবোচ্ছ্বাসের বাষ্পে বিভূতিভূষণ পাঠকদের উৎপীড়িত করে তুলেছেন? যে বিরাট জীবনচ্ছবি অপুর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছে, তাতে কি তাঁর মননশীলতার পরিচয় নেই, তাঁর ভাষায় 'cerebral cortex'-এর দিকে নজরের নজির নেই? মহাজীবনের সন্ধান কি ভাবোচ্ছ্বাসের বাষ্পে পাওয়া যায়?

শোক-সংবাদ

১৯৫০ সনের ১লা নভেম্বর বিভূতিভূষণ মারা যান। ঐ একই দিনে আরও এক বিখ্যাত সাহিত্যিক গত হয়েছিলেন। তিনি জর্জ বার্নাড শ। লেখাই বাহুল্য একজন তখনই সারা বিশ্বের, আর একজন তখনও পর্যন্ত প্রধানতঃ বাঙলা-দেশেরই লেখক। কারণ পথের পাঁচালীর তখনও অনুবাদ হয়নি এবং সত্যজিৎ রায়ও ছবিতে আসেননি। তবু সেদিন সারা বিশ্বের জন্যে বাঙলাদেশের আয়-তনকে কোথাও কম করতে হয়নি বা বিভূতিভূষণকেও শয়ের জন্যে বেশি মরতে হয়নি।

না, দেশি-বিদেশি কোন সংবাদপত্রেই নয়।

বিভূতিভূষণের শোক-সংবাদ সব কাগজগুলিতেই অত্যন্ত জীবিত ও ব্যক্তিগত।

দুটি মৃত্যুর কথা মনে রেখে প্রমথ বিশী লিখেছিলেন, 'এ সপ্তাহ কমলাকান্তের বন্ধু বিয়োগজনিত শোক-সপ্তাহ। দূরের কাছের একাধিক বন্ধুর পরলোকগমনের সংবাদ পাইয়া সে কাতর। কাছের আঘাতই তীব্রতর হয়, সেই বেদনাই প্রবলতরভাবে দেখা দিয়াছে।…অপরাজিত গ্রন্থাবলী তাঁহার প্রতিনিধিরূপে বিরাজ করিতে থাকিবে। কিন্তু বন্ধুর মৃত্যুতে বন্ধুর যে ক্ষতি হইল তাহার পূরণ হইবে কিরূপে? বিভূতিভূষণের মত এমন বন্ধু কি আর পাওয়া যাইবে? সংসারে স্বার্থের সূত্রে বন্ধুত্ব হয়, মতবাদের সূত্রে বন্ধুত্ব হয়, আবার নিছক হৃদয়ের টানেও বন্ধুত্ব হইয়া থাকে। বিভূতিভূষণের বন্ধুত্ব শেষোক্ত পর্যায়ের'।

তারাশঙ্কর লিখেছিলেন, 'তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের যে মাধুর্য আমার জীবনের বিগত কয়েক বছর আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, আজ সহসা যে সে পরিচয় অতীতের স্মৃতিমাত্র এই চেতনা আমার সমস্ত চিন্তাকে পঙ্গু করে রেখেছে।… তবু আমি জানি, এই স্মৃতি আমার ব্যক্তিগত জীবনের পরমৈশ্বর্য'।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে লেখা বিভূতিভূষণের একটি গল্প 'খেলা'—বন্ধুহারাকে বিমূঢ় করে রেখেছে। 'এই প্রসঙ্গে অল্প কিছুদিন আগে প্রকাশিত বিভূতিভূষণের একটি গল্প আমাকে বেদনায় চঞ্চল করে তুলেছে—'বাবা মতিলাল'—ছেলে বাবাকে এই বলেই ডাকে, বাবা ঘোড়া সাজেন, বাবা সঙ্গী হয়ে ছেলেকে চেনান

গাছ-বন পাশের পৃথিবী। বাবা ছেলেকে নিয়ে গেলেন নদীতে; ছেলেকে স্নান করিয়ে তীরে রাখলেন; তারপর নিজে নামলেন স্নানে। সহসা নিয়তি বজ্র হানলে; কুমীরে ধরলে মতিলালকে; প্রাণরক্ষার জন্যে ক্ষণকালের জন্যে কুমীরের সঙ্গে ব্যর্থ যুদ্ধ করলেন মতিলাল; ছেলে ভাবলে 'বাবা মতিলালের' এ আবার এক মজা; হাসলে, হাততালি দিলে;—বাবা মতিলাল তলিয়ে গেলেন জলে; মজা শেষ হল, একা তীরে দাঁড়িয়ে ছেলে ডাকতে লাগল 'বাবা মতিলাল, এসো, উঠে এসো।'

বিভূতিভূষণের সংসারবন্ধনের সঙ্গে যাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয় আছে তাঁদের একজন হিসেবে আমার মনে হচ্ছে বিভূতিভূষণ কি তাঁর নিজের নিয়তিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন! রহস্যলোকসন্ধানী বিভূতিভূষণের পক্ষে হয়তো তা অসম্ভব নয়।'

সজনীকান্তের শোক-সংবাদ এর মধ্যে অত্যন্ত স্বতন্ত্র ও শান্ত। লিখেছেন, চারজনের মৃত্যু মনে বড় দাগ কেটেছে। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ, রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের অকালমৃত্যু, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিণত বিদায়, আর বিভূতিভূষণের প্রসন্ন প্রস্থান।

'অনেকে ইহাকে শোচনীয় দুর্ঘটনা বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু আমি জানি, রবীন্দ্রনাথ, কেদারনাথ অপেক্ষা অনেক কম বয়সে বিভূতির জীবনান্ত হইলেও তিনিও পরিপূর্ণ বিকাশ-মহিমার মধ্যে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার মৃত্যুও পাকা ফলের বেদনাহীন পতন মাত্র।...স্পিরিচুয়ালিজম্ বা পরলোকবাদ যে তাঁহার কাছে তত্ত্বমাত্র ছিল না, তাহার প্রমাণ তিনি নিজের জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দিয়া গিয়াছেন। বুধবার তাঁহার মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার সকাল হইতে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার ডাক আসিয়াছে। উপস্থিত প্রত্যেকের কাছে তিনি বিদায় লইতেছিলেন। স্ত্রী কল্যাণী দেবী এই দৃশ্য স্বভাবতঃই সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিতেছিলেন। বিভূতিভূষণ তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া স্মিতহাস্যে বলিলেন, আমার দেবযান লেখা তাহা হইলে কি বৃথা হইল?'

শুধু সাহিত্যিকদের লেখাতেই নয়, সংবাদে-সম্পাদকীয়তায় বিভূতিভূষণের শোক-সংবাদ এত আন্তরিক ও মমতামেশান যে পুরন দিনের কাগজ উল্টলে সেগুলো সমস্তটা না পড়ে পারা যায় না।

আনন্দবাজার-যুগান্তরের সংবাদ, সংবাদ-শিরোনাম এত সাংবাদিককে জড়িয়ে!

আনন্দবাজারের প্রথম পাতাতেই লেখা, 'পরলোকে বাঙ্গলার জনপ্রিয় কথাশিল্পী শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার রাত্রে ঘাটশিলার বাসভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ। প্রতিভাদীপ্ত পল্লীর মরমী সাহিত্যিকের জীবনাবসান।'

'বুধবার রাত্রির প্রথম প্রহরে শৈলরাজিবেষ্টিত ঘাটশিলার নিভৃত কুঞ্জে 'পথের পাঁচালী' ও 'আরণ্যকে'র রচয়িতা বাঙ্গলার সর্বজনপ্রিয় মরমী সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ পৃথিবী হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন।···মৃত্যুর করাল ছায়ায় সব আনন্দ এক মুহূর্তে ডুবিয়া গেল। বিভূতিভূষণের অমর লেখনী চিরতরে স্তব্ধ হইয়া গেল।'

যুগান্তরেও তাই। সেই একই আত্মীয়তা। লেখা, 'পরলোকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘাটশিলায় বাংলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের জীবনাবসান'।

সংবাদও প্রিয়বিরহেরই স্বীকারোক্তি। 'কিন্তু পরিশেষে তখন ইছামতী অনেক দূরে রহিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঘাটশীলার চিকিৎসক শ্রীনুটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অবস্থান করিবার সময়—বহুদিনের পূর্বে তিনি যে "দেবযানে"র পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহার ডাক আসিয়া গেল। তিন বৎসরের পুত্র বাবলু ও শোকাহতা স্ত্রী কল্যাণী দেবী পিছনে রহিলেন।'

সম্পাদকীয়ও এত আন্তরিক ও আত্মীয়সুলভ! আনন্দবাজারের সম্পাদক লিখেছিলেন, 'বিশ্ববিখ্যাত আইরিশ শ'য়ের মৃত্যুসংবাদের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি যে মৃত্যুসংবাদ আমাদিগকে শুনিতে হইয়াছে, তাহা আমাদিগের পক্ষে বস্তুতঃ আত্মীয়-বিয়োগের মত বেদনাদায়ক।···বাঙলার সাহিত্যিক এবং পাঠক সমাজের কাছে বিভূতিভূষণের আকস্মিক এবং অকালপ্রয়াণের সংবাদ ঘরোয়া শোকের সংবাদের মত বেদনা বহন করিবে।'

যুগান্তরের সম্পাদকও সেই একই সুরে লিখলেন, 'একই সঙ্গে একই পথে হাত ধরাধরি করিয়া যাঁহারা যাত্রা সুরু করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে কোন সহযাত্রী হঠাৎ স্খলিত হইয়া গেলে, অবশিষ্টদের যে মনোভাব হয়, বিভূতিভূষণের মৃত্যুতে আমাদের মনোভাবও আজ হইয়াছে তাই। এ বেদনা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।'

শুধু বাঙলা কাগজগুলোতেই নয়, ইংরেজি কাগজগুলোতেও সেদিন বিভূতিভূষণের জন্মে স্থানাভাব ঘটেনি।

Statesman-এর সাংবাদিকোচিত নিরাবেগেও প্রশংসনীয় বঞ্চিত হননি। 'Pather Panchali, the novel that made him popular, gave an

illuminating picture of rural Bengal'।

Amrita Bazar-এও সেই একই সুর। 'The obscure villages of East Bengal, with its smiles and tears, speaks through his Pather Panchali, the primitive forest of Bihar betrays its mystery through his Aranyak'।

Hindusthan Standard-এও তাই। 'He had gatecrashed into the domain of Bengali literature with his well-known work Pather Panchali and had immediately been hailed as a first class creative artist'।

আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে দেশি-বিদেশি সংবাদপত্রের কলমে এই ছিল বিভূতিভূষণের-অভাবী বাঙলাদেশের চেহারা। পুরোটা আরওই আকর্ষণীয় এবং অত্যন্ত যত্নকৃত।

পুরন কাগজপত্র ঘেঁটে সেই ছবিকেই বর্তমান প্রবন্ধে প্রকাশ করা গেল।

আনন্দবাজার পত্রিকা, শুক্রবার ১৭ই কার্ত্তিক ১৩৫৭, ৩রা নভেম্বর ১৯৫০। পরলোকে বাঙ্গলার জনপ্রিয় কথাশিল্পী শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার রাত্রে ঘাটশিলার বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। প্রতিভাদীপ্ত পল্লীর মরমী সাহিত্যিকের জীবনাবসান। [স্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত]

বাঙ্গালা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী 'পথের পাঁচালী'র লেখক শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার ১লা নভেম্বর রাত্রি ৮-১৫ মিনিটের সময় ঘাটশিলাস্থ নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন।

মৃত্যুকালে তাঁহার ৫৪ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

২৮শে অক্টোবর শনিবার রাত্রে একটি চায়ের মজলিস হইতে ফিরিবার পথে তিনি হঠাৎ অসুস্থতা বোধ করেন। বাড়ীতে আসিয়া শয্যাগ্রহণ করেন এবং বুকে ব্যথা অনুভব করিতে থাকেন। তাঁহার চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা হয়। সাময়িক আরাম বোধ করিলেও তিনি আর সুস্থ হইলেন না। ঐ শয্যাই তাঁহার শেষশয্যা হয়।

বুধবার রাত্রির প্রথম প্রহরে শৈলরাজিবেষ্টিত ঘাটশিলার নিভৃত কুঞ্জে 'পথের পাঁচালী' ও 'আরণ্যকে'র রচয়িতা বাঙ্গলার সর্বজনপ্রিয় মরমী সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ পৃথিবী হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বিভূতিভূষণ অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। প্রতিদিনের ন্যায় শনিবার

সকালেও তিনি পাহাড়ে-জঙ্গলে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঘাটশিলা অবস্থান-কালে এবার তিনি বহু সভা-সমিতি ও উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ঐসব অনুষ্ঠানে সদা প্রফুল্ল বিভূতিভূষণের ভাষণ সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। পূজাবকাশে তথায় আরও কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের সমাবেশ হয়। প্রত্যহ তাঁহাদের সহিত আলাপ-আলোচনায় এবং সাহিত্যরসের আনন্দে তিনি দিনগুলি অতিবাহিত করিতেছিলেন। মৃত্যুর করাল ছায়ায় তাঁহাদের সব আনন্দ এক মুহূর্ত্তে ডুবিয়া গেল। বিভূতিভূষণের অমর লেখনী চিরতরে স্তব্ধ হইয়া গেল।

বাঙ্গলা ১৩০৩ সালের ৩১শে ভাদ্র ২৪ পরগণার অন্তর্গত মুরাতিপুর গ্রামে মাতুলালয়ে বিভূতিভূষণ জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার পৈতৃক বাসভূমি ছিল যশোহর জেলার অন্তর্গত বারাকপুর গ্রামে, বনগ্রাম হইতে মাত্র চার মাইল দূরে। বর্তমানে উহা ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অতি সুপণ্ডিত। কিন্তু তাঁহার আর্থিক অবস্থা মোটেই সচ্ছল ছিল না। এইজন্য বাল্যকালে বিভূতিভূষণকে অত্যন্ত দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া লেখাপড়া শিখিতে হয়। এবং অবস্থা বিপর্যয়ে প্রথম জীবনে তাঁহাকে নানা কাজের মধ্যে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়।

বনগ্রাম হাইস্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া তিনি রিপন কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান হইতে ১৯১৮ সালে সসম্মানে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রিপন কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করিয়া কিছুদিন সোনারপুরের অন্তর্গত হরিনাভিতে স্কুল মাষ্টারের কাজ করেন। এইখানে থাকাকালেই তাঁহার প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' প্রকাশিত হয়। স্কুলের কাজ ছাড়িয়া তিনি খেলাৎচন্দ্র ঘোষের জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার হইয়া ভাগলপুরের নিকট দিয়া-ইসমাইলপুরের কাছারিতে যান। সেখানকার গভীর অরণ্য প্রকৃতির মধ্যেই তিনি জীবনের বৃহত্তম প্রেরণা লাভ করেন। 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক' ও 'দেবযানে'র কল্পনা তখনই তাঁহার মনে অঙ্কুরিত হইয়া ওঠে। এই স্থানে তিনি 'পথের পাঁচালী' লিখিতে শুরু করেন।

এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে চতুর্দিকে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। চাকুরীর বন্ধন তাঁহাকে সেখানে বেশীদিন ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তিনি আবার ভ্রাম্যমাণ হইয়া পড়েন।

শিশুকাল হইতে বিভূতিভূষণ একটু ভাবুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। নদী,

বন-জঙ্গল, পল্লী প্রকৃতির প্রতি তাঁহার যে শুধু গভীর আকর্ষণ ছিল তাহা নহে, নাড়ীর সংযোগও ছিল। তাঁহার সাহিত্যে এই সত্য রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

ভাগলপুরের চাকুরী ছাড়িয়া বিভূতিভূষণ সাধু সন্ন্যাসীর মত জীবনযাপন করিতে করিতে বাঙলা, বিহার ও আসামের বনে-জঙ্গলে, পার্বত্য অঞ্চলে বহুকাল আত্মগোপন করেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি কলিকাতায় একটি স্কুলে পুনরায় শিক্ষকতার কার্য গ্রহণ করেন।

বিভূতিভূষণের ন্যায় নিরভিমান, অমায়িক, অজাতশত্রু ও বন্ধুবৎসল মানুষ বর্তমান জগতে দুর্লভ। তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবন ভালবাসিতেন। তাঁহার বেশভূষায়, আচার-আচরণে কখনও বাহুল্য প্রকাশ পায় নাই। পল্লীজীবন যাপনে তিনি আনন্দ পাইতেন বেশী এবং পল্লীগ্রামেই বাস করিতেন। যশোহর জেলার (অধুনা ২৪ পরগণা) অখ্যাত ছায়া নিবিড় পল্লীর অপূর্ব শ্যামশোভা তাঁহাকে সাহিত্যের প্রেরণা অনেকখানি জোগাইয়াছে, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বাঙলার এই বিশেষ অংশের সরল মানুষগুলিই তাঁহার অধিকাংশ কাহিনীর পাত্র-পাত্রী। মানুষকে যেমন তিনি বলিষ্ঠভাবে দেখিয়াছেন তেমনি দুচোখ ভরিয়া প্রকৃতিকেও দেখিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে কথাশিল্পী ও কবির এই অপূর্ব সমন্বয়ই তাঁহার অসাধারণ সাফল্যের মূল কারণ।

তিনি একাধিকবার প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি স্বগ্রামে গোপালনগর স্কুলে শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি একমাত্র তিন বৎসরের পুত্র বাবলু, স্ত্রীঃকল্যাণী দেবী এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নুটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাখিয়া গিয়াছেন। ইনি ঘাটশিলার একজন চিকিৎসক।

বিভূতিভূষণের সর্বশেষ উপন্যাস 'ইছামতী'। ইহা ছাড়া তাঁহার অন্যান্য রচনাবলী—পথের পাঁচালী, অপরাজিত, আরণ্যক, মেঘমল্লার, দৃষ্টিপ্রদীপ, যাত্রাবদল, নবাগত, তৃণাঙ্কুর, উর্মিমুখর, অনুবর্তন, দেবযান, বিপিনের সংসার, আদর্শ হিন্দু হোটেল, কিন্নর দল, জন্ম ও মৃত্যু, বিধুমাষ্টার, অসাধারণ, মৌরীফুল, উপলখণ্ড, ক্ষণভঙ্গুর, উৎকর্ণ, হে অরণ্য কথা কও, বনে পাহাড়ে, কেদার রাজা, অশনি সংকেত, বিচিত্র জগৎ, অথৈ জল, আচার্য কৃপালনী কলোনী, দুই বাড়ী, তালনবমী, চাঁদের পাহাড়, জ্যোতিরিঙ্গণ, মুখোশ ও মুখশ্রী, হীরা মাণিক জলে

বৃহস্পতিবার প্রাতে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ইহার পূর্বে তাঁহার বাসভবন হইতে শব লইয়া একটি শোকযাত্রা বহির্গত হয়। মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া বহু লোক তাঁহার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহার বাসভবনে উপস্থিত হন অথবা শোকযাত্রায় যোগ দেন। স্থানীয় বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে শবাধারে মাল্য অর্পিত হয়।

সম্পাদকীয়/সাহিত্যজগতের ক্ষতি

একই দিনে স্বদেশ ও বিদেশের দুই সাহিত্যিক—বিদেশের মনীষী জর্জ বার্নার্ড শ' এবং দেশের প্রিয় সাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু-সংবাদ আমাদিগকে শুনিতে হইয়াছে।

বিশ্ববিখ্যাত আইরিশ শ'য়ের মৃত্যুসংবাদের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি যে মৃত্যু-সংবাদ আমাদিগকে শুনিতে হইয়াছে, তাহা আমাদিগের পক্ষে বস্তুত: আত্মীয়-বিয়োগের মত বেদনাদায়ক। বর্তমান বাঙলার জনপ্রিয় ও যশস্বী সাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে তাঁহার আয়ুদীপ নিভিয়াছে, ইহা আরও মর্মান্তিক সংবাদ। বাঙলার সাহিত্যিক এবং পাঠক সমাজের কাছে বিভূতিভূষণের আকস্মিক এবং অকাল প্রয়াণের সংবাদ ঘরোয়া শোকের সংবাদের মত বেদনা বহন করিবে।

'পথের পাঁচালী'র বিভূতিভূষণকে বাঙালী সমাজ কখনো ভুলিতে পারিবে না। পল্লী বাঙলার অন্তরের কাহিনী শিল্পী বিভূতিভূষণের লেখনীর গুণে যে মধুরতা ও রূপলাভ করিয়াছে, তাহা বাঙলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। তাঁহার রচনায় প্রকৃত জাতীয় সাহিত্যের পরিচয় ও আস্বাদ পাওয়া যায়। কারণ সে রচনায় আছে 'দেশের মাটির গন্ধ।' বিভূতিভূষণের প্রতিভা বৈদেশিক সাহিত্যের রীতি বা দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিল। বৈদেশিক সাহিত্য অনুকরণের ভ্রান্তি কদাপি তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। দেশের মানুষের সংসার ও জীবনের পরিচয় তিনি অন্তরঙ্গভাবে জানিয়াছিলেন এবং সেই উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাকেই কুশলী শিল্পী বিভূতিভূষণ সাহিত্যে রূপায়িত করিয়াছেন। সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে তিনি বিশেষ একটি গুণের অধিকারী ছিলেন; তাহা হইল মমতাপ্রবণতা। মমতাপূর্ণ দৃষ্টি লইয়াই তিনি সংসারের সুখ দুঃখ এবং দ্বন্দ্বমিলনের রূপ বিচার করিয়াছেন। এই দুর্লভ মমতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর গুণেই শিল্পী বিভূতিভূষণ মূক তরুলতার সংসারের সুখ-দুঃখকেও যেন মানবীয় সংসারের সুখ-দুঃখের মত ঘনিষ্ঠভাবে চিনিয়াছিলেন এবং এই উপলব্ধির যে রূপ তিনি তাঁহার

বিভিন্ন রচনায় সার্বিকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাঙলা সাহিত্যে অভিনব।

বিভূতিভূষণের অকাল প্রয়াণে বাঙলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বহু সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসিকের সহিত আত্মীয়সদৃশ অন্তরঙ্গ ছিলেন। তাঁহারাও বিশেষভাবে শোকাহত হইলেন।

বিভূতিভূষণের পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি এবং তাঁহার পরিবারবর্গের এই গভীর শোকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিভূতিভূষণ/তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে বিভূতিভূষণের জীবনাবসান ঘটেছে। তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের যে মাধুর্য আমার জীবনের বিগত কয়েক বছর আচ্ছন্ন করেছিল, আজ সহসা যে সে পরিচয় অতীতের স্মৃতি মাত্র এই চেতনা আমার সমস্ত চিন্তাকে পঙ্গু করে রেখেছে। তবু আমি জানি, এই স্মৃতি আমার ব্যক্তিগত জীবনের অন্যতম পরমৈশ্বর্য। বিষয় কর্মব্যপদেশে অথবা সাধারণ সামাজিকতার ক্ষেত্রে আমার পরিচয়ের পরিসর খুব স্বল্প নয়; কিন্তু যে পরিচয় জীবনের অন্দর-মহল পর্যন্ত পৌঁছোয় তার সংখ্যা অতি মুষ্টিমেয়। বিভূতিভূষণ আমার সেই অন্তরতমদের একজন ছিলেন।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস বাঙালীর অন্তরে বিভূতিভূষণের যে স্থান তাঁর জীবনব্যাপী সার্থক সাধনায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে আমার ব্যক্তিগত অনুভূতির সঙ্গে তার একটা আশ্চর্য মিল আছে। সে সম্বন্ধ আনন্দের, নিগূঢ় আত্মীয়তার, সহজ মানবিকতার পরিচয়ে মধুর। সাহিত্যের সঙ্গেও জনসাধারণের পরিচয়ের প্রকার-ভেদ ও তারতম্য রয়েছে। যৌথ বৈষয়িকতার সাহিত্য, সমষ্টিগত সামাজিকতার সাহিত্য আজকের দিনের রেওয়াজ, যার মধ্যে গাছকে না চিনিয়ে একেবারে বনকে চেনানোর চেষ্টা রয়েছে—সেখানে অন্তরঙ্গতার স্থান নেই, আত্মীয়তার স্থান নেই; হিসেবে-নিকেশে, বিচার-বিতর্কে, পাওনা গণ্ডা আদায়ের মন কষাকষিতে সে পরিচয় কণ্টকিত। মানুষের সঙ্গে, বিশ্বের সঙ্গে মানুষের যে আর একটি সম্বন্ধ আছে—যার অধিকারে আনন্দের পংক্তিভোজে আকাশ-আলো-বন-মাঠ-কীট-পতঙ্গ-পক্ষী সভ্য-জংলী-ধনী-দরিদ্র একাসনে বসে বিধাতার প্রসাদ লাভ করে, বিভূতিভূষণ সেই পরিচয়ের কারণ।

সাহিত্যের মধ্যে বিভূতিভূষণ যা পরিবেশন করেছেন তা তাঁর ভাববিলাস মাত্র ছিল না—কবি বিধাতার এই পরমাশ্চর্য বিপুল কাব্যের রসাস্বাদের জন্যে তিনি বৈরাগী বাউলের মত ঘুরেছেন মাঠে জঙ্গলে, প্রাণ খুলে মিশেছেন সেই

সব মানুষের সঙ্গে যারা এখনও জীবনকে সাজিয়ে গুছিয়ে ভদ্র করতে গিয়ে তার রসটুকু নিংড়ে বের করে দেয়নি। এই পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে বিভূতিভূষণ অখণ্ডের সম্বন্ধে একটি অবর্ণনীয় 'মিষ্টিক' চেতনা লাভ: করেছিলেন, যার পরিচয় তাঁর সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে।

জীবনের শেষ কয়েক বৎসর বৈরাগী আত্মভোলা বিভূতিভূষণ সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেছিলেন—সুদূর-ব্যাপ্ত আসক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার সে একটি মধুর দৃশ্য। এই প্রসঙ্গে অল্প কিছুদিন আগে প্রকাশিত বিভূতিভূষণের একটি গল্প আমাকে বেদনায় চঞ্চল করে তুলেছে—'বাবা মতিলাল'—ছেলে বাবাকে এই বলেই ডাকে; বাবা ঘোড়া সাজেন, বাবা সঙ্গী হয়ে ছেলেকে চেনান গাছ-বন পাশের পৃথিবী। বাবা ছেলেকে নিয়ে গেলেন নদীতে, ছেলেকে স্নান করিয়ে তীরে রাখলেন; তারপর নিজে নামলেন স্নানে। সহসা নিয়তি বজ্র হানলে, কুমীরে ধরলে মতিলালকে। প্রাণ রক্ষার জন্যে ক্ষণকালের জন্যে কুমীরের সঙ্গে ব্যর্থ যুদ্ধ করলেন মতিলাল; ছেলে ভাবলে 'বাবা মতিলালের' এ আবার এক মজা; হাসলে, হাততালি দিলে: বাবা মতিলাল তলিয়ে গেছেন জলে; মজা শেষ হলো, একা তীরে দাঁড়িয়ে ছেলে ডাকতে লাগল 'বাবা মতিলাল, এসো, উঠে এসো!'

বিভূতিভূষণের সংসার বন্ধনের সঙ্গে যাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয় আছে তাঁদের একজন হিসেবে আমার মনে হচ্ছে বিভূতিভূষণ কি তাঁর নিজের নিয়তিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন! রহস্যলোক সন্ধানী বিভূতিভূষণের পক্ষে হয়তো তা অসম্ভব নয়।

সর্বশেষে—হে বন্ধু—প্রণাম!

রবিবার ১৯শে কার্তিক ১৩৫৭, ৫ই নভেম্বর ১৯৫০/কমলাকান্তের আসর/ শ্রীকমলাকান্ত শর্মা/বিভূতিভূষণ

এ সপ্তাহ কমলাকান্তের বন্ধুবিয়োগজনিত শোক-সপ্তাহ। দূরের কাছের একাধিক বন্ধুর পরলোকগমনের সংবাদ পাইয়া সে কাতর। কাছের আঘাতই তীব্রতর হয়, সেই বেদনাই প্রবলতরভাবে দেখা দিয়াছে। তার উপরে সে আঘাতটা আবার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। প্রত্যাশিত আঘাত প্রত্যাশার দ্বারাই আপন গুরুত্ব লঘু করিয়া আনে। আকস্মিক আঘাতে সে সান্ত্বনার স্থল নাই।

পথের পাঁচালীর বিভূতিভূষণ অকস্মাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। অকস্মাৎ এখানে সম্পূর্ণ অন্বর্থ। বিভূতিভূষণ ঘাটশিলায় নিজ বাসভবনে অবকাশ যাপন

করিতেছিলেন। শনিবার সন্ধ্যায় তিনি, কমলাকান্ত ও আরও কয়েকজন বন্ধু এক চায়ের নিমন্ত্রণে যোগ দিয়াছিলেন। ফিরিবার পথে বিভূতিভূষণ সামান্য অসুস্থ হইয়া পড়েন। কিন্তু সে অসুখের মধ্যে পরিণামের ভয়াবহতার সূচনা মাত্রও ছিল না। তারপরে পাঁচটি রাত্রিও অতিবাহিত হইতে পারিল না। বুধবার রাত্রির প্রথম প্রহরেই তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলেন। আকস্মিকতা কদাচিৎ এমন অকস্মাৎ বেশে দেখা দিয়া থাকে।

বিভূতিভূষণের সাহিত্য-কীর্তির আলোচনা যোগ্যতর ব্যক্তিরা করিবেন। সে শক্তি কমলাকান্তের নাই, সে ইচ্ছাও তাহার নাই। সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বৃহত্তর পাঠক সমাজের প্রিয় লেখক, সেখানে তিনি নির্বিশেষ। সাহিত্যিকের মৃত্যুর ক্ষতি অপূরণীয় হইলেও একেবারে দুঃসহ নয়, কারণ তাঁহার অপরাজিত গ্রন্থাবলীই তাঁহার প্রতিনিধিরূপে বিরাজ করিতে থাকিবে। কিন্তু বন্ধুর মৃত্যুতে বন্ধুর যে ক্ষতি হইল তাহার পূরণ হইবে কিরূপে?

বিভূতিভূষণের মতো এমন বন্ধু কি আর পাওয়া যাইবে? সংসারে স্বার্থের সূত্রে বন্ধুত্ব হয়, মতবাদের সূত্রে বন্ধুত্ব হয়, আবার নিছক হৃদয়ের টানেও বন্ধুত্ব হইয়া থাকে। বিভূতিভূষণের বন্ধুত্ব শেষোক্ত পর্যায়ের।

অনেকের হৃদয়ে সদর দরজা, খিড়কি দরজা দুটি দ্বার থাকে। বিভূতিভূষণের হৃদয়ে সদর খিড়কির ভেদ ছিল না। সকলের জন্যই একটি দ্বার উন্মুক্ত ছিল। তাই তাঁহার বন্ধুর সংখ্যাও যেমন ছিল অনেক, বৈচিত্র্যও ছিল অদ্ভুত। বিভূতিভূষণের হৃদয় ছিল বন্ধুত্বে আমদরবার, সেখানে উচ্চনীচ ভেদে আসন ছিল না, সকলের জন্যই এক প্রশস্ত ফরাস পাতা ছিল, তিনি নিজেও সেই ফরাসের একান্তে উপবিষ্ট থাকিতেন। তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করা যেমন সহজ ছিল বাহির হইয়া আসা ছিল তেমনি কঠিন। বিভূতিভূষণের সহিত বন্ধুত্ব ছিন্ন হইয়াছে এমন একটিও দৃষ্টান্ত মিলিবে না।

বাংলার পল্লী অঞ্চলের বিশিষ্ট একটি শ্রী ও ব্যক্তিত্ব আছে। তাহার শান্তি তাহার মৌন, তাহার শ্যামস্নিগ্ধ সৌন্দর্য অবিস্মরণীয়। বাংলার সেই পল্লী-শ্রীই স্বহস্তে যেন বিভূতিভূষণকে গড়িয়াছিল। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সেই শান্ত-শ্রীতে ওতপ্রোত ছিল। সেই শান্তি ও স্নেহধারা তাঁহার হৃদয় হইতে উপছিয়া পড়িয়া তাঁহার রচনাবলীকে শ্যামল-কোমল সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। বিভূতিভূষণ বাংলার পল্লীজীবনের চারণ।

পল্লীর নিসর্গ প্রকৃতি ও পল্লীর মানুষ বড় নিকট প্রতিবেশী, এত নিকট যে বিভূতিভূষণের চোখে তাহারা একই সত্তা বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। এখানেই

বিভূতি-সাহিত্যের মর্ম ও বৈশিষ্ট্য। আর এই দৃষ্টি লইয়া যে জন্মগ্রহণ করে, গদ্যে লিখিলেও সে কবি, উপন্যাস লিখিলেও তাহা কাব্য। বিভূতিভূষণ কবি, আর তাঁহার সমস্ত রচনাই পুরুষবেশী চিত্রাঙ্গদার মতো ছদ্মবেশিনী কবিতা। তাঁহার সেই কবি-মনই তাঁহাকে সুবর্ণরেখার তীরে, ঘাটশিলায় টানিয়া আনিয়াছিল; ঘাটশিলা জনপদকে দ্বিতীয় আবাস ভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে সেই জনপদের সর্বজনপ্রিয়ের তিরোধান হইল, ঘাটশিলার সৌন্দর্যের ইন্দ্রধনু হইতে একটি কোমল, শোভন, রহস্যময় রঙের অন্তর্ধান ঘটিল।

বঙ্গসরস্বতীর ভূষণ বিভূতিভূষণের জন্য খেদ করি না। তাঁহার শাশ্বত শতদলের একটি দলে তিনি অমর প্রাতষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বন্ধুজনের হৃদয়ভূষণ বিভূতিভূষণের জন্য কেননা খেদ করিব? বন্ধু বিয়োগের শোকই বন্ধুত্বের গৌরব এবং কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা। মহত্তর সান্ত্বনার প্রেরণা কালক্রমে দেবযানের লেখকই প্রেরণ করিবেন।

রবিবাসরীয় আলোচনা / বিভূতিভূষণ ও পথের পাঁচালী / শ্রীসজনীকান্ত দাস

দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের সক্রিয় সাহিত্যজীবনে বাংলাদেশে আমাদের সাহিত্য সংসারে মৃত্যুকে নানাভাবে হানা দিতে দেখিলাম—কয়েকটি শোচনীয়, কয়েকটি স্মরণীয়। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যে চারিটি মৃত্যু আমাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, তন্মধ্যে 'থার্ড ক্লাস' ও 'মানময়ী গার্লস্ স্কুলে'র স্রষ্টা রবীন্দ্র মৈত্রের অকাল অপ্রস্তুত অবস্থায় মৃত্যুর কঠিন আঘাত এখনও দীর্ঘ আঠারো বৎসর পরেও ভুলিতে পারি নাই। রঙ্গমঞ্চেও 'মানময়ী গার্লস্ স্কুলে'র অপরিসীম সাফল্য তখন সবে আমাদের মনে রবির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক আশা জাগাইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে মাঝপথে খণ্ডিত রবির অসম্পূর্ণ উদয় বেদনাদায়ক ক্ষতের মত আজিও আমাদের পীড়া দেয়। তাহার পর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মহৎ মৃত্যু 'বনস্পতির মৃত্যু' প্রত্যক্ষ করিলাম। সারা জীবনের প্রস্তুতির পর বিকাশের পরিপূর্ণতার মধ্যে সেই তিরোধান আমাদের মনে প্রসন্ন আশ্বাসের স্মৃতি হইয়া বিরাজ করিতেছে। বাংলা সাহিত্যের দাদামহাশয় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিপক্কফলের মত বেদনাহীন বিদায়গ্রহণও মহিমময়। গত ১লা নভেম্বর রাত্রি ৮টা ১৫ মিনিটের সময় ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণের আকস্মিক মৃত্যু এই পর্যায়ের শেষ স্মরণীয় ঘটনা।

অনেকে ইহাকে শোচনীয় দুর্ঘটনা বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু আমি জানি রবীন্দ্রনাথ কেদারনাথ অপেক্ষা অনেক কম বয়সে বিভূতির জীবনান্ত

হইলেও তিনিও পরিপূর্ণ বিকাশ-মহিমার মধ্যে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার মৃত্যুও পাকা ফলের বেদনাহীন পতনমাত্র। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে এইরূপ হইবার কারণ সাধক বিভূতিভূষণের নিজেরই সৃষ্টি। ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে যে নিগূঢ় নিরেট ও অন্ধ ব্যবধান কল্পনা করিয়া আমরা আতঙ্কিত হই, তিনি দীর্ঘকালের সাধনায় অন্তরে অন্তরে তাহার অসারতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। মাঝখানের যবনিকা ঈষৎ উত্তোলন করিয়া পরপারের রহস্য কিছু পরিমাণ উদ্‌ঘাটিত করিতে পারিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার ভয় ছিল না। মৃত্যুকে জীর্ণবাস পরিত্যাগ করিয়া নববাস গ্রহণ অপেক্ষা কঠিনতর ব্যাপার বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। পরলোকের এই তত্ত্বে তিনি শুধু বিশ্বাসীই ছিলেন না, নানাভাবে ইহার প্রচারও করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'দৃষ্টিপ্রদীপ' এবং বিশেষ করিয়া 'দেবযান' সেই সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

বয়সের অসমতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কেদারনাথ ও বিভূতিভূষণের (তিনজনই বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণ) মৃত্যুর মধ্যে গভীর সামঞ্জস্য আছে। তিনজনই ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়া এক ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কেদারনাথ শিশুর মত সহজ বিশ্বাসে জগন্মাতাকে আশ্রয় করিয়া সকল শুভাশুভের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন এবং বিভূতিভূষণ দেহ ও মনের সকল অনুভূতি দিয়া এই বিশ্বপ্রকৃতির মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব নিরন্তর স্মরণ করিতেন। অধিকন্তু তিনি ছিলেন পরলোকে একান্ত বিশ্বাসী। স্পিরিচুয়ালিজম্ বা পরলোকবাদ যে তাঁহার কাছে তত্ত্বমাত্র ছিল না, তাহার প্রমাণ তিনি নিজের জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দিয়া গিয়াছেন। বুধবারে তাঁহার মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার সকাল হইতে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার ডাক আসিয়াছে। উপস্থিত প্রত্যেকের কাছে তিনি বিদায় লইতেছিলেন। স্ত্রী কল্যাণী দেবী এই দৃশ্য স্বভাবতঃ সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিতেছিলেন। বিভূতিভূষণ তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া স্মিতহাস্যে বলিলেন, আমার 'দেবযান' লেখা তাহা হইলে কি বৃথা হইল? তোমাকে এতদিন কি শিখাইলাম? বাবা ডাকিয়াছেন, আমাকে তাঁহার নিকট যাইতেই হইবে। দুইদিন পরে তোমাকেও ডাকিবেন, তুমিও যাইবে। আমি এই ঘর ছাড়িয়া পাশের ঘরে মাত্র যাইতেছি। তাহার জন্য কি কাঁদিতে আছে?

এই সহজ সরল বিশ্বাস লইয়াই তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন; সুতরাং তাঁহার জীবন অকালে খণ্ডিত হইল বলিয়া আমরা শোক করিব না। তাঁহার দেয় তিনি কড়ায় গণ্ডায় দিয়া গিয়াছেন। ইহলোকের কাজ সম্পূর্ণ করিয়া

মহত্তর কর্তব্য সম্পাদনে স্থানান্তরে যাইতেছেন তিনি নিজে এই বিশ্বাস লইয়াই গিয়াছেন, আমরাও তাহা বিশ্বাস করিব।

বিভূতিভূষণের সাহিত্য ও জীবন বিস্তৃততর আলোচনার অপেক্ষা রাখে। তিনি ন্যূনাধিক অর্ধশত গ্রন্থের লেখক এবং তাঁহার অনেকগুলি উপন্যাসের বিষয়বস্তু বাংলা সাহিত্যে অভিনব। ছোটগল্পেও তাঁহার নিজস্ব ছাপ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। ভ্রমণ কাহিনী ও দিনপঞ্জিকা রচনাতেও তিনি নূতনতর পদ্ধতির প্রবর্তক। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে বহু আলোচনা হইয়া বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের যথার্থ স্থান নির্ণীত হইবে—এ বিশ্বাস আমার আছে। আমরা তাঁহার সমসাময়িকেরা বিস্ময়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করিয়া গেলাম, বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে তাঁহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এক নব শুচিতা ও সহৃদয়তার আমদানী করিলেন। আমরা দীর্ঘ বিরোধ ও কঠিন প্রতিবাদের দ্বারা যে সহজ সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারি নাই, বিভূতিভূষণ অবলীলাক্রমে শুধু দৃষ্টান্তের দ্বারা সাহিত্যে সেই চিরন্তন সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন।

ভাবপ্রবণ বিভূতিভূষণ যে বিজ্ঞানের একজন নিষ্ঠাবান ছাত্র ছিলেন এবং নক্ষত্রলোকের রহস্য অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিতেন—এ কথা অনেকের কাছে নূতন ঠেকিবে। প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক জগতের নানা বিচিত্র খবর তাঁহার নখাগ্রে থাকিত এবং পরিচিত অপরিচিত সকলকে ধরিয়া পরলোকতত্ত্বে পারদর্শী করিয়া তোলার বাতিক তাঁহার ছিল। অবশ্য তাঁহার দেশভ্রমণের বাতিক সর্বজনবিদিত। তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনীকারের উপকরণের অভাব হইবে না, তাঁহার অনেক গল্প উপন্যাসেও তাঁহার জীবনীর উপকরণ আছে।

বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'পথের পাঁচালী'। ইহা তাঁহার সর্বপ্রথম মুদ্রিত কীর্তিও বটে। এই পুস্তকের পকাশ ব্যাপারে আমি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলাম। সেই কাহিনী বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় ঘটনাবলীর অন্যতম বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছি।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'বিচিত্রা'য় এলোমেলোভাবে ইহার কয়েকটি অধ্যায় পড়িয়া আমি চমৎকৃত ও মুগ্ধ হই। বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ একটি নূতন সুরের সন্ধান পাই। আমি তখন প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক। শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর সহিত সবে আমাদের বন্ধুত্ব হইয়াছে। বিভূতিভূষণ একদা তাঁহার সহপাঠী ও এক দেশের অধিবাসী ছিলেন। নীরদচন্দ্র একদিন বিভূতিভূষণকে 'প্রবাসী' আপিসে অধিষ্ঠিত আমাদের 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডায় লইয়া আসিলেন। 'পথের পাঁচালী' বইখানির জন্য একজন প্রকাশক

বাংলা দেশে পাওয়া যাইতেছে না—এই অত্যাশ্চর্য সংবাদে ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হইয়া সেই দিনই আমি উক্ত পুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করি। তখন ২৫৲।৫০৲ টাকায় বাংলা বইয়ের কপিরাইট বিক্রয়ের কাল। আমি প্রথম সংস্করণ 'পথের পাঁচালী'র জন্য বিভূতিভূষণকে নগদ তিনশত পঁচিশ টাকা দিয়া সেই মারাত্মক পদ্ধতির মূলে কুঠারাঘাত করি। সেইদিন হইতে বাংলা ভাষায় লেখকদের যে সুদিন আসিয়াছে, অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। আমি তখন 'প্রবাসী' আপিসের মাত্র মাসিক নব্বই টাকা বেতনের কর্মচারী। বন্ধুবর গোপাল হালদার নোয়াখালি ফেণীতে তাঁহার বাবার নিকট হইতে তিনশত টাকা ঋণ সংগ্রহ করিয়া আনিলেন, তাহাই হইল রঞ্জন প্রকাশালয়ের মূলধন। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের মহালয়ার দিন ১৬ই আশ্বিন (২রা অক্টোবর ১৯২৯) বুধবার 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হইল। বিভূতিভূষণ গ্রন্থকার পদে ও আমি প্রকাশক পদে উন্নীত হইলাম। এই সময়ের ইতিহাস বিভূতিভূষণের ডায়েরিতে এইভাবে লিপিবদ্ধ আছে।—

"২৬শে জুলাই, ১৯২৯, শুক্রবার।

আজ প্রবাসীতে গিয়ে বইটার প্রথম ফর্মাটা ছাপা হয়েচে দেখে এলুম। সে হিসাবে আমার সাহিত্য-জীবনের আজ একটা স্মরণীয় দিন। ওটা ওদের ওখানে কাল শনিবারে পড়া হবে।"

"২৮শে জুলাই, ১৯২৯, রবিবার।

কাল প্রবাসীতে 'পথের পাঁচালী'র কয়েকটি অধ্যায় পড়া হোল। ডাঃ কালিদাস নাগ ও সুনীতিবাবু উপস্থিত ছিলেন, আরও অনেকে ছিলেন। সকলেই ভারী উপভোগ করলেন, এইটাই আমার পক্ষে আনন্দের বিষয়। এ বইখানার আর্ট অনেকেই ঠিক বুঝতে না পেরে ভুল করেন। দেখে ভারী আনন্দ হোল সজনী কাল কিন্তু ঠিক আর্টের ধারাটা আমার বুঝে ফেলেচে। আর্টকে বুদ্ধির চেয়ে হৃদয় দিয়ে বুঝতে চেষ্টা কর্লে বোঝা যায় বেশী।"

"২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৯, শনিবার।

আজ একটা স্মরণীয় দিন, এই হিসাবে যে আমার বইখানার আজ শেষ ফর্মাটি ছাপা হোল। আজ মাসখানেক ধরে বইখানা নিয়ে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেচি, কত ভাবনা, কত রাত-জাগা, সংশোধন ও পরিবর্তনের ও প্রুফ দেখার যে ব্যগ্র আগ্রহ, সবারই আজ পরিসমাপ্তি। এইমাত্র প্রবাসী আপিসে বসে শেষ প্যারাটার প্রুফ দেখে এলুম। ঠিক দুমাস লাগলো ছাপতে।

ঘনবর্ষার দিনটী আজ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দূরে চেয়ে কত কথা মনে পড়ে।

কিন্তু সে সব কথা এখানে আর তুলবো না।

শুধুই মনে হয় সেই ভাগলপুরের নিমগাছের দিকের সেই ঘরটাতে বসে বনাতমোড়া সেই টেবিলটাতে সেই সব লেখা—সেই কাতিক, সাবোর স্টেশনে গাছের তলায় শীতকালে পাতা জালিয়া আগুন-পোহানো, গঙ্গার ধারের বাড়ীটার ছাদে স্তব্ধ, অন্ধকার রজনীর চিন্তাশ্রম, সেই কাশবনে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে সে সব দৃষ্টি—সবারই আজ পরিসমাপ্তি ঘটল।

উঃ গত ছ'মাস কি খাটুনিটাই গিয়েচে। জীবনে বোধ হয় আমি এরকম পরিশ্রম করিনি—কখনও না। ভোর ছ'টা থেকে এক কলমে এক টেবিলে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত কাটিয়েচি, ইডেন গার্ডেনে কেয়াঝোপে বসে ও একদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে লালফুল ফোটা ঝিলটার ধারে বসে কত সংশোধনের ভাবনাই ভেবেচি। তার ওপর কাল গিয়েচে সকলের চেয়ে খাটুনি। সকাল ছটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত বইয়ের শেষ ফর্মার প্রুফ ও কাটাকুটি, শেষরাত্রে পাথুরেঘাটার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া ও তদারক করে লোক খাইয়ে বেড়ানো। কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি, গা হাত পা যেন কামড়াচ্চে। যাক্। বই বেরুবে বুধবারে। ভগবান বলতে পারবেন না যে ফাঁকি দিয়েচি, তা যে দিইনি, তিনি অন্ততঃ সেটা জানেন। লোকের ভাল লাগবে কিনা জানিনা, আমার কাজ আমি করেচি। (ওপরের সব কথাগুলো লিখলুম আমার পুরাণো কলমটা দিয়ে,—যেটা দিয়ে বইখানার সুরু হতে লেখা। শেষ দিকটাতে পার্কার ফাউণ্টেন পেন কিনে নতুনের মোহে একে অনাদর করেছিলুম, ওর অভিমান আজ থাকতে দিলুম না)।"

"২রা অক্টোবর, ১৯২৯, বুধবার, মহালয়া।

আজ বই বেরুল। এতদিনের সমস্ত পরিশ্রম আজ তাদের সাফল্যকে লাভ করেচে দেখে আমি আনন্দিত। প্রবাসী আপিসে বসে এই কথাই কেবল মনে উঠছিল যে, আজ মহালয়া, পিতৃতর্পণের দিন, কিন্তু আমি তিল-তুলসী তর্পণে বিশ্বাসবান নই—বাবা রেখে গিয়েছিলেন তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করবার জন্যে, তাই যদি কর্তে পারি, তার চেয়ে সত্যতর কোনো তর্পণের খবর আমার জানা নেই।

আজ এই নির্জন, নীরব রাত্রিতে বহু দূরবর্তী আমার সেই পোড়ো ভিটার দিকে চেয়ে এই কথা মনে হোল যে, তার প্রতি সন্ধ্যা, প্রতি বৈকাল, প্রতি জ্যোৎস্না-মাখা রাত্রি, তার ফুল, ফল, আলো-ছায়া, বন, নদী—বিশ বৎসর পূর্বের অতীত জীবনের কত হাসি-কান্না বেদনা, কত অপূর্ব জীবনোল্লাসের স্মৃতি

আমার মনকে বিচিত্রসৌন্দর্যের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল। আমার সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টার মূলে তাদেরই প্রেরণা, তাদেরই সুর।

আজ বিশ বৎসরের দূরজীবনের পার হতে আমি আমার সে পাখী-ডাকা তেলাকুচাফুল-ফোটা, ছায়াভরা মাটির ভিটাকে অভিনন্দন করে শুধু জানাতে চাই—

ভুলিনি! ভুলিনি! যেখানেই থাকি ভুলিনি।···তোমারই কথা লিখে রেখে যাব—সুদীর্ঘ অনাগত দিনের বিভিন্ন ও বিচিত্র সুর-সংযোগের মধ্যে তোমার মেঠো একতারার উদার অনাহত ঝঙ্কারটুকু যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।

আরও অভিনন্দন পাঠাই সেইসব লোকদের—যাদের বেদনার রঙে আমার বই রঙীন হয়েচে—কত-স্থানে, কত অবস্থার মধ্যে তাদের সঙ্গে পরিচয়। কেউ বেঁচে আছে, কেউ বা হয়তো আজ নেই—এদের সকলের দুঃখ, সকলের ব্যর্থতা, বেদনা আমাকে প্রেরণা দিয়েচে—কারুর সঙ্গে দেখা দিনে, কারুর সঙ্গে রাত্রে—মাঠে বা নদীর ধারে, সুখে কিংবা দুঃখে। এরা আজ কোথায় আছে জানিনে, কোথায় পাব ঝালকাটির সেই ভিখারীকে, কোথায় পাব আজ হীরুকাকাকে। কোথায় পাব কামিনী বুড়ীকে—কিন্তু এই নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার-ভরা শান্তির মধ্য দিয়ে আমি সকলকে আমার অভিনন্দন পাঠিয়ে দিচ্চি।

যারা হয়তো আমার ছাপা বই দেখলে খুশি হোত তারাও অনেকে আজ বেঁচে নেই—তাতে দুঃখিত নই, কারণ গতিকে বন্ধ করার মূলে কোনো সার্থকতা নেই তা জানি—তাদের গমনপথ মঙ্গলময় হোক। তাদের কথাও আমার মন থেকে মুছে যায়নি আজ রাত্রে।"

এই সময়ের কয়েকটি টুকরা কবিতায় 'পথের পাঁচালী' ও বিভূতিভূষণের কিছু কিছু পরিচয় মিলিবে। সেগুলি উদ্ধৃত করি।

অপু

অপু ও অপর্ণার—
একের সৃষ্টি যেন অপরের লাগি।
কোথা লীলা তবু তাই ভেবে কাঁদে কেন যে
অপুর মন,
রাণু দিদি গাঁয়ে ঘাটে জল নিতে চলে।
মামার বাড়ীতে অনাদরে তার কাজলের
চোখে জল—

এ দুর্ভাবনা নহে তো অপর্ণার।
সে আজো কোথায় বসে আছে পথ চেয়ে,
অপু চলে গেছে অকারণ রাগ করি।
কাঁদিবার লাগি থাকে নাক' সংসারে
বাঁচিবার লাগি আসে না অপর্ণারা।

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘরেতে ঢুকেই রাসমোহনেরে ডাকে,
—ধোঁয়ানো গরম একটি পেয়ালা চা—
সিগরেট, তারপরে হয় ভাল, না হলে বিড়িই সই।
তারোপরে নহে কলিকাতা দমদম।
বারাকপুরের বনে,
ঘেঁটুর গন্ধে বায়ু হল মন্থর ;
থরে থরে ফোটা ওড়কলমির ফুল,
ঝাঁকে ঝাঁকে ওড়া নামহীন কত পাখী ;
মাছরাঙা-বসা রেল-লাইনের তার—
তারোপরে ফিজি, দিয়াছেন কথা পণ্ডিতজী তো কবে।
হিন্দী একটু শিখিয়া নিলেই হবে—
জেনেছে সেথায় গাছেদের কিবা নাম।

'পথের পাঁচালী'র উত্তর কাণ্ড 'অপরাজিত' আমিই প্রকাশ করি। বিভূতিভূষণ ও 'পথের পাঁচালী' সম্পর্কে এ সময়ে কতকগুলি আলোচনা সভারও আয়োজন করিয়াছিলাম। 'অপরাজিত' সম্পর্কে এই রূপ একটি আলোচনা সভার শেষে কবি বিভূতিভূষণের সত্যকার পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটিতে আছে।

অপরাজিত

কেহ কহে ভাষা ভাল নয়, কেহ খুঁজে মরে ফিলজফি—
ব্যাকুল ঘোষাল অবিনাশ ক্ষোভে কহে—
যা খুশী হউক, নয় এ উপন্যাস।
কোটের বডিতে পাঞ্জাবী ঝুল হাতা
নিঙাড়ি গুম্ফ নরেনদা কহিলেন—
'অপরাজিতের অপু abnormal'—
সাহিত্য সেবা সমিতির সভা বেচু চাটুয্যে ষ্ট্রীটে,

ধূর্জটিবাবু চঞ্চল সভাপতি—
ভবল নীরদ, নীহার, মনোজ, সুশীল ও পশুপতি
বাবু উপাধিটা আছে সকলের শেষে,
এদিক ওদিক বহুদিক দিয়ে করিলেন আলোচনা
প্রশংসা তার পনেরো আনাই বটে।
শৈলজা কহে, যতখানি ভাল 'পথের পাঁচালী' খানি
'অপরাজিত' যে মন্দ ততই লাগে!
মাণিক ব্যথিত,
দরদে কোথাও বৈচিত্র্য নাকি নাই
শুনিনু এমনই বিচিত্র কত কথা—
আরো কত কথা শুনিতাম সেথা বসে
টিকটিক করে ঘড়ি না চালত যদি।
কলকলহের মাঝখানে দেখি, বসে শ্রীবিভূতিবাবু
তারোপরে দেখি অপু সেথা বসে আছে—
যশ নয়, আর মান নয়, আর অর্থ সে চাহে নাক'
অপর্ণারে সে ভুলিয়া গিয়াছে কবে
কাজল কোথায়? সে তাহারে চেনে নাত'—
লীলা রাণুদিদি দুর্গা কি ছিল কভু?
সর্বজয়ার কোলের শিশুটি কোল হতে কবে নেমে
বিচিত্র এই ধরণীর মাঝে কোথায় হারিয়ে গেছে,
কোথা কেহ নাই নিঃসীম নভে মেঘে মেঘে খেলে বাজ
প্রেইরীর ঘাস মাথা ঢাকে মানুষের
পম্পাসে হোথা আগুন লেগেছে বুঝি!
পৃথিবীর বনে বনে
পাখী ডাকে আর ফুল ঝরে ঝরে পড়ে—
গন্ধের ভারে মন্থর হল বায়ু,
দূরে ওয়েসিসে উটেরা ঘুমায় ধূ ধূ করে থর মরু।
পাহাড়ের চূড়া আকাশে খুঁড়িছে মাথা।
মেঘ সরে যায়, হেসে ওঠে নীলাকাশ—
আকাশ জুড়িয়া তারকার বসে মেলা—
তারি মাঝখানে হাতছানি দিয়ে কে যেন তাহারে ডাকে,

অপু চলে যাবে বাধাহীন তার মন
সেথা অপর্ণা নাই,
কাজল মরিয়া গেছে,-
লীলা কভু ছিল নাক'
চমকিয়া উঠি নীচে দূরে কোথা মোটরের ভেঁপু বাজে,
গাঙ্গুলী-বাড়িতে শিয়রে ঘুরিছে পাখা—
জুতা হারাইবে এই ভয়ে দ্রুত উঠে
ভিড় করে সবে নেমে আসি রাস্তায়।

যুগান্তর, শুক্রবার ১৭ই কার্ত্তিক ১৩৫৭, ৩রা নভেম্বর ১৯৫০/পরলোকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়/ঘাটশিলায় বাংলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের জীবনাবসান/ষ্টাফ রিপোর্টার

বর্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার রাত্রি ৮-১০ মিঃ তাঁহার ঘাটশিলাস্থ বাড়ীতে মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন। চারদিন ধরিয়া তিনি রোগশয্যায় ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে ছিলেন তাঁহার স্ত্রী, একমাত্র নাবালক পুত্র এবং তাঁহার এক ভ্রাতা। বৃহস্পতিবার প্রাতে ঘাটশিলায় শোকযাত্রা-সহকারে তাঁহার মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়।

ভ্রাম্যমাণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। শনিবার রাত্রে একটি চা-পানের নিমন্ত্রণ হইতে বাড়ি ফিরিয়া তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করিতে থাকেন, আর কোন রোগের লক্ষণ তাঁহার মধ্যে ছিল না। অরণ্যের প্রেম নিয়া তাঁহার সাহিত্য জীবনের আরম্ভ, শেষ রোগশয্যা গ্রহণের দিন সকালেও তিনি বনে-প্রান্তরে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন।

অপু'র চোখের স্বপ্ন ছিল তাঁহার দৃষ্টিতে। সেই একান্ত সরল ভালবাসা নিয়া দীর্ঘদিন তিনি বাঙ্গলার নিভৃত পল্লী ও বঙ্গ বিহার সীমান্তের জনহীন অরণ্যের বহু পথ হাঁটিয়াছেন আর সেই পথের পাঁচালীই তাঁহার লেখায় জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ১৩০৩ সালে চব্বিশ পরগণার মুরাতিপুরে যদিও তাঁহার জন্ম, তাঁহাদের পৈতৃক ভিটা ছিল এখনকার বঙ্গ বিচ্ছেদী সীমান্তের চার মাইল পূর্বে যশোহরের বারাকপুর গ্রামে। পিতা সুপণ্ডিত শ্রীমহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসচ্ছল সংসারে অনেক দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়া মধ্যবিত্ত বাঙলী সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের জীবন যাত্রার আরম্ভ। বনগ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা

পর্যন্ত এবং তাহার পরে রিপন কলেজ হইতে বি. এ. উত্তীর্ণ হইয়া ১৯১৮ সনের পর হইতে জীবিকার সন্ধানে সোনারপুরে হরিনাভি বিদ্যালয়ে মাষ্টারী, ভাগলপুরে জমিদারী ষ্টেটে ম্যানেজারী অনেক কিছুই তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নগরীর ইংরাজীতে শিক্ষা কেতাদুরস্ত মধ্যবিত্তের সমাজে তাঁহার জীবনটাকে ঠাসিয়া বাঁধিতে হয় নাই। স্কুল মাষ্টারী করিতে করিতে লেখক হইবার কথা তাঁহার মনেও আসে নাই। হঠাৎ ঐ সোনারপুর গ্রামেই পাঁচুগোপাল নামে এক উৎসাহী তরুণ লেখকের ঠেলায় তাঁহাকে গল্পের লেখার কলম ধরিতে হইল। বিভূতিভূষণ কলম ধরার আগেই পাঁচুগোপাল পরম উৎসাহে পাড়ার রাস্তার মোড়ে গাছের গায় আঠা লাগাইয়া তাঁহার ভাবী উপন্যাস "চঞ্চলা"র আবির্ভাববার্তা প্রচার পত্রে ঘোষণা করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত "চঞ্চলা" বাহির হয় নাই—"গ্রাম্য মাঠের ধারে রেললাইন, তার ওপারে একটা সাঁকো, পেছনেই তালীবন। একটা মজাপুকুর। মজাপুকুর পাড়ে ষষ্ঠীতলা। পল্লী নারীরা পূজা দিতে আসে। স্কুলের ছুটির পরে রোজ সেই রেললাইনের সাঁকোর ওপর" বসিয়া একটু একটু করিয়া তাঁহার লেখার আরম্ভ। তাঁহার প্রথম ছোটগল্প "উপেক্ষিতা"র (মেঘমল্লারে প্রকাশিত) জন্ম এইখানে। সেখান হইতে পরে জীবন সরিয়া গেল। হরিনাভীর মাষ্টারী ছাড়িয়া বিভূতিভূষণ খেলাৎ ঘোষের জমিদারীতে চাকুরী নিয়া ভাগলপুরে দিয়া ইসলামপুর কাছারীতে গেলেন। পাহাড়ের গায়, নির্জন প্রান্তরে, গভীর অরণ্যে জ্যোৎস্নার রাত্রিতে অজানা মানুষদের ঘরের দাওয়ায়, নিঃসঙ্গ নিঃস্ব সাধুর আখড়ায় তিনি এমন এক জীবনকে প্রত্যক্ষ করিলেন যাঁহার প্রেম তাঁহাকে বৈরাগী করিল। ধীরে ধীরে "পথের পাঁচালী"র জন্ম হইল। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর নিঃসন্তান বিভূতিভূষণ আরও অরণ্যের কাছে সরিয়া গেলেন, সাধারণ গৃহী জীবন আরও দূরে গেল, কেবল পুকুরপাড়ের চণ্ডীতলার পাশে আকন্দ ফুলের কয়েকটি ঝাড় মনের কিনার হইতে সরিল না। বিহারে ও আসামে অরণ্য চারণায় বহু বৎসর কাটাইয়া, শেষ পর্যন্ত পল্লীর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় ফিরিয়া আসিয়া গ্রামের কোলে আবার তিনি অনাড়ম্বর সংসার পাতিলেন। ইতিমধ্যে অপরাজিত, আরণ্যক, মেঘমল্লার তাঁহার জন্য খ্যাতি বহন করিয়া আনিল। নূতন সংসারে গৃহিণীরূপে কল্যাণী দেবী ও পুত্ররূপে বাবলু আসিল। গোপালনগর স্কুলের মাষ্টারীতে থাকিয়া খ্যাতির কথা ভুলিয়া এই নিরভিমান বাহুল্যবর্জিত শান্ত লেখক মিতভাষায় প্রকৃতির সহিত তাঁহার ভালবাসার কথা আরও লিখলেন। আরও নিবিড়ভাবে নিজেকে মাটির মানুষের অন্তরের সঙ্গে বাঁধিলেন।

কিন্তু পরিশেষে তখন ইছামতী অনেক দূরে রহিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঘাটশীলায় চিকিৎসক শ্রীনুটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অবস্থান করিবার সময়—বহুদিনের পূর্বে তিনি যে "দেবযানে"র কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহার ডাক আসিয়া গেল। তিন বৎসরের পুত্র বাবলু ও শোকাহতা স্ত্রী কল্যাণী দেবী পিছনে রহিলেন।

সম্পাদকীয়/

বাঙ্গলার সর্বজনপ্রিয় উপন্যাসিক ও কথাকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে আমরা মর্মাহত হইলাম। মাত্র কিছুদিন পূর্বেই আমাদের সঙ্গে তাঁহার দেখা-সাক্ষাৎ ও গল্পগুজব হয়—এই সময় তিনি এখন কি লিখিতেছেন, ভবিষ্যতে কি লিখিবেন ঠিক করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে অনেক আশা ও আনন্দের কথাই বলেন। সে সমস্তই অসম্পূর্ণ রাখিয়া এমনভাবে হঠাৎ তিনি বিদায় গ্রহণ করিবেন, ইহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। তাই তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তির খবরে আমরা অনেকবারের মতো আরও একবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা সম্বন্ধেই অবহিত হইলাম। একসঙ্গে একই পথে হাত ধরাধরি করিয়া যাঁহারা যাত্রা সুরু করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে কোন সহযাত্রী হঠাৎ স্খলিত হইয়া গেলে, অবশিষ্টদের যে মনোভাব হয়, বিভূতিভূষণের মৃত্যুতে আমাদের মনোভাবও আজ হইয়াছে তাই। এ বেদনা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

বাঙ্গলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ একদিন হঠাৎ দেখা দিয়াছিলেন এবং প্রথম আবির্ভাবেই তিনি দেশবাসীর সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অধুনালুপ্ত 'বিচিত্রা' পত্রিকায় যখন তাঁহার অদ্বিতীয় গ্রন্থ "পথের পাঁচালী" বাহির হইতে শুরু করে, তখনই তাঁহার নিজস্বতা—তাঁহার সুনিপুণ অনুসন্ধানশীলতা, অনুপম লিপি-কুশলতা এবং জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে আশ্চর্য দরদ সকলকে মুগ্ধ করে। নিশ্চিন্দিপুরের ছোট্ট গ্রাম্য পরিবেশে অপু ও দুর্গা দুটি ভাই-বোনের জীবনকে তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, ঠিক যেমনই ভাবে সহজ আনন্দে বনে ফুল ফোটে, অরণ্যের নিভৃত ছায়ায় যেমনভাবে ফল পাকিয়া ওঠে। পল্লী বাঙ্গলার এই অতুলনীয় মহাকাব্য হাতে লইয়া অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সেই একদিন তিনি বঙ্গবাণীর পূজাঙ্গনে অবতীর্ণ হন—তারপর দিনে দিনে ধাপে ধাপে তাঁহার সৃজনী প্রতিভা ক্রমবিকশিত হইয়াছে। বহু বিচিত্র সম্পদে তিনি ভারতীয় ভাব ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন—তাঁহার সম্যক ও সমস্ত আলোচনা এই

ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভবপর নয়। এই সমস্ত রচনার মধ্য দিয়া মোটের উপর একটা কথাই স্পষ্ট হইয়াছে যে, দেশকে, দেশের মানুষকে, তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্রতর সুখদুঃখকে তিনি খুঁটিনাটি করিয়া জানিতেন এবং সেই অভিজ্ঞতাকে সুচারু গল্পের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিবার শবাও তাঁহার ছিল জন্মায়ত্ত। হাঁক-ডাক করিয়া কোন বিশেষ মতবাদ জাহির করা তাঁহার ধাত ছিল না—তিনি ছিলেন শিল্পী, শিল্পের ভিতর দিয়াই তিনি মূর্ত করিয়াছেন তাঁহার জীবন বাণী এবং সে বাণী যুগ-প্রগতির প্রতিকূলে যায় নাই কোনদিন।

ব্যক্তিগত জীবনে বিভূতিভূষণ ছিলেন সরল, সদালাপী, নিরভিমান—তাঁহার রচনা তাঁহার ব্যক্তিচরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি স্বরূপ। অনেকদিন কলিকাতায় ও তাঁহার পল্লীভবন বনগ্রামে তিনি শিক্ষকতা করিয়াছিলেন—সেই শিক্ষক জীবনের বিচিত্র অনুভূতি তিনি প্রকাশ করিয়াছেন 'অনুবর্ত্তন' উপন্যাসে। এক সময়ে তাঁহার হোটেল খোলার ঝোঁক হইয়াছিল—সেই হোটেলের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাঁহার 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' বইয়ে। প্রেতচক্র বসানোর ও জন্মান্তরের রহস্য যবনিকা ভেদ করিবার খেয়াল ছিল—সেই খেয়াল হইতে তিনি লিখিয়াছেন 'দেবযান'। ঘাটশীলায় তাঁহার একটি বাড়ী ছিল—এই ঘাটশীলায় আনাগোনা উপলক্ষে সাবাচী, গুরুমহিষাণী রাখা মাইন্স, চাঁইবাসা প্রভৃতি অঞ্চলে তিনি প্রভূত ঘোরাঘুরি করিয়াছেন—সেই ভ্রমণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে তাহার 'আরণ্যক' গ্রন্থে। নদীয়া যশোহর এলাকায়, ইচ্ছামতীর পাড়ে একদিন যেখানে নীলচাষের জুলুম বাঙলার সমাজজীবনকে উৎপীড়িত করিয়াছিল, সেই স্থানটিকে তিনি অমর করিয়াছেন তাঁহার 'ইচ্ছামতী' উপন্যাসে। মাত্র কিছুদিন পূর্বে যখন এই উপন্যাস আমাদের হাতে সমালোচনার জন্য আসে, তখন আমরা একবারও ভাবিতে পারি নাই যে, ইহাই তাঁহার সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা হইবে। আজ বিভূতিভূষণ মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইলেন—তাঁহার অপূর্ব রচনাবলী আছে, দেশ চিরদিনই তাহা সশ্রদ্ধ সমাদরে দেখিবে, পড়িবে, কিন্তু এই সমস্ত রচনার স্রষ্টা যে বিভূতিভূষণ, তিনি যে কত মিষ্টি কত সহৃদয় মানুষ ছিলেন—কতখানি রসিক ও রসজ্ঞ ও বন্ধুবৎসল ছিলেন, তাহা পরবর্তীকালের কেহই জানিবে না···একথা জানিয়া তাঁহার বন্ধুসমাজ কখনই শোক সংবরণ করিতে পারিবেন না। আমরা বিভূতিভূষণের পত্নী ও আত্মীয়-পরিজনকে তাঁহাদের সুগভীর শোকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

The Statesman, Saturday, November 4, 1950/Death of well-known Bengali Novelist

The death occured at Ghatsila on wednesday of Mr. Bibhutibhusan Banerjee, a well-known Bengali novelist. He was 54.

Graduating from Calcutta University, he started his career as a village school teacher. Later, he worked as manager of a zamindari estate in Bhagalpur, the natural background of which became a fruitful source of inspiration for some of his novels. Pather Panchali, the novel that made him popular, gave an illuminating picture of rural Bengal. Aparajita, Aranyak, Anubartan and Drishtipradip are some of his other well-known novels. He travelled far and wide throughout India.

Mr. Banerjee was twice elected President of the literary Section of the Prabasni Banga Sahitya Sammelan.

Amrita Bazar Patrika, Friday, November 3, 1950/Death of Renowned Litterateur at Ghatsila

The death occurred due to heart failure, after a short illness of Shri Bibhuti Bhusan Bandyopadhyay, the well known Bengali litterateur at his Ghatsila residence early wednesday night. He was 53.

The late Shri Bandyopadhyay was suddenly taken ill on Saturday night on his return from a teaparty. He felt a sharp pain in the chest which proved fatal after four days. His wife, a minor son and his only brother, who survive him, were at the bedside at the time of his death.

Born at Muratipur, 24 Parganas in 1903, the deceased had his ancestral house at Barrackpore in Jessore District at a distance of about four miles from the present Indo-Pakistan

boundary. His early life was spent in the financial insecurity of his erudite father, Mahananda Bandyopadhyaya. He passed the Matriculation Examination from the Banagram H.E.School and the B.A. Examination in 1918 from the Ripon College. A School teacher for some time at Sonarpur School in 24-Parganas, Bibhutibhusan later accepted a managerial office of a zamindari estate in Bhagalpur district. Although his first literary attempts commenced unnoticed at Sonarpur, the full fruition of his genius took place in the solitary natural environment of his later occupation. A lover of trekking, he travelled widely in the hills and jungles of Bihar and Assam and finally retired to an unostentatious life a village school master, although a literary fame that he had won would have drawn many to urban life.

'Pather Panchali' 'Aparajita' 'Aranyak' 'Trinankur' and 'Drishtipradip' are among his outstanding works.

Editorial /By the way

The sudden and premature death of Bibhuti Bhusan Bandyopadhyaya at Ghatsila on November 1 removes from the field of Bengali literature an outstanding creative genius. Of his numerous works - novels and anthologies of short stories —at least one, Pather Panchali has already secured a lasting place in our literature. He was always very close to nature. He loved to live in romantic villages and silent hill areas, and the charm of natures unvarnished beauty permeated his imagination. The obscure villages of East Bengal with its smiles and tears, speaks through his Pather Panchali, the primitive forest of Bihar betrays its mystery through his Aranyak. The conventions of modern life had no hold on him; he drew sustenance from nature, from man's uncorrupted emotions, from life itself in its infinite variety. There is no

one who can worthily fill the place occupied by him for twenty years. We offer our sincere condolences to the members of the bereaved family.

Hindusthan Standard, Calcutta, Friday, November 3, 1950/Bibhuti Bhusan Bandyopadhyaya Dead/Well-known Bengali Novelist and Story Writer/By a Staff Reporter

Shri Bibhuti Bhusan Bandyopadhyay, a well-known novelist and short story writer, died of heart trouble at his Ghatsila residence at about 8 P M. on Wednesday. He was about 54.

While returning from a party on Saturday last Shri Bandyopadhyaya was suddenly taken ill.

Sri Bandyopadhyaya is survived by his wife, a son aged about six and his brother Dr. Nutbehari Bandyopadhyaya.

Cremation took place on Thursday morning and was largely attended.

Life Sketch

Shri Bibhuti Bhusan Bandyopadhyaya was born on the 30th Bhadra, 1303 B. S. in village Muratipur of 24-Parganas. His ancestral home, however, lay in village Barrackpore, Jessore district, a few miles from Bongaon. His father Mahananda Bandyopadhyaya was a learned scholar.

Owing to the financial stringency Bibhuti Bhusan's father found it difficult to provide for his son's proper education. Bibhuti Bhusan, however, managed to pass the Matriculation Examination from the Bongaon H E. School. He then had himself admitted into the Ripon College in Calcutta. From this college he graduated with distinction in 1918.

Bibhuti Bhusan was remarkably pensive from his early boyhood. Fresh and green rural scenes, the beauties of rivers,

woods and meadows amidst which he grew up from infancy into manhood always made a deep impression on his highly imaginative mind. He was truly a child of Nature and he delighted in living in tune with Nature's spirit. His works are replete with expressions of his deep spiritual kinship with Nature.

After graduation Bibhuti Bhusan found job as a school master at Harinavi in Sonarpur, 24-Parganas. This position he left for the post of the manager of a Zamindari estate owned by one Khelat Ghosh in Dera-Ismailpur in the district of Bhagalpur, Bihar. The place was surrounded by deep forests. The verdant granduer of that wild region of Nature was a rich source of inspiration for his literary activities which had just begun. It was here that the plots for some of his celebrated works like Pather Panchali, Aranyak and Devjan were conceived.

Bibhuti Bhusan was fond of travelling. So he could not stick long to his job at Dera-Ismailpur. He gave it up and wandered through regions of natural beauty in Bihar, Bengal and Assam. The hilly tracts and the deep forests of the last mentioned province had the greatest fascination for him.

Bibhuti Bhusan was a most amiable personality and a warm-hearted friend. He was free from every sort of vanity and love of artificiality. A child of the village, his life was as simple and unostentatious as that of most rural folks. He loved to live in the village and disdained the formalities of unborn existence. The humble, though useful, work of a school master, especially in a village was more in tune with his natural spirit than any other sort of calling in life. That is why even until lately he was engaged as a teacher in an H. E. in his own village.

Bibhuti Bhusan has earned an honoured and lasting place for himself in the history of Bengali literature both as a novelist and a writer of short stories. Quite numerous are the products of his facile pen. Among them mention should be made of the following : Pather Panchali, Aparajita, Aranyak, Megh-Mallar, Dristi-Pradip, Jatrabadal, Nabagata, Trinankur, Urmi-mukhar, Anubartan, Devjan, Bepiner Sansar, Bidhu Master, Kinnar-Dal, Upal Khanda, Mouri-Phul, Utkarna, He Aranya Katha Kao, Ashadharan etc.

Bibhuti Bhusan's importance as an outstanding in Bengali literature was duly recognised by his countrymen in his election as President of the Literary Section of the Bombay Session and also of the Meerut Session of the Prabashi Sahitya Sammelan.

It should also be mentioned here that the 'Hindusthan Standard' Puja Number of the year contains an article from Bibhuti Bhusan's pen[১].

Editorial/Bibhuti Bhusan Bandyopadhyay

In the death which occurred so suddenly of Shri Bibhuti Bhusan Bandyopadhayay West Bengal and Bengali literature have suffered an irreparable loss. He had gatecrashed into the domain of Bengali literature with his well-known work Pather Panchali and had immediately been hailed as a first-class creative artist with a distinctive originality of his own. Free from the influence of his world-renowned contemporaries still shining like the midday sun, he had curved down a new line for himself, collected his materials from a still

১ 'Looking for the Bride', Hindusthan Standard Puja Annual, 1950। বিভূতিভূষণের মূল গল্প 'কনে দেখা' (যাত্রাবদল) অনুবাদ। অনুবাদ করেন গোপাল ভৌমিক।

unexplored region of rural Bengal and made an altogether new approach to the Bengali heart. His victory was instantenious and more spectacular perhaps than that of most of the masters in the line. There is no doubt that for a period he enjoyed unrivalled popularity among the Bengali reading public who read with avidity each one of his subsequent works all bearing the impression on them of his intimate relationship with Nature and deep sympathy for his fellow-beings. His death will be widely mourned in the Bengali speaking areas in the country. We offer our respectful condolence to his widowed wife and other members of his bereaved family.

পরিশিষ্ট

দুই বিভূতিভূষণ

দেশে প্রকাশিত "দুই বিভূতিভূষণ" শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লাম। এতে উল্লিখিত "গৃহ-হারা" পুস্তকখানির গ্রন্থকার সম্বন্ধে প্রবন্ধকারের সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে।

আমি যতদূর জানি, এই পুস্তকটির রচয়িতা "পথের পাঁচালি"র বিভূতিভূষণ নন। ইনি পুরীর একদা লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী ধনপতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্রায় ১২ বৎসর পূর্বে তিনি কটকে ছিলেন। এখন কোথায় আছেন জানি না। খুব সম্ভব তাঁর এক পুত্র (Colliery Mining Engineer) ধানবাদের নিকট কোথায় আছেন। এই বিভূতিবাবু এবং তাঁর এই বইটির সম্বন্ধে তাঁর ছোট ভাই শ্রীময়ূখভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Advocate, Ranchi) কাছ থেকে কিছু জানা যেতে পারে। ময়ূখবাবু একদা আমার সতীর্থ ছিলেন।—প্রতাপ সেন, কটক-২/দেশ, ৬ই জুলাই, ১৯৭৪।

দুই বিভূতিভূষণ

'গৃহহারা' গ্রন্থের লেখক বিভূতিভূষণ ও 'পথের পাঁচালী' খ্যাত বিভূতিভূষণ দুই আলাদা ব্যক্তি। 'গৃহহারা'র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ধনপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গৃহে চুঁচুড়ায় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

'গৃহহারা'র বিভূতিভূষণ প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্রে' লিখতেন। যত দূর মনে পড়ে তাঁর দুটি গল্প 'খুনী আসামী' ও 'রাজদ্রোহী' প্রকাশিত হয়। কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন এই বিভূতিভূষণের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকাতেও এই বিভূতিভূষণের লেখা গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিভূতিভূষণ প্রেসিডেন্সী কলেজে নেতাজী সুভাষের সমসাময়িক ছিলেন। ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ও লেখক।

পরবর্তী কালে 'গৃহহারা' উপন্যাসটির তিনি নাট্যরূপ দেন 'কনক' নামে এই 'কনকে'র পাণ্ডুলিপি বিভূতিভূষণের স্ত্রী শ্রীমতী সুধাননী দেবীর নিকট এখনও রক্ষিত আছে। এই বিভূতিভূষণ ১৯৬৮ সালে ধানবাদে মারা যান। শ্রীমতী সুধাননী দেবীর ঠিকানা : C/o Shree B. Banerjee, 7/6 Dumayne Avenue, Calcutta-43। বিভূতিভূষণের আর একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি 'বোধোদয়'ও ছাপানো সম্ভব হয়নি।—সুব্রতা ঘোষ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া/দেশ, ২৭শে জুলাই, ১৯৭৪।

নির্ঘণ্ট